শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ ও তৎশাখা শ্রীগৌড়ীয়মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা

শ্রীব্রহ্ম-মাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক শ্রীচৈতন্যাম্নায়ে

নবমাধস্তন আচার্যবর্য শ্রীরূপানুগপ্রবর

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী

প্রভুপাদের হরিকথামৃত

Mathura (U.P.)

আবির্ভাব-শতবার্ষিক সংস্করণ

৪৮৭ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৩৮০ বঙ্গাব্দ ; ১৯৭৩ খৃষ্টাব্দ।

শ্রীচৈতন্যমঠ এবং তৎশাখা শ্রীগৌড়ীয়মঠসমূহের

সভাপতি ও আচার্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজ

সঙ্কলিত

প্রকাশনে—

প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাব-শতবার্ষিক-উৎসব সমিতি। শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

* *

—মুদ্রণ—

শ্রীভক্তজন ব্রহ্মচারী

'সারস্বত প্রেস', ২৯এ/১, চেতলা সেণ্ট্রাল রোড,

কলিকাতা-২৭।

* *

প্রাপ্তিস্থান :—

১। শ্রীচৈতন্য-রিসার্চ-ইন্‌ষ্টিটিউট্,

৭০-বি, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা—২৬:

ফোন : ৪১-০২৬০

২। শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

(শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থান)

RS 6—৭০

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নিবেদন

শ্রীচৈতন্যমঠ ও ভারতে শ্রীগৌড়ীয়মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্ব-বিশ্রুতকীর্তি ওঁবিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশত-শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাম্নায়ে নবমাধস্তনান্বয়বর আচার্যভাস্কররূপে আবির্ভাবলীলা প্রকাশপূর্বক অপার শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করতঃ সৎ-সিদ্ধান্তামৃত আহরণপূর্বক অনুক্ষণ শ্রীহরিকথামৃত বর্ষণদ্বারা অবিদ্যাপীড়ায় প্রপীড়িত সংসার-দাবানল-দগ্ধ বিশ্ববাসিগণের যে নিত্যকল্যাণ বিধান করিয়াছিলেন, তাহার তুলনা নাই। রণবিধ্বস্ত বিশ্ব ত্রিতাপের প্রচণ্ড তাপে সন্তপ্ত হইয়া চতুর্দিকে শান্তি-সন্ধানের যত্ন করিতেছে। কিন্তু কর্মবীর মনীষিগণ আধ্যক্ষিক জ্ঞান-সাহায্যে শান্তির উপায় উদ্ভাবনের প্রভূত প্রচেষ্টা করিলেও অশান্তির মূল কারণ তাঁহাদের নিকট অজ্ঞাত বলিয়া সফলতার পরিবর্তে ক্রমশঃ জটিলতারই সৃষ্টি হইয়া অশান্তির অনল অধিকতর লেলিহান জিহ্বা বিস্তারপূর্বক সমগ্র বিশ্ব গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে।

গুণত্রয়ে বিশেষতঃ রজোগুণে ও তমোগুণে অভিভূত থাকা পর্যন্ত বাস্তব শান্তিলাভের কোন সম্ভাবনা নাই। তজ্জন্যই গুণাতীত কুণ্ঠারহিত অপ্রাকৃত ভগবদ্ধাম হইতে মহাপুরুষগণ মধ্যে মধ্যে প্রপঞ্চে শুভবিজয়-পূর্বক শাশ্বত শান্তি ও পরমানন্দের সন্ধান প্রদান করেন। এই সমস্ত-মহাপুরুষের মধ্যে শ্রীচৈতন্যচরণ-চারণ রূপানুগ আচার্যবৃন্দের অবদান নিরপেক্ষ ও তারতম্যমূলক বিচারে সর্বোত্তম। তাঁহারা নাস্তিক্য-সংশয়-অজ্ঞেয়তা-বাদের বিচারকে অতিক্রমকারী সগুণ-নির্গুণ-ব্রহ্ম বিচার, এমন কি, তদতিক্রমকারী অধোক্ষজ ভূমিকার একলবাসুদেব, শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ও শ্রীসীতারামের দাস্যপ্রধান ঐশ্বর্যপর সেবা-বিচারেরও

অনেক ঊর্দ্ধ্বে অপ্রাকৃত গোলোকের নিভৃত প্রকোষ্ঠ গোকুল-ব্রজে ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বের মাধুর্যময়ী সেবায় যে অসমোর্দ্ধ্ব প্রেমানন্দের সন্ধান প্রদান করেন, তাহাই শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃতে দেদীপ্যমান।

শ্রীল প্রভুপাদ ১২৮০ বঙ্গাব্দের (৩৮৭ গৌরাব্দ, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ) মাঘী কৃষ্ণ-পঞ্চমীতে শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের সন্নিহিত স্থানে শ্রীভক্তিবিনোদ-কীর্তন-মুখরিত আলয়ে আবির্ভূত হইয়া সমগ্র বিশ্বে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের বিমল প্রেমধর্ম বিস্তারপূর্বক 'হ্যুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ' শাস্ত্রবাণীর ও "পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"—ঔদার্যলীলাময়বিগ্রহ অবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের এই ভবিষ্যদ্‌বাণীর সার্থকতা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব নবদ্বীপমণ্ডলের কেন্দ্রস্থল শ্রীধাম মায়াপুরে আবির্ভূত হইয়া চতুর্বিংশ বর্ষ শেষে সন্ন্যাস গ্রহণপূর্বক চতুর্বিংশতি বৎসর নীলাচলে প্রকটলীলাকালে প্রথম ছয় বৎসর উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে গমনাগমন এবং শেষ অষ্টাদশ বর্ষ নিরন্তর নীলাচলে অবস্থানপূর্বক তথায় যে প্রেমরত্ন সংরক্ষণ করিয়াছেন, শ্রীগৌরনিজজন শ্রীল প্রভুপাদ সেই নীলাচলে আবির্ভূত হইয়া সেই প্রেমরত্নসহ শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবক্ষেত্র শ্রীধাম মায়াপুরে শুভবিজয় করতঃ আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে শ্রীগৌড়ীয়মঠাদি স্থাপনপূর্বক জগতে (১) লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, (২) শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারী বিগ্রহের সেবাপ্রকাশ, (৩) শুদ্ধভক্তিগ্রন্থ প্রণয়ন, (৪) শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামিপাদের সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকার প্রকাশ ও প্রচার-প্রসারদ্বারা লুপ্ত বৈষ্ণবস্মৃতির পুনরুদ্ধার সাধন এবং (৫) ভক্তিসদাচার-প্রবর্তন প্রভৃতি দ্বারা

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-শ্রীজীবপ্রমুখ আচার্যগণের ন্যায় শ্রীচৈতন্য-মনোভীষ্ট সংস্থাপন করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং দ্বারে দ্বারে হরিকথা কীর্তন, নিজ অনুগত প্রচারকবৃন্দকে হরিকথা প্রচারের জন্য বিভিন্ন দেশে, এমন কি পাশ্চাত্ত্য ভূখণ্ডে পর্যন্ত প্রেরণ, বিভিন্ন ভাষায় গ্রন্থ প্রণয়ন, দৈনিক-সাপ্তাহিক-মাসিক এবং পাক্ষিক পারমার্থিকপত্র প্রকাশ, বিভিন্ন স্থানে বিরাট্ সংশিক্ষা-প্রদর্শনী স্থাপন প্রভৃতি কার্যদ্বারা যেরূপ বিপুলভাবে শ্রীগৌরসুন্দরের ভুবনমঙ্গল শিক্ষামৃত বিতরণ করিয়াছেন, তাঁহার পূর্ববর্তী কোনও আচার্যের জীবনীতে এরূপ ব্যাপকভাবে প্রচার-চেষ্টা লক্ষিত হয় না। ভাষার গাম্ভীর্য, বিচার-বৈশিষ্ট্য ও সংসিদ্ধান্ত-স্থাপনের নবনবায়মান চমৎকারিতা; শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর শুদ্ধদ্বৈতদর্শনে মায়াবাদ খণ্ডন ও শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ-সেবন, বিশিষ্টাদ্বৈত-দর্শনের শুদ্ধাভক্তি ও ভক্তসেবা, শুদ্ধাদ্বৈত-দর্শনের তদীয়-সর্বস্বভাব ও রাগমার্গানুশীলন এবং দ্বৈতাদ্বৈতদর্শনের রাগমার্গীয় ও গোপীভাবে সেবার প্রশংসা করিয়া ঐ সকল দর্শনের বৈজ্ঞানিক অসম্পূর্ণতা পরিপূরণপূর্বক যে অপূর্ব 'অচিন্ত্যভেদাভেদ'-সিদ্ধান্ত-সণ্মণি আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাই যে সর্ববেদান্তসার ও ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্যস্বরূপ, তাহার তারস্বরে প্রচার; গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে কায়মনোবাক্যে 'পরাত্মনিষ্ঠামাত্র বেষধারণ'-তাৎপর্যবিশিষ্ট 'কৃষ্ণনিষেবণ-ব্রত' নির্ধারণরূপ ত্রিদণ্ডসন্ন্যাসবিধি প্রবর্তন; গুণ ও কর্মবিচারানুসারে স্থাপিত অধুনা লুপ্ত দৈববর্ণাশ্রমধর্ম পুনঃসংস্থাপন প্রভৃতি তাঁহার চরিত্রের অলৌকিকত্ব ঘোষণা করিতেছে।

অশেষপ্রকারে শ্রীগৌরসুন্দরের মনোঽভীষ্ট প্রচারপূর্বক ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে ১৬ই পৌষ, ইং ১৯৩৭ খৃঃ ১লা জানুয়ারী অগ্রহায়ণী কৃষ্ণা-চতুর্থী

তিথিতে এই মহাপুরুষ বিশ্বকে অন্ধকারে আচ্ছাদিত করিয়া নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন। তাঁহার কৃপায় শ্রীচৈতন্যমঠে তাঁহার সমাধিক্ষেত্রে একটি সুরম্য মন্দির নির্মিত হইয়াছে। এই মন্দিররাজ বিশ্বের মনীষীবৃন্দকে সাদরে আহ্বানপূর্বক তাঁহার শিক্ষামৃত বিতরণে যত্নশীল থাকিবেন।

মহাপুরুষগণের তিরোভাবলীলার পর তাঁহাদের অধস্তনগণ অনেক সময়েই তাঁহাদের আদর্শশিক্ষাবিচার-ভ্রষ্ট হইয়া স্বকপোলকল্পিত মতসমূহকে অন্যাভিলাষিতামূলে তাঁহাদের শিক্ষা বলিয়া প্রচারদ্বারা জগজ্জঞ্জালের সৃষ্টি করেন। কিন্তু সেই সকল মহাপুরুষগণের কীর্তিত হরিকথা তাঁহাদের দ্বারা পরীক্ষিত হইয়া প্রকাশিত থাকিলে ঐপ্রকার বিপৎপাত হইতে সজ্জনগণ রক্ষা পাইতে পারেন। শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃতে যে সকল প্রসঙ্গ প্রকাশিত হইতেছে, তাহা শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার প্রকটকালে স্বয়ং দেখিয়া প্রকাশের জন্য কৃপাদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, সুতরাং পাঠকবর্গ এই মহন্মুখরিত হরিকথামৃত-পানে যে সত্যসত্যই শুদ্ধ-পরমার্থের অনুসন্ধান পাইয়া লাভবান্ হইবেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তজ্জন্য **শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-শতবার্ষিক-উৎসব** বৎসরে তাঁহার 'হরিকথামৃত' শ্রদ্ধালু জনগণের কল্যাণের নিমিত্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইতেছেন।

এই গ্রন্থের মুদ্রণে যাঁহারা যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন, শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে তাঁহাদের উত্তরোত্তর সেবাবৃত্তি বৃদ্ধির নিমিত্ত প্রার্থনা জানাইতেছি।

শ্রীচৈতন্যমঠ
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
৪৮৭ শ্রীগৌরাব্দ।

নিবেদক—
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু
শ্রীভক্তিবিলাস তীর্থ

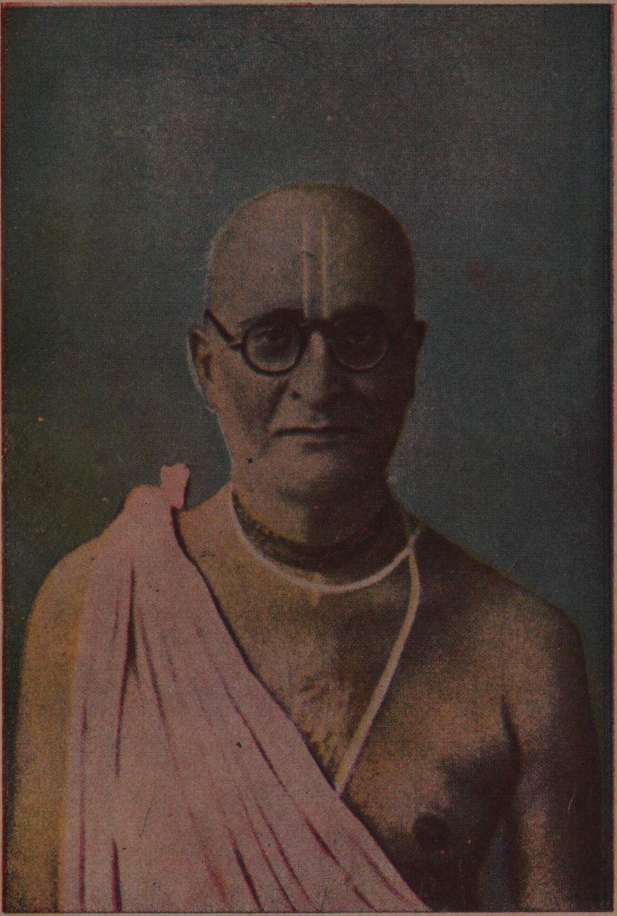

শ্রীচৈতন্যমঠ ও তৎশাখা শ্রীগৌড়ীয়মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা
শ্রীব্রহ্ম-মাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক শ্রীচৈতন্যাম্নায়ে
নবমাধস্তন আচার্যবর্য শ্রীরূপানুগপ্রবর
প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

শ্রীনাম-সংকীর্তন

[জয়পুরে গিজাগড়ের জায়গীরদার কুশল সিংজীর নিকটে হরিকথা]

শ্রীযুক্ত কুশল সিংজীর সহিত কথোপকথনে শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছিলেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু ও গোস্বামিগণের সিদ্ধান্তানুসারে **শ্রীনাম-সংকীর্তনই মুখ্যভজন।** শ্রীনামসংকীর্তনই ভক্তি-মধ্যে শ্রেষ্ঠতম, স্মরণাদিও কীর্তন বা শ্রীনাম-সংকীর্তনেরই অধীন। শ্রীনাম-কৃপা না হইলে কখনও লীলা-স্ফূর্তি হয় না। পরিপূর্ণ অখণ্ড রস শ্রীনাম-কলিকা স্বল্পস্ফুট হইতে হইতেই অপ্রাকৃত শ্রীগোলোক-বৃন্দাবনস্থ সচ্চিদানন্দ শ্রীশ্যামসুন্দরাদি মনোহররূপ বিকাশিত হয়। কুসুম-সৌরভবৎ স্ফুটিত কলিকায় কৃষ্ণের চতুঃষষ্টি গুণ-সৌরভ অনুভূত হয়। শ্রীনাম-কুসুম পূর্ণ বিকচিত হইলে চিল্লীলামিথুনের চিন্ময়ী অষ্টকাল-নিত্য-লীলা প্রকৃতির অতীত হইয়াও শ্রীনামকীর্তনকারীর শুদ্ধ-সত্ত্বোজ্জ্বলীকৃত হৃদয়ে উদিত হয়। কীর্তন ছাড়িয়া পৃথগ্‌ভাবে স্মরণাদি-চেষ্টা জড় প্রতিষ্ঠাসত্তার মাত্র। সন্দর্ভ, ভাগবতামৃতাদি যাবতীয় সংস্কৃত গোস্বামিগ্রন্থের পরম নির্যাসস্বরূপ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিকৃত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত নামক গৌড়-ভাষায় লিখিত গ্রন্থে প্রবেশাধিকার

না থাকায় অনেকে গোস্বামিগণ-বিরচিত সংস্কৃত গ্রন্থাদি পড়িয়াও বিদ্বজ্জনানুগত্যাভাবে প্রকৃত গোস্বামি-সিদ্ধান্ত ধরিতে পারেন না। শ্রীল প্রভুপাদের এই কথা শুনিয়া শ্রীমান্ রামকৃষ্ণ দাসজী আধুনিক কোন কোন নব্য-ভজন-প্রচলনকারী ব্যক্তির নামোল্লেখপূর্বক বলিয়াছিলেন যে, তাঁহারাও ত' নাম-সংকীর্তন করেন; তদুত্তরে প্রভুপাদ বলিয়াছিলেন,—কল্পিত বা রচিত ছড়া-কীর্তন "শ্রীনাম-সংকীর্তন" নহে; উহা নামাপরাধ-কীর্তন, উহা 'কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ' বা 'ভজন' নহে; 'আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ' অথবা ভজনের নামে ভোগ অপরাধ মাত্র। শ্রীচৈতন্য-মুখোদ্গীর্ণ শ্রীনামের সংকীর্তনই ভজন; তাহাই সদ্য প্রেমসম্পত্তি-উৎপাদনে সমর্থ এবং ভজন-মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বলিয়া সর্বসাধুজন-নির্ণীত। সেই স্বয়ংপ্রকাশ নামামৃত সেবোন্মুখ একটি ইন্দ্রিয়ে প্রাদুর্ভূত হইয়া স্বীয় মধুররসে সমগ্র ইন্দ্রিয়গ্রাম প্লাবিত করিয়া থাকে। কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু এই সিদ্ধান্তই কীর্তন করিয়াছেন—

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম, কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম-সংকীর্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥

শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—

কলৌ স্বভাবত এবাতিদীনেষু লোকেষ্বাবির্ভূয় তাননায়াসেনৈব তত্তদ্যুগগত-মহাসাধনানাং সর্বমেব ফলং দদানা সা কৃতার্থয়তি। যত এব কলৌ ভগবতোবিশেষতশ্চ সন্তোষো ভবতি। অত্র কলিপ্রসঙ্গেন কীর্তনস্য গুণোৎকর্ষ ইতি বক্তব্যম্। ভক্তিমাত্রে কালদেশাদিনিয়মস্য নিষিদ্ধত্বাৎ। তস্মাৎ সর্বত্রৈব যুগে শ্রীমৎ-কীর্তনস্য সমানমেব সামর্থ্যম্। কলৌ তু শ্রীভগবতা কৃপয়া তদ্গ্রাহ্যম্ ইত্যপেক্ষয়ৈব তত্তৎপ্রশংসেতি

স্থিতম্। অতএব যত্বন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্তব্যা তদা তৎসংযোগে-নৈবেত্যুক্তম্। যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধস ইতি। তত্র চ স্বতন্ত্রমেব নামকীর্তনমত্যন্তপ্রশস্তম্। হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথেত্যাদৌ। (১)

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমান্ কুশল সিংজীকে আরও বলিলেন,—শ্রীসনাতন প্রভু বৃহদ্ভাগবতামৃতে বলেন,—

জয়তি জয়তি নামানন্দরূপং মুরারে-
র্বিরমিতনিজধর্মধ্যানপূজাদিযত্নম্।

---

(১) **অনুবাদ**—কলিযুগে স্বভাবতঃ অতি দরিদ্র জীবগণের মধ্যে কীর্তনাখ্যা ভক্তি স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া অনায়াসেই তাঁহাদিগকে পূর্ব পূর্ব যুগোচিত মহা-মহা-সাধন-লভ্য সমস্ত ফলই প্রদানপূর্বক কৃতার্থ করিয়া থাকেন; যেহেতু কলিযুগে এই সংকীর্তনদ্বারাই ভগবানের বিশেষ সন্তোষ জন্মে। এস্থলে কলিযুগমাহাত্ম্য-বর্ণন-প্রসঙ্গে কীর্তনেরই গুণোৎকর্ষ অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ-গুণ-বর্ণন অভিপ্রেত; যেহেতু কেবলমাত্র এই কীর্তনাখ্যা ভক্তির বিষয়েই কাল-দেশাদি নিয়ম নিষিদ্ধ হইয়াছে। অতএব সর্ব যুগেই শ্রীযুক্তা কীর্তনাখ্যা ভক্তির সামর্থ্য সমান, কিন্তু কলিযুগে স্বয়ং ভগবান্ কৃপাপূর্বক তাহা গ্রহণ (প্রচারার্থ স্বীকার) করিয়াছেন, এই নিমিত্তই কীর্তনের সেই সকল প্রশংসা স্থাপিত হইয়াছে। অতএব কলিযুগে যদি অন্যান্য (নয় প্রকার বা চতুঃষষ্টি প্রকার বা সহস্র প্রকার) ভক্তি অনুশীলন করিতে হয়, তাহা হইলে সেই কীর্তনের সহযোগেই যে সেই সকল ভক্তি সাধন করিবে, ইহাই কথিত হইয়াছে; যথা—সুমেধা অর্থাৎ পণ্ডিতগণ কলিযুগে সংকীর্তন-প্রধান-যজ্ঞ (ক্রিয়া)-দ্বারা ভগবানের আরাধনা করিয়া থাকেন।

কথমপি সকৃদাত্তং মুক্তিদং প্রাণিনাং যৎ
পরমমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে ॥ (২)

(বৃঃ ভাগবতামৃত ১।১।৯)

শ্রীল সনাতন প্রভু আরও বলেন,—

যেন জন্মশতৈঃ পূর্বং বাসুদেবঃ সমর্চিতঃ।
তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত ॥ (৩)

(হঃ ভঃ বি ১১।২৩৭ সংখ্যাধৃত শাস্ত্রবাক্য)

প্রভুপাদ আরও বলিলেন,—চক্রবর্তী ঠাকুর "শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্। নাতিদীর্ঘেন কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি ॥" (ভাঃ ২।৮।৩)—শ্লোকের টীকায় বলেন,—"সোঽপি স্মরণ-প্রযত্নঃ

তন্মধ্যে (অনধিকারীর রূপ-গুণ-পরিকর-লীলা-কীর্তনাদির নিমিত্ত অবৈধ অক্ষরাদি-সংযোগপূর্বক গান অপেক্ষা) কেবল স্বতন্ত্র শুদ্ধনাম-কীর্তনই অতিশয় প্রশস্ত। "কেবলমাত্র হরিনাম, হরিনাম এবং হরিনামই কর্তব্য, এতদ্ব্যতীত কলিযুগে আর অন্য কোন গতি নাই, নাই, নাই" ইত্যাদি শ্লোকেও এই কথা প্রমাণিত হইয়াছে, অর্থাৎ এই শ্লোকোক্ত দৃঢ়-প্রমাণসমূহ কেবলমাত্র শুদ্ধ-নাম-কীর্তনেরই পরম প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন করিতেছে।

(২) যাহা হইতে বর্ণাশ্রমাদি নিজধর্ম, ধ্যান ও অর্চনাদি চেষ্টা বিরত হইয়া যায়, এইরূপ আনন্দস্বরূপ মুরারির নাম পুনঃ পুনঃ জয়যুক্ত হউন। এই নাম যে-কোনরূপে গৃহীত হইলেই (নামাভাস মাত্রেই) প্রাণিগণের মুক্তিদান করিয়া থাকেন। ইহা পরম অমৃতস্বরূপ, ইহাই আমার একমাত্র জীবন ও ভূষণ।

(৩) হে ভরত-বংশাবতংস, যিনি শত শত পূর্ব জন্মে সম্যগ্‌রূপে

শ্রবণ-কীর্তনবতো ভক্তস্ত নাবশ্যক ইতি। শ্রবণ-কীর্তনাধীনমেব স্মরণমিতি।" (৪)

প্রথমং নাম্নঃ শ্রবণমন্তঃকরণ-শুদ্ধর্থমপেক্ষ্যম্। শুদ্ধে চান্তঃকরণে রূপশ্রবণেন তদুদয়যোগ্যতা ভবতি। সম্যগুদিতে চ রূপে গুণানাং স্ফুরণং সম্পদ্যেত সম্পন্নে চ গুণানাং স্ফুরণে পরিকর-বৈশিষ্ট্যেণ তদ্বৈশিষ্ট্যং সম্পদ্যতে। ততস্তেষু নাম-রূপ-গুণ-পরিকরেষু সম্যক্ স্ফুরিতেষু লীলানাং স্ফুরণং সুষ্ঠু ভবতীত্যভিপ্রেত্য সাধনক্রমো লিখিতঃ, এবং কীর্তন-স্মরণয়োশ্চ জ্ঞেয়ম্। (৫)

অথ কীর্তনাদিভিঃ শুদ্ধান্তঃকরণশ্চেদেতন্নির্বিদ্যমানানাম্ ইত্যাদ্যুক্ত-ত্বান্নামকীর্তনাপরিত্যাগেন স্মরণং কুর্যাৎ। (৬)

বাসুদেবের অর্চন করিয়াছেন, তাঁহার মুখেই শ্রীহরির নামসমূহ নিত্যকাল বিরাজমান থাকেন।

(৪) শ্রবণ-কীর্তনকারী ভক্তের স্মরণপ্রযত্নের আবশ্যকতা নাই। শ্রবণ-কীর্তনের অধীনই—স্মরণ।

(৫) অন্তঃকরণ-শুদ্ধির জন্য প্রথমতঃ নামশ্রবণই অপেক্ষণীয় (আবশ্যক)। নামশ্রবণ-ফলে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে পর শ্রীরূপ-বিষয়িণী কথা-শ্রবণ-দ্বারা শ্রীরূপের উদয়যোগ্যতা লাভ হয়। সম্যগ্‌ভাবে শ্রীরূপের উদয় হইলে শ্রীগুণসকলের স্ফূর্তি সম্যগ্‌রূপে সম্পন্ন হয়। শ্রীগুণের স্ফূর্তি হইলে পরিকরগণের বৈশিষ্ট্য-হেতু সেবকের সিদ্ধ পরিচয়-বৈশিষ্ট্য উদিত হয়। অতঃপর নাম, রূপ, গুণ ও পরিকর,—এই সমুদয়ের সম্যক্ স্ফূর্তি হইলে লীলার স্ফূর্তিও যে সম্যগ্‌ভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে, এই অভিপ্রায়েই সাধনক্রম লিখিত হইল। কীর্তন এবং স্মরণ-বিষয়েও এইরূপ ক্রম জানিবে।

(৬) অনন্তর কীর্তনাদিদ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে "হে নৃপ,

কৃষ্ণস্য নানাবিধ কীর্তনেষু
তন্নামসংকীর্তনমেব মুখ্যম্ ।
তৎপ্রেমসম্পজ্জননে স্বয়ং দ্রাক্-
শক্তং ততঃ শ্রেষ্ঠতমং মতং তৎ ॥ (৭)

শ্রীকৃষ্ণনামামৃতমাত্মহৃদ্যং
প্রেম্ণা সমাস্বাদনভঙ্গিপূর্বম্ ।
যৎ সেব্যতে জিহ্বিকয়াঽবিরামং
তস্যাঽতুলং জল্পতু চ কো মহত্ত্বম্ ॥ (৮)

* * * *

বিরক্ত অকুতোভয়াভিলাষী যোগ্য ব্যক্তিগণও হরিনামই অনুক্ষণ কীর্তন করিয়া থাকেন" ইত্যাদি বচনানুসারে নাম-কীর্তন পরিত্যাগ না করিয়াই স্মরণ কর্তব্য।

(৭) বেদ-পুরাণাদি পাঠ, কথা, গীত, স্তুতি প্রভৃতি ভেদে বহু প্রকার কৃষ্ণ-কীর্তনের মধ্যে কৃষ্ণের নাম সংকীর্তনই মুখ্য ; কেননা, একমাত্র নাম সংকীর্তনই অবিলম্বেই কৃষ্ণে প্রেম-সম্পৎ আবির্ভাব করাইতে স্বয়ং অর্থাৎ অন্য-নিরপেক্ষ হইয়াই সমর্থ। এই জন্যই ধ্যানাদি হইতেও নাম-সংকীর্তনের শ্রেষ্ঠতা। নাম-সংকীর্তনই সর্ববিধ ভক্তি-মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ; সজ্জনগণ ইহাই নিশ্চয় করিয়াছেন।

(৮) জিহ্বা-দ্বারা প্রেম-সহযোগে ভক্তিভরে স্বপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের নামামৃত—যাহা সম্যগ্‌রূপে অবিরাম আস্বাদিত হয়, সেই নামামৃত আস্বাদনের কোন তুলনা নাই, কেই বা তাঁহার মহত্ত্ব বর্ণন করিতে পারে ?

একস্মিন্নিন্দ্রিয়ে প্রাদুর্ভূতং নামামৃতং রসৈঃ
আপ্লাবয়তি সর্বাণীন্দ্রিয়াণি মধুরৈর্নিজৈঃ ॥ (৯)

মুখ্যো বাগিন্দ্রিয়ে তস্যোদয় স্বপরহর্ষদঃ।
তৎপ্রভোর্ধ্যানতোঽপি স্যান্নাম-সংকীর্তনং বরম্ ॥ (১০)

নাম-সংকীর্তনং প্রোক্তং কৃষ্ণস্য প্রেমসম্পদি
বলিষ্ঠং সাধনং শ্রেষ্ঠং পরমাকর্ষমন্ত্রবৎ ॥ (১১)

তদেব মন্যতে ভক্তেঃ ফলং তদ্রসিকৈর্জনৈঃ।
ভগবৎপ্রেমসম্পত্তৌ সদৈবাব্যভিচারতঃ ॥ (১২)

সল্লক্ষণং প্রেমভরস্য কৃষ্ণে
কৈশ্চিদ্রসজ্ঞৈরুত কথ্যতে তৎ।
প্রেম্নোভরেণৈব নিজেষ্টনাম-
সংকীর্তনং হি স্ফুরতি স্ফুটার্ত্যা ॥ (১৩)

---

(৯) শ্রীনামামৃত একটি ইন্দ্রিয়ে আবির্ভূত হইয়া স্বীয় মধুর রসে সমগ্র ইন্দ্রিয়কেই প্লাবিত করিয়া থাকে।

(১০) নিজের এবং পরের অর্থাৎ কীর্তন কারীর ও শ্রোতার হর্ষপ্রদ নাম-সংকীর্তন সাক্ষাদ্রূপে বাগিন্দ্রিয়েই উদিত হইয়া থাকে। অতএব প্রভুর ধ্যান হইতেও নাম সংকীর্তনই শ্রেষ্ঠ।

(১১-১৩) শ্রীকৃষ্ণের নাম-সংকীর্তনই পরমাকর্ষক মন্ত্রের ন্যায় প্রেম-সম্পত্তির বলিষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ সাধন বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অহো! শ্রীনাম-সংকীর্তনকে শ্রেষ্ঠ সাধনই বা বলি কেন? রসিকজন শ্রীনাম-সংকীর্তনকেই ভক্তির ফল বলিয়া বিচার করেন, কারণ, ভগবানে প্রেম-

নাম্নান্তু সংকীর্তনমার্তিভারা-
ন্মেঘং বিনা প্রাবৃষি চাতকানাম্।
রাত্রৌ বিয়োগাৎ কুররীরথাঙ্গী-
বর্গস্থ চাক্রোশনবৎ প্রতীহি॥ (১৪)

ধ্যানং পরোক্ষে যুজ্যেত ন তু সাক্ষান্মহাপ্রভোঃ।
অপরোক্ষে পরোক্ষেঽপি যুক্তং সংকীর্তনং সদা॥ (১৫)

সম্পত্তি আবির্ভাব করাইতে সর্বদা 'নাম-সংকীর্তনই' অব্যর্থ; তজ্জন্য নাম-সংকীর্তনকেই 'সাধ্য' বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। কোন কোন রসজ্ঞ পুরুষগণ নাম-সংকীর্তনকেই প্রেমের স্বরূপ বলিয়া বিচার করেন। নাম-সংকীর্তনই শ্রীকৃষ্ণে প্রেমপ্রাচুর্যের সমুৎকৃষ্ট লক্ষণ, যেহেতু নিজ ইষ্টের নাম-সংকীর্তন হৃদয়ের আর্তির সহিত প্রেমের ভরেই স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হয়। অতএব নাম-সংকীর্তন ও প্রেমের পরস্পর কার্য-কারণতা-সম্বন্ধ-হেতু অভেদই সিদ্ধ হইল।

(১৪) বর্ষাকালে মেঘ বিনা চাতক-কুলের আর্তস্বরে 'প্রিয়' 'প্রিয়'— এইরূপ আহ্বানের ন্যায় এবং রাত্রিকালে পতি-বিরহ-বিধুরা কুররী ও চক্রবাকীবর্গের ন্যায় ভক্তসকল বিরহজ প্রেমের সহিতই নাম-সংকীর্তন করিয়া থাকেন, অর্থাৎ পরমার্তিসহকারে বিচিত্র-মধুর-গাথা-প্রবন্ধে ভগবানের নাম-সংকীর্তনই কর্তব্য।

(১৫) মহাপ্রভুর ধ্যান পরোক্ষেই যুক্তিযুক্ত হয়, সাক্ষাতে ধ্যান যুক্তিযুক্ত হয় না; পরন্তু সংকীর্তন অপরোক্ষ ও পরোক্ষ সর্বদাই যুক্তিযুক্ত হইয়া থাকে।

শ্রীমন্নামপ্রভোস্তস্য শ্রীমূর্ত্তেরপ্যতিপ্রিয়ম্।
জগদ্ধিতং সুখোপাস্যং সরসং তৎ সমং ন হি ॥ (১৬)

(শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে ২য় খণ্ডে ৩য় অধ্যায়ে)

---

(১৬) শ্রীভগবানের সর্বশোভা-সম্পত্ত্যতিশয়যুক্ত 'শ্রীনাম' নিজ বিগ্রহ হইতেও তাঁহার অতিশয় প্রিয়, কেননা, শ্রীনাম সর্বকালে, সর্বস্থানে, সর্বপাত্রে নিজ মহিমা-প্রাচুর্যের সহিত প্রকাশমান। শ্রীনাম অধিকারী অনধিকারী অপেক্ষা করেন না বলিয়াই 'ভুবনমঙ্গল' নামে উক্ত হন ; যেহেতু উহা সুখোপাস্য অর্থাৎ জিহ্বাগ্র-মাত্র-দ্বারাই শ্রীনামের সেবা করা যায়। ঐ শ্রীভগবন্নাম—সরস অর্থাৎ মধুরাক্ষরময় অথবা সচ্চিদানন্দ রসময় কিম্বা অশেষ রসের সহিত বর্তমান শৃঙ্গারাদি নবরসের মধ্যে ভক্তি ও প্রেম-রসে তথা বিরহ ও সঙ্গমে স্ফূর্তি পাইয়া থাকেন বলিয়া শ্রীনাম 'সরস' অথবা রস অর্থাৎ আত্মার সাহজিক রাগের সহিত বর্তমান বলিয়া সরস ; কারণ শ্রীনাম অব্যর্থরূপে আশু ভগবৎপ্রেম সম্পাদন করিয়া থাকেন এবং স্বসেবক নিখিল জনেরই অনুরাগ জন্মাইয়া থাকেন কিংবা 'রস' অর্থাৎ বীর্যবিশেষ বা পরম-শক্তিমত্তার সহিত বর্তমান বলিয়া শ্রীনাম 'সরস' কিম্বা অখিল দীনজননিস্তারকারক বা পরম মধুর বলিয়া 'সরস', অতএব শ্রীনামের সমান অন্য কিছুই নাই।

[গৌড়ীয় (সাপ্তাহিক) ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১৪শ সংখ্যা ২২৫-২২৮ পৃষ্ঠা]

পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদ

[কলিকাতা ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপদেশক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার এম, এ মহাশয়ের নিকটে হরিকথা।]

শ্রীচৈতন্যদেব সাধারণ লোকের ধারণায় জাতিভেদ মানা বা না মানা ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, বরং অভক্ত কর্মজড় সমাজে যাহাতে উচ্ছৃঙ্খলতা উপস্থিত না হয় এবং অজ্ঞান কর্মসঙ্গিগণের বুদ্ধিভেদ জন্মিলে পাছে জগতে আরও অধিকতর উৎপাত উপস্থিত হয়, তজ্জন্য তিনি বঞ্চিত অভক্তকুলকে বিমোহিত করিয়া তাহাদের দৃষ্টিতে বাহ্যে লোক-ব্যবহার স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু ভক্তগণে তিনি কোনদিন জাতিবুদ্ধি করেন নাই। তিনি অভক্ত ব্রাহ্মণব্রুবের অন্ন গ্রহণ করেন নাই; তিনি বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ, লক্ষ হরিনাম গ্রহণকারী ব্রাহ্মণ, এমন কি অস্পৃশ্যতোয় সানোড়িয়ার হস্তে পর্যন্ত তাঁহাদের হরিভক্তি দর্শনে উঁহাদিগকে ভোজ্যান্ন ব্রাহ্মণবিচারে তাঁহাদের হস্তে অন্ন গ্রহণ করিয়াছেন। আবার তিনি দাস গোস্বামীর নিকট হইতে মহাপ্রসাদ কাড়িয়া লইয়া খাইয়াছেন। তাঁহার অভিন্নস্বরূপ জগদ্‌গুরুনিত্যানন্দ দ্বারা তিনি যে-কোন কুলব্রুব ভক্তগণের পাচিত অন্ন গ্রহণ করাইয়া বৈষ্ণবে ও মহাপ্রসাদে জাতিবুদ্ধি বা ভাত-ডাল বুদ্ধি করা অত্যন্ত অপরাধের কথা, এই উপদেশই জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন। বর্তমান অদৈব কর্মজড় স্মার্তসমাজ-প্রচলিত জাতিভেদ-প্রথা এবং ব্রাহ্মসমাজ-প্রবর্তিত উচ্ছৃঙ্খলতা উভয়ই মৎসরতাযুক্ত। কর্মজড়স্মার্তগণ ও তথাকথিত ব্রাহ্মণ উভয়েই পরস্পর মৎসরতা ও প্রতিহিংসামূলে একে

অন্যের প্রতি বিরোধ পোষণ করেন। কিন্তু বৈষ্ণবগণ নির্মৎসর, তাঁহাদের যাবতীয় কার্য কৃষ্ণসেবানুকূলপর পূর্বোক্ত পরস্পর বিরোধী সমাজের ন্যায় স্ব-স্ব ভোগপর নহে। বৈষ্ণবের বিচারে যে কার্যে কৃষ্ণসেবাগন্ধ নাই, সে কার্য জাগতিক বিচারে পরম শ্লাঘ্য হইলেও অত্যন্ত ঘৃণ্য। শ্রীমন্মহাপ্রভু দৈব বিষ্ণুভক্তিপর বর্ণাশ্রমে অবস্থিত হইয়া হরিভজনের আদেশ করিয়াছেন। বর্তমানে ধর্ম বিকৃত সমাজের অধীন হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ—সমাজ চিরকালই বিশুদ্ধ ভক্তিধর্মের অধীন থাকিবে, তবেই হরিসেবানুকূল বলিয়া সমাজের মূল্য, নতুবা উহা অদৈব বা আসুর সমাজ।

শ্রীল পরমহংস ঠাকুর আরও বলিলেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধ মতাবলম্বী বৈষ্ণবগণ কখনও স্বতন্ত্র ঈশ্বরজ্ঞানে বহু দেবতার উপাসনা করেন না বা কাঠের পুতুল, মাটীর পুতুল পূজা করেন না—তাঁহারা পৌত্তলিক নহেন। [এই কথা শ্রবণ করিয়া উক্ত * * * মহোদয় অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিলেন—"মহাশয়, তবে যে আমাদের গ্রামে 'বৈষ্ণবগণকে' (?) নানা দেবদেবীর পূজা করিতে আমরা দেখিতে পাই! শ্রীল পরমহংস ঠাকুর বলিলেন,] ঐ সকল ব্যক্তি বৈষ্ণব-নামধারী হইলেও বিশুদ্ধ চৈতন্যচন্দ্রানুগত বৈষ্ণব নহে। যাঁহাদের হৃদয় মহাবদান্য শ্রীচৈতন্যদেবের পরমোদার আত্মধর্মের মহত্ত্ব এবং শ্রীরূপানুগ ভজনের শ্রেষ্ঠত্ব ও পরম মাধুর্যের একটু আভাসালোক স্পর্শ করিয়াছে, তাঁহারা কখনও শ্রীকৃষ্ণের নিত্য উপাসনা ব্যতীত সকাম নানাদেবসেবী হইয়া কৈতবযুক্ত ধর্মার্থকামমোক্ষের প্রার্থী হইতে পারেন না। দৈবকর্তৃকই যাঁহাদের অদৃষ্ট খারাপ, সেইরূপ দুষ্কৃত ব্যক্তিগণ এই কথার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না। বৈষ্ণবের শ্রীবিগ্রহ অর্চন ও অবৈষ্ণবের পুতুলপূজা এক নহে। বৈষ্ণবের শ্রীবিগ্রহ

অনিত্য বা জড়বস্তু নহেন। ভগবান্‌কে নিরাকার আখ্যা প্রদান করিলে তাঁহার নিত্য সচ্চিদানন্দ-রূপ ও তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিত্বের অর্থাৎ সর্বশক্তিমত্তার অভাব কল্পিত হয়। ভগবানের জড়ীয় রূপ নাই বটে, কিন্তু তিনি নিরাকার নন। অতাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ ভগবৎস্বরূপ-জ্ঞান-লাভে অসমর্থ হইয়া ভক্তগণসেবিত অবিমিশ্র চিদ্বিলাস-প্রকটিত শ্রীবিগ্রহ-সেবাকে পৌত্তলিকতা বলিয়া নিন্দা করেন। পাশ্চাত্য-দেশীয়গণের অসম্পূর্ণ ধর্ম ও খ্রীষ্টীয়ানগণের অক্ষজবিচার ও তদুভয়ের অনুগত ব্রাহ্মধর্ম অক্ষজ জ্ঞানোন্মত্ত হইয়া শ্রীবিগ্রহের অপ্রাকৃত সেবা-প্রথার নিন্দা করিয়া থাকেন। অবশ্য যাঁহারা মনে করেন, ব্রহ্ম নিরাকার ও নির্বিশেষ, তাঁহার স্বরূপ বা বিগ্রহ নাই, কিন্তু সেই নিরাকারতত্ত্ব উপলব্ধির উদ্দেশ্যে কিছু সময়ের জন্য কল্পিত ও অনিত্য আকৃতি সৃষ্টি করিয়া তাঁহার উপাসনা করা কর্তব্য—এইরূপ বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ পৌত্তলিক। ভক্তের নিকট শ্রীবিগ্রহ নিত্য চিন্ময় স্বরূপ-বিগ্রহের অর্চাবতার। শ্রীবিগ্রহ নিত্যচিন্ময় ভগবৎস্বরূপের সাক্ষাৎ নিদর্শন, তাহা অন্য বস্তু নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ৬ পৃঃ)—

ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার।
শ্রীবিগ্রহ যে না মানে, সেই ত পাষণ্ডী।
অস্পৃশ্য অদৃশ্য সেই, হয় যমদণ্ডী॥

শ্রীল পরমহংস ঠাকুর আরও বলিলেন যে, তথাকথিত কর্মজড় স্মার্তসমাজ ও তদ্‌বিরোধী ইংরেজী চালচলন-অনুকরণকারী সমাজ উভয়েই গৃহব্রতধর্ম ও যোষিৎসেবার পক্ষপাতী। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, গৃহব্রত ও যোষিৎসঙ্গী বা যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গিগণের কৃষ্ণে মতি হইতে পারে না। ইঁহারা যদি নিজ নিজ মনোধর্মের কথা পরিত্যাগ করিয়া

নিষ্কিঞ্চন হরিজনের উপদেশ গ্রহণ করেন এবং তাঁহার চরণে আত্ম-নিবেদন করেন, তবেই ইঁহাদের মঙ্গল হইতে পারে।

* * * *

বৌদ্ধধর্ম

শ্রীবুদ্ধদেব বিষ্ণুর অবতার। আমাদের শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ বলেন (ভাঃ ১।৩।২৫)—

ততঃ কলৌ সংপ্রবৃত্তে সংমোহায় সুরদ্বিষাম্।
বুদ্ধো নাম্না জিনসুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি ॥

একবিংশাবতারে কলিযুগ সমাগত হইলে দেববিদ্বেষী তামসিক লোকসমূহের সম্মোহনের জন্য বিষ্ণু 'বুদ্ধ' এই নামে জিন-পুত্ররূপে কীকট প্রদেশে অবতীর্ণ হইবেন। সুতরাং বুদ্ধদেব বিষ্ণুর অবতার ও বৈষ্ণবের মান্য, কিন্তু তিনি অসুর-মোহনের জন্য যে মত প্রচার করিবেন, তাহা বৈষ্ণবগণ গ্রহণ করিবেন না। যেমন শ্রীমন্মহাপ্রভু শঙ্করাচার্য-সম্বন্ধে বলিয়াছেন (চৈঃ চঃ মধ্য ৬)—

আচার্যের দোষ নাহি ঈশ্বর আজ্ঞা হৈল।
অতএব কল্পনা করি নাস্তিক শাস্ত্র কৈল ॥

শঙ্করকে মহাপ্রভু 'আচার্য' বলিয়া স্বীকার করিলেন ; কিন্তু আচার্যের নাস্তিক মত অসুর-বিমোহনের জন্য নৈমিত্তিক প্রয়োজনপর, সুতরাং নিত্যধর্মযাজী বৈষ্ণবের গ্রহণীয় নহে। বৈষ্ণবগণ বুদ্ধ-শ্রীমূর্তি বা শঙ্করের প্রতিমূর্তি দর্শন করিলে প্রথমোক্ত শ্রীমূর্তিকে বিষ্ণু ও শেষোক্ত প্রতিমূর্তিকে বৈষ্ণবজ্ঞানে প্রণামাদি করিবেন ; কিন্তু তাঁহাদের অসুর-বিমোহনপর বৌদ্ধবাদ বা মায়াবাদ গ্রহণ করিবেন না। শ্রীগীতগোবিন্দ-লেখক শ্রীজয়দেব গোস্বামী বৈষ্ণব ছিলেন ; তিনি স্তবে লিখিয়াছেন—

"নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতম্
সদয়-হৃদয়-দর্শিত-পশুঘাতম্।
কেশবধৃত-বুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে ॥"

সুতরাং বৈষ্ণবগণ যে চক্ষে বুদ্ধদেব দর্শন ও শ্রদ্ধা করেন, তাহা হইতে বৌদ্ধগণের দর্শন পৃথক্। বৈষ্ণবগণ আস্তিক। তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে কায়মনোবাক্যে অহিংসা যাজন করেন। বৌদ্ধগণ মুখে 'অহিংসা পরম ধর্ম' বলিয়াও ভাগবতীয় "নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাৎ" এই দশম স্কন্ধের শ্লোকানুসারে পশুঘাতী বা আত্মঘাতী। এমন কি, তাঁহাদের প্রাথমিক সদাচার পর্যন্ত নাই, উহারা কেহ কেহ মৃত প্রাণীর মাংস-ভোজনাদিকার্যে ব্যস্ত। সুতরাং বিষ্ণুর অবতার বুদ্ধদেবের শ্রীমূর্তি বৈষ্ণবের দ্বারা পূজিত হইলেই তাঁহার যথার্থ পূজা হয়।

শ্রীল পরমহংস ঠাকুর বলিলেন যে, বুদ্ধদেবের মন্দির সদাচারী হিন্দুর হস্তেই থাকা যুক্তিযুক্ত, তবে সেই স্থানে যাহাতে ছাগবলি প্রভৃতি না হয় এবং যাহাতে সাত্ত্বিক বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণের দ্বারা শ্রীবুদ্ধদেবের অর্চা বিগ্রহের পূজা হয়, তৎসম্বন্ধে হিন্দুপক্ষ হইতে যত্ন করা কর্তব্য। তৎপরে শ্রীল পরমহংস ঠাকুর বৌদ্ধছাত্রগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাঁহারা বুদ্ধদেবের শ্রীমূর্তিকে বুদ্ধদেবের বাস্তবসত্তা (Personality) হইতে পৃথক্ মনে করেন অথবা এক ভাবেন? তাঁহারা বলিলেন যে, বুদ্ধদেবের মূর্তিকে তাঁহারা বুদ্ধদেবের স্মৃতিচিহ্ন—Emblem মাত্র মনে করেন। শ্রীল পরমহংস ঠাকুর তদুত্তরে বলিলেন যে, বৈষ্ণবগণ শ্রীমূর্তিকে মূর্তবিগ্রহের বাস্তব স্বরূপসত্তা হইতে সর্বতোভাবে অভিন্ন জ্ঞান করেন। বৌদ্ধবাদ অচিন্মাত্রবাদ ও শাঙ্করমতবাদ চিন্মাত্রবাদ —প্রাকৃত চিন্তাস্রোত হইতে পরিপুষ্ট—উহা আরোহবাদীর অক্ষজ জ্ঞানোত্থ চেষ্টা। শ্রীমন্মহাপ্রভু উভয় মতকেই নাস্তিকমত বলিয়া

প্রতিপাদন করিয়াছেন। প্রথমোক্ত মতটী বেদ-বিরোধী নাস্তিক্যবাদ; দ্বিতীয় মতটী মুখে বেদ স্বীকার করিলেও প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—(চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৬৮)

"বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় ত' নাস্তিক।
বেদাশ্রয়া নাস্তিক্যবাদ বৌদ্ধকে অধিক॥"

সুতরাং অচিন্মাত্রবাদ যেমন নাস্তিক্যবাদ, চিন্মাত্রবাদও তদ্রূপ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত জনৈক মহাপণ্ডিত বৌদ্ধাচার্যের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। আমাদের শ্রীমন্মহাপ্রভু উক্ত বৌদ্ধাচার্যের নাস্তিক্যবাদপূর্ণ পাণ্ডিত্যকে শাস্ত্রযুক্তিদ্বারা খণ্ডিত করিয়া দেন।

"যদ্যপি অসম্ভাষ্য বৌদ্ধ অযুক্ত দেখিতে।
তথাপি বলিল প্রভু গর্ব খণ্ডাইতে॥
বৌদ্ধাচার্য 'নবপ্রশ্ন' সব উঠাইল।
দৃঢ় যুক্তিতর্কে প্রভু খণ্ড খণ্ড কৈল॥
দার্শনিক পণ্ডিত সবাই পাইল পরাজয়।
লোকে হাস্য করে বৌদ্ধ পাইল লজ্জা ভয়॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ৯ম)

বিশ্বে গোলোকদর্শনাদি প্রসঙ্গ

[কলিকাতা ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড্‌স্থিত শ্রীগৌড়ীয়মঠে ১৩৩২ বঙ্গাব্দে ৫ই আশ্বিন তারিখে কীর্ত্তিত]

"ত্বয়োপযুক্তস্রগ্‌গন্ধবাসোঽলঙ্কারচর্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েমহি॥"

আপনারা এই বিশ্বের যাবতীয় বস্তুকে কৃষ্ণসেবোপকরণরূপে দর্শন করুন। এই জগতের যাবতীয় বস্তুই কৃষ্ণ-সেবার সামগ্রী। যেদিন আপনারা দ্বিতীয়াভিনিবেশের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন, বাসুদেবময় জগৎ দর্শন করিতে পারিবেন, সেইদিন আপনাদের এই বিশ্ব-স্বরূপেই গোলোক দর্শন হইবে। আপনারা সমগ্র নারীজাতিকে কৃষ্ণকান্তারূপে দর্শন করুন, তাঁহাদিগকে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করুন, তাঁহাদের উপর কোন প্রকার ভোগবুদ্ধি করিবেন না। তাঁহারা কৃষ্ণভোগ্যা, জীবের কখনও ভোগ্যা নহেন। আপনারা পিতামাতাকে নিজের ইন্দ্রিয়ভোগ্য সামগ্রীরূপে দর্শন না করিয়া কৃষ্ণের পিতৃমাতৃগণরূপে দর্শন করুন, আপনারা পুত্রকে নিজ ইন্দ্রিয়তর্পনের সামগ্রী না ভাবিয়া শ্রীবাল-গোপালের সেবকের গণরূপে দর্শন করিতে শিক্ষা করুন, কদম্ব দর্শন করুন, যমুনা ও যামুন সৈকত দর্শন করুন, চন্দ্রিকা দর্শন করুন, আপনাদের বিশ্বানুভূতি থাকিবে না, গোলোক-দর্শন হইবে, গৃহে গোলোকের সৌন্দর্য প্রকাশিত হইবে, তখন আর মায়িক গৃহবুদ্ধি থাকিবে না, গৃহব্রত ধর্মের হাত হইতে ছুটি পাইবেন।

* * * *

আদর্শ বিষ্ণুপ্রিয়া-পল্লী

আমাদের বহুস্থানে মঠ হইতেছে এবং তাহাতে বহু সন্ন্যাসী, গৃহস্থ ও ব্রহ্মচারিগণ বাস করিয়া সদাচার শিক্ষা করিবার সুযোগ পাইতেছেন; কিন্তু মাতৃগণের হরিভজনের সুযোগ প্রদানের জন্যও আমরা বহুদিন হইতে চেষ্টা করিতেছি। অবশ্য যাঁহারা গৃহে থাকিয়া হরিভজন করিবার সুযোগ ও সুবিধা লাভ করিতে পারেন, সেই সকল মাতৃগণের পৃথক্ আবাসের দরকার নাই। কিন্তু আমরা অনেক সময় তাঁহাদের অনেকের অসৎসঙ্গ-জনিত হরিভজনের ব্যাঘাতের কথা শুনিতে পাই। তাঁহাদের জন্য শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর গৃহের নিকট শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াপল্লী নির্মাণের চেষ্টা করিলে তাঁহারা সেই স্থানে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অবস্থান করিয়া যদি হরিভজন করেন, তবে তাঁহাদের মঙ্গল হইতে পারে। তাঁহারা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর গণ, সুতরাং শ্রীমন্মহাপ্রভুর গৃহে থাকিয়া শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আনুগত্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা করাই তাঁহাদের পক্ষে সমীচীন। সেখানে কোন প্রকার অন্য লোকের সংস্রব থাকিবে না, কেবল কয়েকজন ঈশান (যেমন বৃদ্ধ ঈশান শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসলীলার পর শচীমাতা ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছিলেন) দূরে থাকিয়া বিষ্ণুপ্রিয়াগণের রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। মাতৃগণ পরস্পর কলহাদি না করিয়া যদি হরিভজন করিবার জন্য অবস্থান করেন, প্রত্যহ শ্রীগ্রন্থপাঠ, পরস্পর সদালোচনা, প্রজল্পাদি সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করিয়া শুদ্ধভক্তি-বিষয়ক ইষ্ট-গোষ্ঠী, সর্বতোভাবে বিলাসাদি বর্জন, কেবলমাত্র হরিভজন করিবার জন্য জীবন ধারণার্থ মহাপ্রসাদের সম্মান, আদর্শ জীবন যাপন, নিরন্তর শ্রীনামগ্রহণ, শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা-সামগ্রীর রক্ষণাবেক্ষণ ও সর্বতোভাবে তাঁহার

সেবা করিয়া কালযাপন করেন, তাহা হইলে এইরূপ একটি আদর্শ বিষ্ণুপ্রিয়া-খর্বট হওয়া আবশ্যক। কুলিয়া সহরে যে প্রকার ধর্মের আবরণে ঘৃণ্য ব্যভিচার চলিতেছে, মাতৃগণকে ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তিগণ ধর্মের মুখোস দিয়া হরিভজন দূরে থাকুক, সামান্য নীতি বিগর্হিত কার্যে পরিচালিত করিতেছেন তাহা নিতান্ত শোচ্য। একটু নীতিপরায়ণ ব্যক্তিমাত্রই এইজন্য কুলিয়া সহরের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন ও পড়িতেছেন।

শ্রীচৈতন্যের বাণী-সেবার প্রভাব

শ্রীচৈতন্যচন্দ্র পরম পরিপূর্ণ চেতন বস্তু। যিনি এই চৈতন্যচন্দ্রকে ভজনা না করিবেন, তাঁহার উপদেশ যাঁহার কর্ণদ্বারে প্রবিষ্ট না হইবে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই অচেতন বস্তু। বর্তমান সমাজ শ্রীচৈতন্যের চেতনময়ী বাণী শ্রবণ না করাতে বহু বাহ্য বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়িতেছেন। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের দয়া যিনি বিচার করিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছেন, তাঁহার নিরন্তর চৈতন্য-চরণ-কমল-সেবা ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষ মুহূর্তের জন্যও হৃদয়ে উদিত হইতে পারে না। তাই শ্রীকবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

"চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥"

* * * *

চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা-কথা যে পরিমাণে যাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তিনি সেই পরিমাণে চৈতন্যের সেবায় লুব্ধ হইয়াছেন। যিনি পূর্ণভাবে সেই পরিপূর্ণ চেতন-বিগ্রহের কথা শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি তাঁহার সেবায় পূর্ণভাবে নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচন্দ্র ষোলকলা

বিশিষ্ট পরিপূর্ণ বস্তু, সুতরাং তাঁহার চেতনময়ী কথা জীবের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে জীবকে ষোল আনা তাঁহার পাদপদ্মে আকৃষ্ট করিবেই করিবে। যিনি আংশিকভাবে তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি শ্রীচৈতন্যের পাদপদ্মে আংশিকভাবে নিজকে প্রদান করিয়াছেন। যতদিন পর্যন্ত জীব দেহ, গেহ, পুত্র, কলত্র, কায়মনোবাক্য যথাসর্বস্ব দ্বারা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের সেবায় নিরন্তর উন্মত্ত না হইয়াছেন, ততদিন পর্যন্ত তাঁহার ষোল আনা শ্রীচৈতন্যের কথা শ্রবণ করা হয় নাই জানিতে হইবে।

"যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্বলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতিধীঃ শ্বশৃগালভক্ষে ॥"

* * * *

শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীচরণ আশ্রয় ব্যতীত শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপালাভ অসম্ভব

শ্রীনিত্যানন্দের পদকমল আশ্রয় ব্যতীত শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপালাভ হয় না। নিত্যানন্দের পদাশ্রয় হইলে জীবের বিবর্তবুদ্ধি দূর হয়। তখন জীব আর অসত্যকে সত্য বলিয়া বহুমানন করে না। (শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—)

"নিতাই-পদ-কমল, কোটিচন্দ্র সুশীতল,
যে ছায়ায় জগত জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি ধর নিতাইর পায় ॥

সে সম্বন্ধ নাহি যা'র, বৃথা জন্ম গেল তা'র,
সেই পশু বড় দুরাচার।
নিতাই না বলিল মুখে, মজিল সংসার সুখে,
বিদ্যা-কুলে কি করিবে তার ॥
অহঙ্কারে মত্ত হঞা, নিতাই-পদ পাসরিয়া,
অসত্যেরে সত্য করি' মানি।
নিতাইর করুণা হবে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে,
ভজ তাঁর চরণ দুখানি ॥
নিতাই চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য,
নিতাই পদ সদা কর আশ।
এ অধম বড় দুঃখী, নিতাই মোরে কর সুখী,
রাখ রাঙ্গা চরণের পাশ ॥"

* * * *

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়, শ্রীল আচার্য প্রভু, শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু এইরূপ দৃঢ়তার সহিত নিত্যানন্দের চরণ আশ্রয় করিবার জন্য জীবকুলকে আহ্বান করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের অপ্রকটের কিছুকাল পর হইতে অনাদি-বহির্মুখ-সমাজ তাঁহাদের মঙ্গলময়ী শিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া, অসত্যকে সত্য বলিয়া গ্রহণপূর্বক সমাজে ধর্মের নামে কলঙ্ক, বৈষ্ণবতার নামে ইন্দ্রিয়তর্পণ, কত কি অনর্থ আনয়ন করিয়াছেন! গত তিন শত বৎসরের বৈষ্ণবজগতের ইতিহাস ঘোর তমসাচ্ছন্ন; কেবল তন্মধ্যে কদাচিৎ দুই একটি ভজনানন্দ পুরুষ নিজে নিজে ভজন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা এতদূর বহির্মুখ সমাজের মধ্যে শুদ্ধ ভক্তিকথা আলাপ করিবার জন্য খুব কম লোকই পাইয়াছেন।

আমরা মনে করিয়াছিলাম, শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময় যে সকল বিশুদ্ধাত্মা পুরুষ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ঐ প্রকার মহদ্ব্যক্তির দর্শন বোধ হয় আর আমাদের ভাগ্যে ঘটিবে না। কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর আমাদের ভাগ্যে এমন সব মহাত্মা মিলাইয়া দিয়াছেন যে, তাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকটকালীয় ভক্ত অপেক্ষা ন্যূন নহেন। তাঁহারা সর্বক্ষণ হরিভজন ও হরিকীর্তন করিতেছেন।

* * * *

শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের নাম সম্বন্ধে বিচার

"কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার।
কৃষ্ণ বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার॥

* * * *

চৈতন্য-নিত্যানন্দে নাহি এসব বিচার।
নাম লইতে প্রেম দেন বহে অশ্রুধার॥"

অনর্থযুক্তাবস্থায় অপ্রাকৃত কৃষ্ণনাম কীর্তিত হন না। অপরাধময় কৃষ্ণনাম বা নামাপরাধ আমাদিগকে কোটি জন্ম কীর্তন করিলেও কৃষ্ণপদে প্রেমদান করে না। কিন্তু গৌর-নিত্যানন্দের নামে অপরাধের বিচার নাই। অনর্থযুক্তাবস্থায় জীব যদি নিষ্কপট ভগবদ্বুদ্ধিতে গৌর-নিত্যানন্দের নাম গ্রহণ করেন, তবে তাহার অনর্থ দূরীভূত হয়। কিন্তু যদি গৌর-নিত্যানন্দে ভোগবুদ্ধি লইয়া অর্থাৎ 'গৌর-নিত্যানন্দ আমার উদরভরণ, প্রতিষ্ঠাসংগ্রহ বা আমার মনোধর্মের ছাঁচে গড়া আমার ইন্দ্রিয়ভোগ্য কোন বস্তু' এই জ্ঞানে মুখে "গৌর গৌর" করি, তাহা হইলে আমাদের গৌর-নাম-কীর্তন হইবে না, ভোগের ইন্ধনস্বরূপ

মায়ার নাম কীর্তন হইবে মাত্র। 'গৌর' নাম কীর্তিত হইলেই নাম লইতে প্রেমের উদয় হইবে, সর্ব অনর্থ দূরীভূত হইয়া যাইবে। কলিকাতা হইতে হাওড়া দুই মাইল পশ্চিমে। কেহ যদি দুই মাইল পূর্বদিকে হাঁটিয়া আসিয়া বলেন যে, যখন আমি কলিকাতা হইতে দুই মাইল দূরে আসিয়া পড়িয়াছি তখন নিশ্চয়ই হাওড়ায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি। সেই ব্যক্তির এইরূপ কল্পনা করিবার অধিকার আছে। কিন্তু তাহার কল্পিত হাওড়ায় আসিয়া সে ব্যক্তি ট্রেণ ধরিতে পারিবে না। সুতরাং তাহার গন্তব্য স্থানে যাওয়াও হইবে না। একবার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, বরিশালে এক সম্প্রদায় এক সময়ে 'প্রাণ গৌর নিত্যানন্দ, প্রাণ গৌর নিত্যানন্দ' বলিতে বলিতে ডাকাতি করিয়াছিল। ঐরূপ ডাকাতের দলের গৌরনিত্যানন্দ-নামাক্ষর গৌরনিত্যানন্দের নাম নহে।

* * * *

শ্রীগৌরতত্ত্ব

ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের মঙ্গলাচরণে যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রণাম করিয়াছেন, তাহাতে শ্রীগৌরসুন্দরের তত্ত্ব অতি সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে—

"নমস্ত্রিকালসত্যায় জগন্নাথসুতায় চ।
সভৃত্যায় সপুত্রায় সকলত্রায় তে নমঃ॥"

শ্রীগৌরসুন্দর ত্রিকাল সত্যবস্তু। অক্ষজ দ্রষ্টা, যে প্রকার গৌরসুন্দরকে শ্রীমর্ত্যজীবের ন্যায় জগতে কোন একসময়ে প্রকট এবং কিছুকাল পরে অপ্রকট দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে 'মহাপুরুষ' বা

কিছুকালের জন্য উদিত একটি 'ধর্মপ্রচারক' মাত্র মনে করেন এবং তাঁহার ধর্মপ্রচারে তাৎকালিক উপযোগিতা প্রভৃতি কল্পনা করিয়া তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ-দান এবং নিত্যচরমপ্রয়োজনলাভ হইতে বঞ্চিত হন, শ্রীগৌরসুন্দর সেইরূপ বস্তু নহেন। তিনি ত্রিকাল সত্য বাস্তব বস্তু। তিনি জগন্নাথ মিশ্রের নন্দন অর্থাৎ আনন্দবর্ধক। জগন্নাথ মিশ্র পিতৃরূপে তাঁহার সেবক। তিনি বিষ্ণুপরতত্ত্ব; আর কেহ তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে বড় নহেন, পিতামাতা গুরুবর্গও গুরুরূপে সেই অসমোর্ধ পরতত্ত্বেরই সেবক (চৈঃ চঃ আদি ৬ষ্ঠ)—

পিতা-মাতা-গুরু-সখা-ভাবে কেনে নয়।
কৃষ্ণপ্রেমের স্বভাব দাস্যভাব সে করয়॥

প্রভুবংশের তথ্য

সেই গৌরসুন্দর ভৃত্যবর্গের সহিত, নিজ পাল্যবর্গের সহিত এবং শক্তিবর্গের সহিত অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্বরূপে নিত্য বিরাজিত। তিনি নিত্যবস্তু, ত্রিকাল সত্যবস্তু, সুতরাং তাঁহার ভৃত্যবর্গ; পাল্যবর্গ ও শক্তিবর্গও নিত্য। 'ভৃত্য'-শব্দের দ্বারা তাঁহার সেবকগণকে বুঝাইতেছে। আর যাঁহারা তাঁহার সেবার দ্বারা তাঁহার অন্তরঙ্গ পাল্যবর্গমধ্যে গণিত হইয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার পুত্র। "আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ"— শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার পাল্যবর্গের পিতা। তিনি তাঁহার পাল্যবর্গের বিশুদ্ধ চিত্তে উদিত হইয়া শ্রীনামপ্রেম প্রচার করিতেছেন। ইঁহারাই তাঁহার পুত্র। ইঁহারাই শ্রীগৌরাঙ্গের নিজবংশ। শ্রীভগবানের এই অচ্যুত-গোত্রীয় বংশগণই জগতে শ্রীগৌরসুন্দরের নাম-প্রেম-প্রচার-ধারা রক্ষা করিয়াছেন ও করিতেছেন। আর যাঁহারা অপ্রাকৃত বিষ্ণুবস্তুতে

প্রাকৃতবুদ্ধি করিয়া চ্যুত গোত্রের পরিচয়ে নিত্যানন্দাদ্বৈতকুলের কণ্টকবৃক্ষস্বরূপ হইয়া জগতের মহা অমঙ্গল সাধন করিতেছেন, তাঁহারা 'নিত্যানন্দাদ্বৈতের বংশ' বলিয়া যাহা উদ্দিষ্ট হয়, তাহা নহেন। যাঁহারা গৌর-নিত্যানন্দাদ্বৈতের অন্তরঙ্গ সেবাধিকার লাভ করিয়া নিরন্তর তাঁহাদের মনোঽভীষ্ট প্রচার করিতেছেন, তাঁহারাই শ্রীমন্মহাপ্রভু ও প্রভুদ্বয়ের পাল্য অর্থাৎ পুত্র। শ্রীগৌরনিত্যানন্দ তাঁহাদের নির্মল আত্মায় উদিত হইয়া সুকৃতিমান্ জীবগণের নিকট জগতে বিস্তার লাভ করিতেছেন।

পুত্র পিতাকে পুন্নামক নরক হইতে উদ্ধার করেন বলিয়া পুত্র নামে সংজ্ঞিত হন। যে পুত্র হরিভজন না করিয়া ইতর কার্যে ব্যস্ত, সে 'পুত্র' নামের কলঙ্ক। পিতারও সেই কুলাঙ্গার পুত্রকে পুত্রত্বে স্বীকার বা গ্রহণ করিলে পুন্নামক-নরক হইতে উদ্ধার লাভ ঘটে না। তাঁহার পুত্রোৎপাদন-কার্যটি জীবহিংসাপূর্ণ একটি পাপকার্য মাত্র হইয়া পড়ে। আর যে পুত্র হরিভজন করেন এবং যে পিতা পুত্রকে হরিভজনে নিয়োগ করেন, সেই পুত্রের পিতার পুত্রোৎপাদনরূপ কার্যটিও হরিভজনের অনুকূল ও অন্তর্গত হয়। বৈষ্ণব পুত্রে ও অবৈষ্ণব পুত্রে, বৈষ্ণব পিতায় ও অবৈষ্ণব পিতায় এই ভেদ।

শ্রীগৌরসুন্দর অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন। বৈধ-বিচারে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী তাঁহার কলত্র, আর প্রকৃত প্রস্তাবে ভজন-বিচারে শ্রীস্বরূপ দামোদর, শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত, শ্রীনরহরি ঠাকুর, শ্রীগদাধর পণ্ডিত, শ্রীরায় রামানন্দ প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্তগণ তাঁহার উজ্জ্বল মধুর রসাশ্রিত ত্রিকাল সত্য কলত্র। শ্রীগৌরসুন্দর অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন হইলেও বিপ্রলম্ভাবতার। শ্রীকৃষ্ণ—সম্ভোগময় বিগ্রহ, আর শ্রীগৌরসুন্দর—বিপ্রলম্ভময় বিগ্রহ। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া—প্রেমভক্তিস্বরূপিণী। শাক্তেয়বাদী, মনোধর্মী কতিপয়

ব্যক্তি নিজ ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে গৌরসুন্দরকে মাপিয়া লইবার চেষ্টায় গৌরনাগরীরূপ পাষণ্ড মতবাদের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহারা দৈবী-মায়ায় বিমোহিত হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের উজ্জ্বল মধুর-রসাশ্রিত ভক্তগণের সুনির্মল-ভজন-প্রণালী বুঝিতে না পারিয়া সম্ভোগবাদী হইয়া এইরূপ অনর্থ জগতে প্রচার করিতেছেন। তাঁহাদিগকে গৌরভক্ত না বলিয়া 'গৌরভোগী' বলা ন্যায়-সঙ্গত।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর গার্হস্থ্য লীলা বর্ণন করিতে গিয়া শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীগৌরসুন্দরের এইরূপ স্তব করিয়াছেন, আবার সন্ন্যাসলীলা-বর্ণনে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুও—

"বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্॥

—শ্লোকে তদ্রূপই বর্ণনা করিয়াছেন।

শ্রীগৌর ও শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার বৈশিষ্ট্য

জনৈক ভক্ত—প্রভো! শ্রীমন্মহাপ্রভুই যখন সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ, তখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভজন করিলেই ত' সব হয়, পৃথক কৃষ্ণারাধনার আবশ্যক কি?

পরমহংস ঠাকুর—এইরূপ বিচার সেবাহীন জনগণের কৃষ্ণ ও গৌরে ভেদবুদ্ধি হইতেই উদিত হইয়া থাকে। কতকগুলি লোক গৌরানুগত্যের ছলনা করিয়া যে, গৌরভজন কৃষ্ণভজন হইতেও বড় বা কৃষ্ণভজনের আবশ্যকতা নাই প্রভৃতি প্রলাপ বকিয়া থাকেন, তাহা গৌরভজন নহে; তাহা কপটতা ও ভণ্ডতামাত্র।

শ্রীগৌরপার্ষদ গোস্বামিপাদগণের অনুমোদিত পন্থা পরিত্যাগ করিয়া স্বকপোলকল্পিত মতবাদ জড়েন্দ্রিয় তর্পনমূলে পাষণ্ডতা ব্যতীত আর কি? শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরই সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ—এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, যেমন আচার্য শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু 'মনঃশিক্ষায়' বলিয়াছেন,—"শচীসূনুং নন্দীশ্বর পতিসুতত্বে গুরুবরং মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ"—হে মন, তুমি শচীনন্দনকে ব্রজেন্দ্রনন্দনরূপে এবং শ্রীগুরুদেবকে মুকুন্দের প্রিয়তমস্বরূপে নিরন্তর স্মরণ কর। এই স্থানে শ্রীদাসগোস্বামিপ্রভু শচীনন্দনকে নন্দনন্দনরূপেই স্মরণ করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু নন্দনন্দনের আরাধনার আবশ্যকতা অস্বীকার করেন নাই। যদি করিতেন, তাহা হইলে পরবর্তিপদে শ্রীগুরুদেবকে মুকুন্দদয়িতরূপে জ্ঞান করিতে বলিতেন না। শ্রীগুরুদেব—আচার্য, তিনি আচরণ করিয়া শিষ্যকে ভজন শিক্ষা দেন। শ্রীগুরুদেব সর্বদা মুকুন্দের আরাধনা-তৎপর, তিনি মুকুন্দপ্রেষ্ঠ অর্থাৎ রাধা-প্রিয়সখী। কৃষ্ণ হইতে

বড় বস্তুর কল্পনাই মনোধর্ম বা মায়া। যাঁহারা হরিলীলা মায়ান্তর্গতা, এইরূপ অপরাধময়ী বুদ্ধি পোষণ করিয়া দুরভিসন্ধিমূলে ইন্দ্রিয়তোষণপর ভোগবাদ প্রচার করেন, তাঁহাদের অধিকাংশই সম্ভোগবাদি ভোগী। তাঁহারা গৌরে ভোগবুদ্ধিবিশিষ্ট। ইঁহাদের মধ্যে কতকগুলি বিকৃত মস্তিষ্ক, আর কতকগুলি ভজনহীন নির্বোধ; সুতরাং বঞ্চিত হইবার জন্যই তাঁহাদের অনুগত। অনর্থময় সাধকের বর্তমান অবস্থারও উপাস্য শ্রীগৌরসুন্দর, আর অনর্থহীন সাধকের উপাস্য শ্রীকৃষ্ণ। সাধকের শ্রীকৃষ্ণোপাসনার পূর্বাভাসই গৌরোপাসনা, আর সিদ্ধের গৌরোপাসনাই শ্রীকৃষ্ণোপাসনা। অসিদ্ধ অর্থাৎ অনর্থযুক্ত ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের নিকট যাইতে পারেন না, যাইবার ছল করিলে কৃষ্ণ, বিষ্ণুর দ্বারা অঘ-বক-পুতনার ন্যায়, অকালে তাঁহার বধ সাধন করিয়া থাকেন। কিন্তু পরমৌদার্যবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর সার্বভৌম ভট্টাচার্যের ন্যায় বিষয়ীকে, জগাই মাধাইয়ের ন্যায় পাপিষ্ঠ ব্যক্তিকেও অনর্থ হইতে মুক্ত করিয়া শ্রীকৃষ্ণারাধনায় নিযুক্ত হইবার যোগ্যতা প্রদান করেন। কতকগুলি শাক্তেয়বাদী ও বঞ্চিত ব্যক্তি বিপ্রলম্ভাবতার শ্রীগৌরসুন্দরের লীলা-বৈশিষ্ট্যের তাৎপর্য বুঝিতে না পারিয়া এবং রূপানুগ শ্রৌতপন্থা পরিত্যাগ করিয়া মাটিয়া-বুদ্ধিবলে জড়ভোগতৎপর হইয়া 'গৌরভজা' বা 'গৌরবাদী' হইয়া পড়িয়াছেন। আবার কতকগুলি লোক গৌর বাদ দিয়া গৌর-নাম-মন্ত্রে বিরোধ করিয়া ত্রিগুণ-চালিত হইয়া জড়াহঙ্কারে শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্যলীলা-বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করিবার দাম্ভিকতা দেখাইয়া ঘৃণিত প্রাকৃত সহজিয়া হইয়া পড়িয়াছেন। এক সম্প্রদায় শ্রীগৌরসুন্দরে ভোগবুদ্ধিবিশিষ্ট, আর এক সম্প্রদায় মুখে 'গৌর' মানিয়া অন্তরে গৌরবিরোধী ও কৃষ্ণকে মায়িক ভোগ্যবস্তুমাত্র জ্ঞানে ভোগবুদ্ধিবিশিষ্ট।

*   *   *   *

আবার, আর এক সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা গৌরভজা হইবার পরিবর্তে গুরুভজা বা কর্তাভজা নাম ধারণ করিয়াছেন। ইঁহাদের ধারণা এই যে, গুরুই কৃষ্ণ। সুতরাং কৃষ্ণারাধনার আর আবশ্যকতা নাই। এই সকল স্বতন্ত্র জড়-বুদ্ধিজীবী পাষণ্ডমতবাদী ব্যক্তির অনুগত ব্যক্তিগণ তাহাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণ-প্রমত্ত জরদ্গবতুল্য গুরুব্রুবকে কৃষ্ণ সাজাইয়া নিজেরা ইন্দ্রিয়-তর্পণে রত হয় এবং বহু মূর্খ ব্যক্তিকে সেই অপরাধজনক কার্যে লিপ্ত করাইয়া থাকেন। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর ঐ সকল অপরাধি-ব্যক্তিগণের কথা খুব সরল ভাষায় বলিয়াছেন—

কোন পাপিগণ ছাড়ি' কৃষ্ণ-সংকীর্তন।
আপনারে গাওয়ায় বলিয়া 'নারায়ণ'॥
দেখিতেছি দিনে তিন অবস্থা যাহার।
কোন্ লাজে আপনারে গাওয়ায় সে ছার॥

(চৈঃ ভাঃ আদি ১।১৪।৮৪-৮৫)

উদর ভরণ লাগি, এবে পাপী সব।
লওয়ায় ঈশ্বর আমি, মূলে জরদ্গব॥
গর্দভ-শৃগাল-তুল্য শিষ্যগণ লইয়া।
কেহ বলে,—'আমি রঘুনাথ' ভাব গিয়া॥
কুক্কুরের ভক্ষ্য দেহ,—ইহারে লইয়া।
বলয়ে 'ঈশ্বর' বিষ্ণু-মায়া-মুগ্ধ হৈয়া॥

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৩।৪৮০-৪৮২)

এই সকল ব্যক্তি আত্মতুল্য শিষ্যগণের দ্বারা শৃগাল-কুক্কুর-ভক্ষ্য স্বীয় জড়পিণ্ডের পদদেশে তদীয়া তুলসী (?) সমর্পণ করাইবার দুঃসাহস

ও পাষণ্ডতা দেখাইয়া অনন্ত রৌরবের পথ পরিষ্কার করিয়া থাকে। এই সকল পাষণ্ডের কথা বহুলোক আমাদের নিকট জানাইতেছেন, কিন্তু ইহারা নরক-গমনের জন্য এতদূর কৃতসঙ্কল্প যে, কোন ভাল কথা কিংবা শাস্ত্রীয় কথা ইহাদের কর্ণমূলে প্রবিষ্ট হয় না। এই যে ত্রিগুণা-দেবীর যূপকাষ্ঠমুখে পূজা হইতেছে, তাহাতে এই সকল পাষণ্ডবুদ্ধিরূপ মস্তক বিচ্ছিন্ন হইলে আর ভোগপরতা বিষ্ণুতে আরোপিত হয় না। এই 'গুরু-ভজা' মত জগতে বহু প্রকারে প্রবিষ্ট হইয়াছে। মূর্খ লোকই এই সকল মতের আদর করিয়া থাকে।

*　　　*　　　*　　　*

গোস্বামিপাদগণ ও শ্রীল রূপানুগ ভক্তগণ ভজনের প্রণালী কিরূপ সুন্দরভাবে কীর্তন করিয়াছেন, শ্রবণ করুন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু প্রথমে শ্রীগুরুদেব, তৎপরে শ্রীগৌরাঙ্গ এবং শেষে শ্রীগান্ধর্বিকা-গিরিধারীর ভজন কীর্তন করিয়াছেন। তাঁহার স্তবে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি ইন্দ্রিয়-প্রমত্ত গুরু-ভজাগণের গুরুই 'গৌরাঙ্গ'—এইরূপ পাষণ্ড মতবাদ প্রচার করেন নাই। গুরু-ভজনের ছল দেখাইতে গিয়া গৌরাঙ্গের ভজন বাদ দেন নাই। আবার গৌরভজা হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের সহিত বিরোধ করেন নাই।

"বৃন্দাবনে বৈসে যত বৈষ্ণবমণ্ডল।
কৃষ্ণনাম পরায়ণ, পরম মঙ্গল॥
যাঁর প্রাণধন—নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্য।
রাধাকৃষ্ণ-ভক্তি বিনে নাহি জানে অন্য॥
(চৈঃ চঃ আদি ৫ম ২২৮-২২৯ সংখ্যা)

*　　　*　　　*　　　*

শ্রীগুরুদেব গৌরাভিন্নবিগ্রহ। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ হইতে অচিন্ত্য-ভেদাভেদতত্ত্ব গৌরাঙ্গের প্রকাশবিগ্রহ। তিনি আশ্রয় জাতীয় ভগবত্তত্ত্ব। বিষয় জাতীয় ভগবত্তত্ত্বের সহিত তাঁহাকে একীভূত করিয়া বিষয়তত্ত্বের বিলোপ সাধন করিবার চেষ্টা অপরাধময় নির্বিশেষ বাদীর চেষ্টামাত্র। উহাই মায়াবাদ বা পাষণ্ডতা। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন,—

"যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥"

অন্যস্থানে আরও বলিয়াছেন—

"তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥"

তিনি শ্রীগুরুদেবের আশ্রয়ে কৃষ্ণভজনের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বহুস্থানে এই সিদ্ধান্তই প্রচার করিয়াছেন—

হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি ধর নিতাইর পায়।

* * * *

নিতাইর করুণা হবে ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে,
ধর নিতাইর চরণ দু'খানি।
শ্রীগুরু করুণাসিন্ধো লোকনাথ দীনবন্ধো
মুঞি দীনে কর অবধান।
রাধাকৃষ্ণ, বৃন্দাবন, প্রিয়নর্মসখিগণ,
নরোত্তম মাগে এই দান॥

* * * *

"ধন মোর নিত্যানন্দ, পতি মোর গৌরচন্দ্র
প্রাণ মোর যুগলকিশোর।"

* * * *

"শুনিয়াছি সাধুমুখে বলে সর্বজন।
শ্রীরূপকৃপায় মিলে যুগল-চরণ॥"

* * * *

গোবিন্দ গোকুলচন্দ্র, পরম আনন্দ কন্দ,
পরিবার গোপ-গোপী সঙ্গে।
নন্দীশ্বর যা'র ধাম, গিরিধারী যা'র নাম,
সখী সঙ্গে তারে ভজ রঙ্গে॥
প্রেমভক্তি তত্ত্ব এই, তোমারে কহিল ভাই,
আর দুর্বাসনা পরিহরি।
শ্রীগুরু প্রসাদে ভাই, এ সব ভজন পাই,
প্রেমভক্তি সখী অনুচরি॥
অহঙ্কার অভিমান, অসৎসঙ্গ অসৎজ্ঞান,
ছাড়ি ভজ গুরু-পাদপদ্ম।
কর আত্মনিবেদন, দেহ-গেহ-পরিজন,
গুরুবাক্য পরম মহত্ত্ব॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব, রতি মতি ভাবে সেব,
প্রেমকল্পতরু দাতা।
ব্রজরাজ-নন্দন, রাধিকা-জীবন-ধন,
অপরূপ এই সব কথা॥

—শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম।

* * * *

শ্রীল দাসগোস্বামিপ্রভু গুরুদেবকে মুকুন্দপ্রেষ্ঠ অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দের প্রিয়তমতত্ত্ব বলিয়াছেন। শ্রীল দাসগোস্বামীর পরমপ্রিয় শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু তাঁহার ভজন-প্রণালী এই শ্লোকটীতে কীর্তন করিয়াছেন—

"বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজন-সহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥"

সর্বপ্রথমে মন্ত্রদীক্ষাদাতা শ্রীগুরুদেবের ভজন, তৎপরে পরম, পরাৎপর প্রভৃতি গুরুবর্গ যথা—শ্রীমদানন্দতীর্থ, শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী প্রমুখ গুরুবর্গের ভজন, তৎপরে চতুর্যুগোদ্ভূত ভাগবতবৈষ্ণবগণের ভজন, তৎপরে অভিধেয়াচার্য যুগলচরণ-ভজন-প্রদানের মালিক শ্রীরূপ প্রভুর ভজন, তৎপরে রূপানুগযূথ শ্রীরঘুনাথ, শ্রীজীব প্রমুখ গুরুবর্গের ভজন, তৎপরে শ্রীঅদ্বৈত প্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সহিত সাবরণ ঈশতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের ভজন। এই কৃষ্ণচৈতন্যদেবই "কৃষ্ণ জানাইয়া বিশ্ব কৈল ধন্য"। তিনি অনর্পিতচর উন্নতোজ্জ্বলরস প্রদাতা। শ্রীরূপপাদ তাঁহাকে স্তব করিয়াছেন—

"নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেম প্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥"

তিনি কৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতা বলিয়াই মহাবদান্য। তাঁহার উপদেশ— "যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ"। তিনি স্বয়ং কৃষ্ণ, তাঁহার নাম কৃষ্ণচৈতন্য। তাঁহার রূপ—গৌর, তাঁহার লীলা—কৃষ্ণপ্রেম-প্রদান। এই নাম, রূপ, গুণ ও লীলা তাৎকালিক বা কালব্যবধানগত কোন বস্তু নহে, উহা নিত্য। কৃষ্ণলীলা ও কৃষ্ণপ্রেমপ্রদান-লীলা (গৌরলীলা) —এই উভয় নিত্যলীলার মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য বর্তমান, তাহাও নিত্য।

এই দুই নিত্যলীলার নিত্য-বৈশিষ্ট্যের বিলোপ সাধন করিবার বৃথা প্রয়াস করিলে ইন্দ্রিয়-তর্পণোত্থ অপরাধময় নির্বিশেষবাদের আবাহন করা হয়। শ্রীগৌরসুন্দর কৃষ্ণের বিপ্রলম্ভরসময়বিগ্রহ এবং শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরসুন্দরের সম্ভোগরসময় বিগ্রহ। শ্রীগৌরসুন্দরের প্রদত্ত ভজনই গোপীর আনুগত্যে শ্রীরাধা-গোবিন্দের ভজন। আচার্য শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুর বলিয়াছেন—

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেন যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থোমহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো ন পরঃ ॥

শ্রীগৌর-নারায়ণের শ্রী, ভূ ও নীলাশক্তি

(১) পরিপ্রশ্ন—শ্রী, ভূ ও নীলা কি তত্ত্বে অভিহিত হইবেন? গৌরলীলায় তাঁহারা কে?

শ্রীল প্রভুপাদের উত্তর—ঐশ্বর্যপ্রকাশ পরতত্ত্ব-বস্তু নারায়ণের শ্রী, ভূ ও নীলা—এই তিনটি শক্তি। কমলা বা লক্ষ্মী—শ্রীশক্তি, বিষ্ণু-ভক্তিই—ভূশক্তি, আর নারায়ণের পদালিঙ্গিতা আধারভূতা বিচরণ-ভূমিই—নীলাশক্তি, ইহাকেই 'দুর্গাশক্তি' বলে; ইনি জগতের আধার-স্বরূপা। গৌর-নারায়ণে এই তিনটি শক্তিই বর্তমানা। অবতারীর দেহে সর্বাবতারের স্থিতি। শ্রীকৃষ্ণে কৈমুতিকন্যায়ানুসারে 'নারায়ণত্ব'ও বিরাজিত। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ংরূপ অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দন। সুতরাং তাঁহাতে কোন তত্ত্বেরই অভাব নাই। এইজন্য শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীমন্মহাপ্রভুকে 'ক্ষীরোদশায়ী' বিষ্ণু বলিয়া এবং শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুও—"ভক্তের বাক্য ব্যভিচারী হইতে পারে না"—ইহা দেখাইয়া অংশী-শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে সর্বতত্ত্বের সমাবেশ আছেন—প্রতিপন্ন করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার গয়া গমনের পূর্ব পর্যন্ত যে লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার ঐশ্বর্যপর নারায়ণলীলাই প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর গার্হস্থ্যলীলায় তিনি তাঁহার নারায়ণস্বরূপই প্রকাশিত করিয়াছেন। লক্ষ্মীপ্রিয়া ও গৌরের গার্হস্থ্যলীলা বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীনারায়ণের লীলা বলিয়াই জানিতে হইবে। গৌরগণোদ্দেশের ৪৩ সংখ্যায় কবি কর্ণপূর বলিয়াছেন যে, যিনি পূর্বে মিথিলাধিপতি রাজা জনক ছিলেন, তিনিই গৌরাবতারে বল্লভাচার্য; সেই বল্লভাচার্যের কন্যাই লক্ষ্মীপ্রিয়া। জানকী ও রুক্মিণী—এই দুই

একত্রে মিলিয়া 'লক্ষ্মী'-নাম্নী তাঁহার এক কন্যা হয়। শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমভক্তিস্বরূপ প্রকাশ করিবার প্রাক্কালে শ্রীলক্ষ্মী অন্তর্হিতা হইলেন অর্থাৎ বিষ্ণুপ্রিয়া প্রেমভক্তিস্বরূপিণী, তিনি যখন পরিবর্ধিতা হইতেছিলেন, তখন লক্ষ্মীপ্রিয়া গৌর-নারায়ণের সেবিকাস্বরূপে বিরাজিতা ছিলেন। ক্রমে সেই প্রেমভক্তি যখন পরিবর্ধিতা হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের সেবাযোগ্যা হইলেন, তখন শ্রীলক্ষ্মীদেবী অন্তর্হিতা হইলেন। তত্ত্ববিচারে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ভূশক্তি-স্বরূপিণী। শ্রীগৌরগণোদ্দেশে কবি কর্ণপূর লিখিয়াছেন যে, পুরাকালে যিনি সত্রাজিৎ রাজা ছিলেন, তিনিই গৌরাবতারে 'সনাতন রাজপণ্ডিত' নামে অভিহিত হইয়াছেন। ভূশক্তিস্বরূপিণী জগন্মাতা বিষ্ণুপ্রিয়া ইঁহারই কন্যা। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে কবি কর্ণপূর শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে পৃথিবীর অংশরূপা বলিয়াছেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমভক্তি-প্রচার কার্যে সহায়কারিণী। শ্রীগৌরসুন্দর রাধাকৃষ্ণ মিলিত তনু, সুতরাং ভক্তবাৎসল্য-বিধায়িনী জগন্মাতা বিষ্ণুপ্রিয়াকে 'রাধাকৃষ্ণের সেবিকা' বলা যাইতে পারে। তাঁহাকে একজন বৃষভানু-নন্দিনীর সহচরী, ভক্তা পরমেশ্বরী নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। শ্রীগৌরসুন্দর আদি লীলায় অর্থাৎ গয়া গমনের পূর্ব পর্যন্ত যে স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার নারায়ণস্বরূপ। শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে তিনি বৈধপত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। গয়া হইতে প্রত্যাগত হইবার পরও তিনি যে লীলা দেখাইয়াছেন, তাহাও অনেকটা মিশ্রভাবাপন্ন অর্থাৎ তাহাতেও ঐশ্বর্যপ্রকাশ বর্তমান রহিয়াছে। যেমন শ্রীবাস-ভবনে চতুর্ভূজ নৃসিংহরূপ ও মুরারি গুপ্তের গৃহে বরাহমূর্তি প্রভৃতি প্রকট করিয়াছেন, কখনও বা বিষ্ণুখট্টায় আরোহণ করিয়াছেন। গৃহাবস্থানের শেষ লীলায় তিনি রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া মাধুর্যপর কৃষ্ণলীলার কথা

জগতে প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার গৃহাবস্থানের মধ্যলীলায়ও যে তিনি কৃষ্ণলীলা-কথা প্রকাশ করেন নাই, তাহা নহে। তিনি গয়া হইতে প্রত্যাগমনের পরে স্বয়ংরূপ বিষয় হইয়াও আশ্রয়ের ভাবে "গোপী" "গোপী" বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিলেন। ঠাকুর হরিদাস ও নিত্যানন্দকে জগতের দ্বারে দ্বারে কৃষ্ণকথা কীর্তনের আজ্ঞা দিলেন।

শ্রীগৌর-গদাধর তত্ত্ব

২নং প্রশ্ন—শ্রীগৌরসুন্দর যদি কৃষ্ণ হন এবং শ্রীগদাধর পণ্ডিত যদি রাধিকা হন, তাহা হইলে কি পরস্পরের মধ্যে সম্ভোগরস বর্তমান?

উত্তর—শ্রীগৌরসুন্দরই রাধাকৃষ্ণমিলিত তনু। তাঁহার শরীর কৃষ্ণের ন্যায় আকারবিশিষ্ট; তিনি বৃষভানুনন্দিনীর ভাবে এরূপ বিভাবিত যে, ঐ ভাব ওতপ্রোতরূপে তাঁহাতে বর্তমান থাকিয়া তাঁহার কৃষ্ণবর্ণকে শ্রীমতীর গাত্রবর্ণদ্বারা বাহিরে পর্যন্ত আবৃত করিয়াছে। তাঁহার অন্তর যেমন সর্বতোভাবে শ্রীমতীর ভাবে বিভাবিত, তদ্রূপ তাঁহার বাহ্য শরীরও শ্রীমতীর কান্তি-দ্বারা আবৃত। পণ্ডিত গদাধর গোস্বামী—সেই বৃষভানুনন্দিনীর ভাবরূপে গৌরলীলায় বর্তমান, আর শ্রীদাস গদাধর শ্রীমতীর কান্তিরূপে প্রকাশিত। শ্রীগৌরগণোদ্দেশের ১৫৩ ও ১৫৪ সংখ্যায় কবি কর্ণপূর লিখিয়াছেন,—

অথবা ভগবান্ গৌরঃ স্বেচ্ছয়াগাত্রিরূপতাম্।
অতঃ শ্রীরাধিকারূপঃ শ্রীগদাধর পণ্ডিতঃ॥
রাধাবিভূতিরূপা যা চন্দ্রকান্তিঃ পুরা স্থিতা।
সাদ্য গৌরাঙ্গ-নিকটে দাসবংশ্য গদাধরঃ॥

রাধাভাব-সুবলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দরই তাঁহার নিরঙ্কুশ ইচ্ছা দ্বারা স্বয়ং কৃষ্ণস্বরূপ, রাধিকারূপ ও ললিতারূপ—এই ত্রিবিধরূপ হইয়াছেন। শ্রীগদাধর পণ্ডিত সেই রাধিকার ভাবরূপ অর্থাৎ শ্রীমতী রাধিকাই ভিন্ন মূর্তিতে তাঁহার ভাব প্রকাশ করিবার জন্য গদাধররূপে প্রকাশিত এবং শ্রীমতী রাধিকাই তাঁহার কান্তি প্রকাশ করিবার জন্য দাস গদাধররূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। এইরূপ বিচার নহে যে, মহাপ্রভু সম্ভোগবিগ্রহ কৃষ্ণ আর গদাধর পণ্ডিত রাধিকা। শ্রীগৌরসুন্দরও এইস্থলে শ্রীমতীর ভাবে বিভাবিত, তিনি আশ্রয়ের ভাবে মত্ত হইয়া সর্বদা কৃষ্ণান্বেষণে ব্যস্ত। আবার গদাধরও স্বতন্ত্ররূপে আশ্রয়ের ভাবে মত্ত থাকিয়া শ্রীগৌরসুন্দরেরই বিপ্রলম্ভরসের সহায়কারী। উভয়েই বিপ্রলম্ভরসে মত্ত। তবে যে গৌর-গদাধরের ভজন-প্রণালী রহিয়াছে বা গদাধরকে 'শক্তিতত্ত্ব' এবং গৌরসুন্দরকে 'শক্তিমত্তত্ত্ব' বলা হয়, তাহার দ্বারা এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, শ্রীগৌরসুন্দর ব্রজেন্দ্রনন্দনের দেহ ও শ্রীমতী রাধিকার ভাবকান্তি লইয়া অবতীর্ণ। গদাধর পণ্ডিত সেই রাধিকারই ভাব-প্রকাশ বা কায়ব্যূহস্বরূপ। গদাধর পণ্ডিত কিছু শ্রীমতীর দেহ লইয়া প্রকাশিত হন নাই ; কিন্তু তিনি আশ্রয়জাতীয় শক্তিতত্ত্ব, শ্রীমতীর ভাব-রূপিণী। বিপ্রলম্ভ-লীলা ও সম্ভোগ-লীলায় যে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য আছে, কল্পনার দ্বারা তাহা লোপ করিবার চেষ্টা করিলে রসাভাস দোষ উপস্থিত হয়। এইরূপ দোষ হইতে গৌর-নাগরীবাদ এবং নানাবিধ সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ মতবাদ জগতে উপস্থিত হইয়াছে।

সাধনসিদ্ধ জীব কাঁহারা ?

৩নং প্রশ্ন—মহাপ্রভুর সময়ে সাধনসিদ্ধ জীব ছিলেন কি ? যদি থাকেন, তাঁহারা কে ?

উত্তর—মহাপ্রভুর সময়ে সাধনসিদ্ধ জীব না থাকার কোন কারণ নাই। সার্বভৌম ভট্টাচার্য, যিনি পূর্বে কর্মফলাধীন বৃহস্পতি ছিলেন (গৌঃ গঃ ১১৯), গোপীনাথ আচার্য যিনি কর্মবিধাতা ব্রহ্মা ছিলেন (গৌঃ গঃ ৭৫), তাঁহাদিগকে সাধনসিদ্ধ বলা যায়। প্রভুপার্ষদ-বিচারে তাঁহারাই নিত্যসিদ্ধ। মুক্তাবস্থায় সেবাপরতাই নিত্যসিদ্ধের লক্ষণ। নিত্যসিদ্ধকে প্রাপঞ্চিক চক্ষে বিদ্ধদর্শনে 'সাধনসিদ্ধ' বলিয়া মনে হইতে পারে।

ঠাকুর হরিদাস কি সাধনসিদ্ধ?

৪নং প্রশ্ন—শ্রীল ঠাকুর হরিদাসকে কি বলিব? তাঁহাকে ত' কেহ কেহ ব্রহ্মা বলেন। তবে তিনি কি সাধনসিদ্ধ?

উত্তর—ঠাকুর হরিদাসে প্রহ্লাদ প্রবিষ্ট হইয়াছেন বলিয়া কেহ কেহ বলেন। গৌরগণোদ্দেশ (৯৩ সংখ্যা) বলিয়াছেন,—ঋচিক মুনির পুত্র মহাতপা ব্রহ্মা প্রহ্লাদের সহিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইনিই ঠাকুর হরিদাস। চৈতন্যচরিত গ্রন্থে শ্রীল মুরারি গুপ্ত বলিয়াছেন যে, উক্ত মুনিপুত্র তুলসী পত্র আহরণপূর্বক প্রক্ষালন না করিয়া দেওয়ায় পিতার দ্বারা অভিশপ্ত হইয়া যবনতা প্রাপ্ত হন। তিনি এখন পরম ভক্তিমান্ হরিদাসরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। যাঁহারা নিত্যকাল হরিসেবোন্মুখ, তাঁহারাই নিত্যসিদ্ধ, আর যাঁহারা নিত্যবহির্মুখ, পরন্তু ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের কৃপায় সেবোন্মুখ হইয়াছেন, তাঁহারাই সাধনসিদ্ধ। প্রহ্লাদ নিত্য কৃষ্ণচরণে উন্মুখ।

জগাই মাধাই সাধনসিদ্ধ কি নিত্যসিদ্ধ?

৫নং প্রশ্ন—জগাই মাধাই কি সাধনসিদ্ধ অথবা নিত্যসিদ্ধ?

উত্তর—জয় বিজয়ই গৌরাবতারে জগাই মাধাইরূপে অবতীর্ণ হন। (গৌঃ গঃ ১১৫) তটস্থলীলা প্রদর্শন করিলেও তাঁহাদিগকে নিত্যসিদ্ধই বলা যাইবে।

শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গী কাহারা ?

৬নং প্রশ্ন—ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন, "গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে, নিত্যসিদ্ধ করি' মানে, সে যায় ব্রজেন্দ্রসুত পাশ"—এই স্থানে 'গৌরাঙ্গের সঙ্গী' বলিতে কাহাদের বুঝিব ?

উত্তর—যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গের বিপ্রলম্ভভাবের সহায়ক, তাঁহারাই 'গৌরাঙ্গের সঙ্গী'। যাঁহারা গৌর মনোঽভীষ্টের পূরণকারী, তাঁহারাই "গৌরাঙ্গের সঙ্গী"। যাঁহারা নিত্যকাল গৌরসেবার জন্য গৌরাঙ্গের নিকট অবস্থিত ছিলেন, তাঁহারাই 'গৌরাঙ্গের সঙ্গী'। নতুবা শ্রীমন্মহাপ্রভু ত' দক্ষিণ দেশে প্রচারকালে গ্রামকে গ্রাম সকল লোককে বৈষ্ণব করিয়াছিলেন ; কিন্তু যাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোঽভীষ্ট-পূরণ-কার্যে সতত নিযুক্ত হন নাই, সর্বস্ব সমর্পণ করিয়া নিত্যকাল শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গ করেন নাই, তাঁহাদিগকে কি প্রকারে 'গৌরাঙ্গের সঙ্গী' বলা যাইতে পারে ? 'সঙ্গ' অর্থাৎ সম্যগ্ রূপে গমন করেন যিনি, তাঁহাকেই 'সঙ্গী' বলে। যাঁহারা অনুক্ষণ সঙ্গ করিলেন না, তাঁহাদিগকে 'সঙ্গী' বলা যায় না, তাঁহারা মহাপ্রভুর ভক্ত হইতে পারেন। 'সঙ্গী' অর্থে 'পার্ষদ'। আবার ঠাকুর নরোত্তম শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকালে আবির্ভূত না হইলেও তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গী ; কারণ, তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোঽভীষ্টই পূর্ণ করিবার জন্য জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তিনি নিত্যকাল শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবায় মত্ত, মহাপ্রভুর হৃদ্গতভাবে বিভাবিত। তিনি বিপ্রলম্ভভাবের পরিপোষ্টা। সুতরাং ঠাকুর মহাশয় "নিত্যসিদ্ধ"।

কংসাদির গোলোকে অবস্থান বিচার

৭নং প্রশ্ন—গোলোকে কংস ও জরাসন্ধ প্রভৃতির ব্যতিরেক ভাবটি কি ?

উত্তর—গোলোক—শুদ্ধ চিন্ময়ধাম। সেখানে প্রপঞ্চের কোনও হেয়তা, নশ্বরতা বা অবরতা নাই; সুতরাং সেখানে হিংসা বা রক্তপাতাদির কোন ব্যাপার থাকিতে পারে না। তবে লীলাপুষ্টির জন্য সেই স্থানে তত্তদ্ব্যতিরেক অবস্থাগুলির আকর ভাবরূপে বর্তমান। নন্দ-যশোদাদির বা তদনুগত কৃষ্ণসেবকগণের হৃদয়ে অনুকূল কৃষ্ণ-সেবোৎকর্ষ নবনবায়মানভাবে বৃদ্ধি করিবার জন্য কংস প্রভৃতির অস্তিত্বের একটি মূলভাব মাত্র তথায় বর্তমান আছে; পরন্তু উহা ভৌমলীলার ন্যায় স্থূলগত বাস্তব-স্বরূপে তথায় নাই।

জীবাত্ম-স্বরূপের অচিদ্বৃত্তি আছে কি ?

৮নং প্রশ্ন—জীবাত্ম-স্বরূপের নিত্যচিদ্বৃত্তির ন্যায় অচিদ্বৃত্তিও আছে কি ?

উত্তর—জীবাত্মার কোন অচিদ্বৃত্তি বা মায়ার ধর্ম নাই। যে স্থানে বদ্ধ জীবে অচিদ্বৃত্তি পরিলক্ষিত হইতেছে, সেই স্থানে জীবাত্ম-স্বরূপ সুপ্ত বা স্তব্ধ। চিদাভাস-ই সেই স্থানে অচিতের ক্রিয়ায় ব্যস্ত আছে। জীবাত্ম-স্বরূপের সেবাবৃত্তি বা চিদ্বৃত্তি ব্যতীত অন্য কোনও ক্রিয়া নাই। বিবর্তক্রমে জীব চিদাভাসের ক্রিয়াকেই আত্মার ক্রিয়া বলিয়া ভ্রান্ত হইতেছে।

জীবাত্মা-স্বরূপের সাধনের আবশ্যকতা কি ?

৯নং প্রশ্ন—যদি জীবাত্মা স্বরূপতঃ মায়াবৃত্তি হইতে সর্বদা মুক্তই থাকে এবং অচিতের ক্রিয়া যদি দেহ ও মনের উপরই ক্রিয়াবতী হয়,

তাহা হইলে ত' উহা মায়াবাদী যুক্তির ন্যায় হইয়া পড়ে আর ঐরূপ অবস্থায় সাধনেরই বা আবশ্যক কি?

উত্তর—ইহা মায়াবাদীর যুক্তি হইতে পারে না। মায়াবাদিগণ নিত্য জীবাত্মার অবস্থান স্বীকার করেন না এবং জীবাত্মার হরিসেবারূপা নিত্যাবৃত্তি বর্তমান আছে, তাহাও মায়াবাদী বলেন না। নশ্বর সাধনক্রিয়া কিছু আত্মার উপর হয় না। পরিণামময়ী সাধনক্রিয়া চিদাভাসের ভূমিকায়ই হইয়া থাকে। কালাধীন হরিবৈমুখ্যনাশিনী সাধনক্রিয়া ও নিত্যা সাধনভক্তিতে প্রকার-ভেদ আছে। যে সকল অঙ্গ যাজন দ্বারা অনর্থ নিবৃত্তি করিবার চেষ্টা করা হয়, তাহাই সাধন-ক্রিয়া। উদাহরণ, যেরূপ একটি দর্পণে বহুকালের সঞ্চিত ধূলিরাশি জমিয়া রহিয়াছে, সুতরাং ঐ দর্পণে আর মুখ দেখা যাইতেছে না; কিন্তু ঐ আদর্শ কিছু নষ্ট হইয়া যায় নাই বা ইহা হইতে মুখ প্রতিবিম্বিত হওয়ায় যোগ্যতাও বিলুপ্ত হয় নাই। মুখ প্রতিবিম্বিত হইবার যোগ্যতা উহাতে পূর্বের ন্যায়ই পূর্ণমাত্রায় ঠিক আছে। ঐ আদর্শের উপর হইতে ধূলিরাশিগুলি ঝাড়িয়া দিলেই আবার মুখ দেখা যাইতে পারে। এই 'ঝাড়িয়া দেওয়া' কার্যটি সাধন ক্রিয়া, জীবাত্মার উপরে যে চিদাভাসের আবরণ রহিয়াছে এবং চিদাভাসে আত্মবুদ্ধি করিয়া যে বিবর্তজ্ঞান উপস্থিত হইয়াছে, তাহাকে ঝাড়িয়া ফেল, তাহা হইলেই জীবাত্মা-স্বরূপের ক্রিয়া আরম্ভ হইতে থাকিবে। যেমন সঞ্চিত শক্তি-বিশিষ্ট একটি ইঞ্জিন দাঁড়াইয়া রহিয়াছে বলিয়া তৎকালে 'ইঞ্জিনের' ক্রিয়াশক্তি বিলুপ্ত হয় নাই, তদ্রূপ জীবাত্ম-স্বরূপেও নিত্যসেবাবৃত্তি সক্রিয় না হইলেও বিরাজমান আছে। অনর্থাপগমে সেবাবৃত্তি স্বতঃই বিকশিত হয়। সাধনক্রিয়া আত্মার উপর কার্যকরী নহে। কিন্তু সাধনভক্তি আত্মার ভূমিকায় নিত্যা ক্রিয়াবতী। সাধনভক্তির

পরিপক্কাবস্থাই ক্রমে ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তির প্রকাশ, যেমন, একটি আম্রফলের কাঁচা, ডাসা ও পাকা অবস্থা। পক্ক ফলটি কৃষ্ণসেবায় সম্পূর্ণ উপযোগী। কিন্তু সাধনক্রিয়া সে জাতীয় বস্তু নহে। উদাহরণ-স্বরূপ যেমন, একটি কাচের শিশিতে নির্মল মধু রহিয়াছে। হঠাৎ শিশির গায়ে খানিকটা কাদা লাগিয়া গেল। ঐ কাদা শিশির গায়ে লাগিয়াছে বটে, কিন্তু মধুকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। শিশির গায়ে কাদা লাগিয়াছে বলিয়া অন্তরস্থ মধুকে জলদ্বারা প্রক্ষালন করিতে হইবে না। কেবল মধুর আবরণী স্বরূপ কাচ ভাণ্ডটাই ধোওয়া আবশ্যক, তদ্রূপ আত্মার উপর কোন সাধনক্রিয়া প্রযুক্ত হইতে পারে না। বিকারযোগ্য চিদাভাস মনের উপরই সাধনক্রিয়াদি প্রযুক্ত হয়। এইজন্যই শ্রীভাগবত বলিয়াছেন,—"সর্বে মনোনিগ্রহ-লক্ষণান্তাঃ"। সাধনাদি যাহা কিছু সকলই মনোনিগ্রহ করিবার জন্য। মনোধর্ম নিগৃহীত হইলেই আত্মবৃত্তি বিকাশ লাভ করে। আত্মবৃত্তিতে সাধনভক্তি প্রকাশিত হইলে জীব ক্রমে ভাব ও প্রেমভক্তিতে আরূঢ় হন। জগতের সর্বত্রই 'সাধনভক্তি' ও 'সাধনক্রিয়া'র পরস্পর সম্বন্ধ ও ভেদ বুঝিতে না পারায় নানা প্রকার মতবাদ ও মনগড়া সাধন প্রণালী সৃষ্ট হইয়াছে। ঐ সকলই জীবের অনর্থ বৃদ্ধি করিবার হেতু।

শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ

(স্থান—পুরীধাম, শ্রীনরেন্দ্র সরোবর তীর)

সময়—২২শে আষাঢ়, ১৩৩৩, বুধবার, অপরাহ্ন।

পথ দ্বিবিধ—শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ। শ্রেয়ঃ কথা অনেক সময়ে প্রেয়ের ন্যায় প্রাকৃত হৃৎকর্ণরসায়ন নাও হইতে পারে। কিন্তু প্রেয়ঃ কথা সকল সময়েই ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর। শ্রোতা অধিকাংশস্থলেই মনে করেন, আমি যাহা ভালবাসি, বক্তার মুখ হইতে তাহাই বহির্গত হউক্; কিন্তু শ্রেয়ঃপন্থী মনে করেন যে, 'আপাততঃ আমার অরুচিকর হইলেও নিরপেক্ষ সত্য কথাই আমি শ্রবণ করিব'। মানুষের রুচি রকম রকম, কতকগুলি ব্যক্তি ভাবুকশ্রেণীর, কতকগুলি বিচারক, কতকগুলি সংশয়াত্মা বা সন্দেহবাদী ইত্যাদি। আমরা যে-রকম সমাজ বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে বর্ধিত হইয়াছি, তজ্জাতীয় চিন্তাস্রোত বা রুচিতেই আমাদের অনেকটা ঝোঁক দেখা যায়। অন্য কথা আমাদের নিকট বড়ই বিরুদ্ধ [revolutionary], অশ্রুতপূর্ব ও আশ্চর্যজনক বোধ হয়। কিন্তু আমরা যদি মঙ্গল চাই, তাহা হইলে ধৈর্যের সহিত শ্রবণ করিব এবং শ্রেয়ঃপন্থা গ্রহণ করাই কর্তব্য কিম্বা আপাতরমণীয় প্রেয়ঃপন্থা গ্রহণই মানব জীবনের কর্তব্য, তাহাও নিষ্কপটভাবে বিচার করিব। যদি শ্রেয়ঃপন্থা চাই, তাহা হইলে অসংখ্য জনমত পরিত্যাগ করিয়াও 'শ্রৌতবাণীই' শ্রবণ করিব। শ্রুতি বলেন,—"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ। সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রীয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥" শ্রীমদ্ভাগবতও সেই কথা সমস্বরে কীর্তন করিয়া বলেন,—

"তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্ ॥"

আপনি দূরদেশ হইতে আসিয়াছেন, কিন্তু আপনার দেশের সকল লোকের ত' এদিকে রুচি উৎপন্ন হয় না। 'গুরু' বৈষ্ণবকেও করা যায়, আবার অবৈষ্ণবকেও 'গুরু' বলা যায়। কিন্তু—

"অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্ বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ ॥"

আমরা তাদৃশ গুরুর আশ্রয় করিব, যিনি শতকরা শতভাগই [১০০%] ভগবানের সেবায় নিযুক্ত আছেন। নতুবা আমি ত' তাঁহার আদর্শে শতকরা শতভাগ [১০০%] হরিসেবায় রত হইব না। শ্রীচরিতামৃতও বলিয়াছেন,—

"আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়।
আপনে না কৈলে ধর্ম শিখান না যায় ॥"

'Platform Speaker' or 'Professional priest' গুরু হইতে পারেন না। আমি বিজ্ঞাপন পড়িলাম, ঝাড়ুদারের কার্যে আমার ভাগবত পাঠ অপেক্ষা বেশী টাকা পাওয়া যায়, অমনি আমি ভাগবত পাঠকের কার্য ছাড়িয়া ঝাড়ুদারের কার্যের জন্য আবেদন-পত্র পেশ করিব। মানুষ সর্বক্ষণ যদি হরিভজন না করেন, তাহা হইলে ত' তিনি ভগবানের নাম-বলে ইতর বিষয়ে প্রবৃত্ত হইবার যত্ন করিতেছেন। এই 'নাম-বলে পাপবুদ্ধি' একটি মহাপরাধ। তাঁহার যেমন দশটা কাজ আছে, দশ মিনিট বেড়াইতে হয়, পনের মিনিট খাইতে হয়, বিশ মিনিট লোকের সহিত আলাপ ব্যবহার করিতে হয়, তদ্রূপ ভাগবত পড়াও দশটা কাজের ভিতরে একটা কাজ। ভাগবত-

সেবাই যদি তাঁহার কার্য হয়, তাহা হইলে তিনি প্রত্যেক পদবিক্ষেপে, প্রত্যেক গ্রাসে, প্রত্যেক নিশ্বাস প্রশ্বাসের সহিত হরিসেবা করিবেন।

Stipend holder or a contractor cannot explain the Bhagabat. First of all refrain from approaching the professional priest. See whether he devotes his time fully to the Bhagabat or not. পরব্রহ্মে নিষ্ণাত ব্যক্তির সমস্ত সময় সেবাময়। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

"সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে।
শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ ॥"

পুরাণতীর্থ হইলেই যে ভাগবতের আদর্শ অনুসারে তাঁহার জীবন পরিচালিত করিতে পারিয়াছেন, এমন নহে। স্কুল-কলেজের শিক্ষক বা অধ্যাপকের সঙ্গে যে সম্বন্ধ, ভাগবত-ব্যাখ্যাতার সঙ্গে সেরূপ সম্বন্ধ নহে। যে অধ্যাপক ছাত্রদিগকে মনোরমভাবে পড়া বুঝাইয়া দিতে পারেন, তিনি উত্তম অধ্যাপক বলিয়া বিবেচিত হন। তাঁহার জীবন বা চরিত্র যাহাই থাকুক না কেন, তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। ভাগবত-ব্যাখ্যাতার প্রতি সেরূপ দৃষ্টান্ত খাটিবে না। যিনি 'ভাগবত-ব্যাখ্যাতা' হইবেন, তাঁহার নিজের 'ভাগবত' হওয়া চাই। অর্থের লোভ, প্রতিষ্ঠার লোভ বা কোনরূপ পশ্চাৎটান থাকিলে তিনি লোকচিত্তরঞ্জক ভাগবত-পাঠক হইয়াও 'ভাগবত' হইতে বহু দূরে। তাঁহার মুখে ভাগবত শ্রবণ করিয়া ভাগবতের বাস্তব সত্যের প্রতি লোকের চিত্ত আকৃষ্ট হইতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

"সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।

তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা-রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥" (ভাঃ ৩।২৫।২৫)

"সতাং প্রসঙ্গাৎ"—কথাটি লক্ষ্য করিবেন। 'হৃৎকর্ণরসায়ন' বলিতে বহির্মুখের ইন্দ্রিয়তর্পণজনক নহে, পরন্তু সেবোন্মুখের চিদিন্দ্রিয়-রসায়ন বা সেবা-লৌল্যপর।

প্রায় ষাট বৎসর পূর্বের কথা, এই পুরীধামে গোপীনাথ মিশ্র নামে এক উৎকল পণ্ডিত ছিলেন। তিনি শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

তাঁহার নিকট হইতে ভাগবত-পাঠের পাঠী হইয়া জনৈক স্বাভাবিক ভাগবত, ভাগবত পাঠ করিয়া বিদ্ধভক্তি-স্রোতের গতি পরিবর্তন করিয়া জগতে শুদ্ধভক্তি প্রচারের আকর স্বরূপ হইয়াছেন। তিনিই শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠের সন্নিকটে ভক্তিমণ্ডপের তলদেশে শুদ্ধ ভগবদালোচনার ভিত্তি স্থাপন করেন। বর্তমান জগতে তাঁহার আনুগত্যেই ভাগবত পাঠ ও হরিকীর্তন সম্ভবপর হইয়াছে। ঢঙ্গকুল বা কপট সমাজ স্ব-স্ব অসদভিপ্রায় লইয়া তাঁহার সেবা করিতে পারেন না।

শ্রীমদ্ভাগবত বৈষ্ণবের স্থানে পড়িতে হইবে। শ্রীল স্বরূপ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।" যে ব্যক্তি নিজে 'শ্রীমদ্ভাগবত' নয় তাঁহার মুখে 'শ্রীমদ্ভাগবত' কীর্তিত হয় না। সেই ব্যক্তি তাঁহার মুখে 'শ্রীমদ্ভাগবত' কীর্তিত হইতেছে বলিয়া অপর লোকের বিবর্ত উৎপন্ন করে মাত্র। নিজে বঞ্চিত, তাই অপরকেও বঞ্চিত করে। বঙ্গদেশে অনেক ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা মৎস্য খান, ভাগবত নিন্দিত স্ত্রীসঙ্গ, গৃহব্রতধর্ম ও নানা অসদাচরণ করিয়া থাকেন, অথচ 'ভাগবত পাঠী' বলিয়া মুখে বলেন, তাঁহাদের জিহ্বায় কি প্রকারে

অভিন্ন ভগবদ্বস্তু 'ভাগবত' নৃত্য করিতে পারেন? যাঁহার চরিত্র খারাপ, কামের চিন্তা যাঁহার প্রবল, যাঁহার প্রতিষ্ঠা ও অর্থ আবশ্যক, তিনি কখনও শ্রীমদ্ভাগবত পড়েন না,—শ্রীমদ্ভাগবত পড়িবার ছলে আত্মেন্দ্রিয় তর্পণ করেন মাত্র। অথচ এই শ্রেণীর লোক বলেন,—"যাঁহারা সর্বক্ষণ 'ভাগবত' পড়েন, তাঁহাদিগের হরিসেবার অর্থ বন্ধ করিয়া দাও, রেলের ভাড়া বন্ধ করিয়া দাও!" পরন্তু ভাগবতদিগকেই সকলে সেবা করিবেন।

যে গুরুদেব সর্বক্ষণ হরিভজন করেন, আমি সৌভাগ্যবান্ হইলে সেই গুরুদেবের চরণাশ্রয় করিতাম। পণ্ডিত কে? শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—"পণ্ডিতো বন্ধ-মোক্ষবিৎ" (ভাঃ ১১।১৯।৪১)।

আবার আমরা অনেক সময় মনে করি, আমাদের 'ভাগবত' পড়িয়া, মন্ত্র দিয়া, ঠাকুর দাঁড় করাইয়া পেট-পূজা করাতে যাঁহারা গর্হণ করেন, যাঁহারা সত্য সত্য ভাগবত পড়েন, ঠাকুর সেবা করেন, জগতের লোককে 'শুদ্ধ বৈষ্ণব' করেন, আমরা কেনই বা না তাঁহাদের গলা টিপিব, আমাদের গর্হিত কার্য সমর্থনের কোন উত্তর দিতে না পারিয়া বলিব, তাঁহারাও ত' ভিক্ষা করে, তাঁহাদেরও ত' অর্থের আবশ্যক হয়!! পরন্তু বিষয় তাহা নহে, যাঁহারা সত্য সত্য 'ভাগবত' পড়েন, ঠাকুর সেবা করেন, তাঁহাদিগকেই সমস্ত দিতে হইবে, তাঁহাদিগেরই সমস্ত বস্তু, তাঁহারা আমার মত ভোগ করেন না, অথবা ঠাকুর সেবার ছল করিয়া আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা করেন না। কিম্বা ভগবত-সেবোপকরণকে প্রাপঞ্চিকবোধে ত্যাগ করিয়া ফল্গু বৈরাগীর জড়প্রতিষ্ঠাও সংগ্রহ করেন না।

লোকের কাছে 'নিরপেক্ষ সত্য' বলিলে পাছে উহা লোকের অপ্রিয় হয়—এই ভয়ে আমি যদি সত্য কথা কীর্তন পরিত্যাগ করি

তাহা হইলে ত আমি শ্রৌতপন্থা পরিত্যাগ করিয়া অশ্রৌত পন্থা গ্রহণ করিলাম, আমি 'অবৈদিক'—'নাস্তিক' হইলাম, সত্যস্বরূপ ভগবানে আমার বিশ্বাস নাই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের লেখক গ্রন্থের গোড়ায়ই লিখিয়াছেন,—

"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ ॥

(ভাঃ ১১।২৬।২৬)

গুরু কখনও 'প্রেয়ঃপন্থা' স্বীকার করেন না, তিনি—'শ্রেয়ঃপন্থী'। তাঁহার গুরুর নিকট হইতে তিনি যেরূপ সত্যপথে বিচরণ করিবার শিক্ষা পাইয়াছেন, তাহাই তিনি অপরকে বলেন। গুরুকে কেহ যদি বলেন,—'গুরুদেব! আমি মদ খাইতে চাই!' গুরু যদি শিষ্যকে তাহাতে প্রশ্রয় না দেন, তবেই ত' আমরা "আমার মনের রুচির অনুকূল বস্তু দিলেন না" বলিয়া তাঁহাকে গুরুপদ হইতে খারিজ করি। আর যিনি আমার ঐরূপ ইন্দ্রিয় যজ্ঞে ইন্ধন প্রদান করিতে পারেন, আমরা তাঁহাকেই গুরুপদে বরণ করিয়া থাকি। আমরা অনেক সময়ে 'গুরু' করি—মঙ্গল বা শ্রেয়ের জন্য নহে, পরন্তু আমাদের প্রেয়োলাভের জন্য। গুরুকরণ কার্যটা বর্তমানকালে এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে নাপিত ধোপা রাখার ন্যায় একটা লৌকিক বা কৌলিক ধারা, আর এক শ্রেণীর মধ্যে একটা 'ফ্যাসন'।

সত্য জানিবামাত্রই আমার তাহাতে নিষ্ঠাযুক্ত হওয়া উচিত। আমাদের জীবনের সময় যার যতটুকু আছে উহার এক মুহূর্তও বিষয়কার্যে নিযুক্ত না করিয়া হরিভজনে নিযুক্ত করা উচিত। খট্টাঙ্গ রাজা জীবনের অবশিষ্ট মুহূর্তকাল, অজামিল মাত্র মৃত্যুকালটি হরিভজনে নিযুক্ত করিয়া অভিষ্ট লাভ করিয়াছিলেন। আমরা বলিতে পারি,

আমাদের কর্তব্য কার্য বাকী আছে ; কিন্তু "বিষয়ঃ খলু সর্বতঃ স্যাৎ"। অন্যান্য কর্তব্যগুলি সব জন্মেই করা যাইবে, কিন্তু জীবের একমাত্র কর্তব্য হরিভজন এই মনুষ্যজন্ম ছাড়া আর অন্য সময়ে সম্পন্ন হইবে না। শিবানন্দ ভট্টাচার্য নামক জনৈক শক্তি-উপাসক ব্রাহ্মণের রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য নামে একটি পুত্র ছিল। ভট্টাচার্য মহাশয় দুর্গোৎসব আগত প্রায় দেখিয়া পুত্র রামকৃষ্ণকে কতকগুলি ছাগ-মহিষাদি শক্তি-পূজার আবশ্যক দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার জন্য স্থানান্তরে প্রেরণ করিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণের ছাগ-মহিষগুলি লইয়া গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্তন-কালে পথে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হয়। ঠাকুর মহাশয় রামকৃষ্ণকে ছাগ-মহিষগুলির বিষয় জিজ্ঞাসা করায়, রামকৃষ্ণ নিষ্কপটে ঠাকুর মহাশয়ের নিকট পিত্রাদেশের কথা ব্যক্ত করেন। ঠাকুর মহাশয়ের উপদেশে রামকৃষ্ণের চিত্ত ফিরিয়া যায়। তিনি ছাগ ও মহিষগুলি ছাড়িয়া দেন এবং শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের নিকট হইতে কৃপা লাভ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন। ভট্টাচার্য মহাশয় দ্রব্যসম্ভার বিশেষতঃ পূজার মহিষ-ছাগগুলির জন্য পথপানে চাহিয়া রহিয়াছিলেন, মনে করিয়াছিলেন, আত্মজ এবার মায়ের পূজার জন্য উৎকৃষ্ট ছাগ-মহিষ ক্রয় করিয়া বাড়ী ফিরিবে ; কিন্তু পুত্রকে রিক্তহস্তে আসিতে দেখিয়া বৃদ্ধ ভট্টাচার্য মহাশয় বড়ই আশ্চর্যান্বিত হইলেন। পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রামকৃষ্ণ, তুমি মায়ের পূজার জন্য ছাগ আনিয়াছ কি ?" রামকৃষ্ণ উত্তর করিল "পিতঃ! আমি ছাগমহিষগুলি ক্রয় করিয়াছিলাম বটে কিন্তু পথে ছাড়িয়া দিয়া আসিয়াছি। আর আমি আজ একজন পরমবৈষ্ণবের কৃপালাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি"। এইরূপ কথায় বৃদ্ধ ভট্টাচার্যের কিরূপ ক্রোধের উদয় হইতে পারে, তাহা আপনারা সকলে অনুমান করিতে পারিতেছেন। ভট্টাচার্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—

"রামকৃষ্ণ আজ তুমি পিত্রাদেশ লঙ্ঘন করিলে! মায়ের পূজার বিঘ্ন জন্মাইলে, আবার অর্ঘগুলি পর্যন্ত জলে ভাসাইয়া দিয়া আসিলে! তারপর তুমি ব্রাহ্মণপুত্র হইয়া বৈষ্ণবের শিষ্য হইতে গেলে। আমাদের যে আর সমাজে মুখ দেখাইবার জো থাকিল না। না হয় তুমি কোন শাক্ত ব্রাহ্মণকে বৈষ্ণব বিচার করিয়া তাহার শিষ্য হইতে। তুমি আজ অবিপ্রকে গুরুপদে বরণ করিলে! ইহা অপেক্ষা অধিক অপমানের কথা আর কি আছে? আমাদের মুখে তুমি আজ চূণকালী দিতে অগ্রসর হইয়াছ। তুমি কুলের অঙ্গার হইয়াছ। মায়ের কোপে যে সর্বনাশ হইবে।"

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের সত্যকথা শুনিবার কারণ হইয়াছিল; তাই তিনি ঠাকুর মহাশয়ের মুখে সত্যকথা শুনিয়া তন্মুহূর্তেই জাগতিক কর্তব্যগুলি অতি ক্ষুদ্র ও নগণ্যজ্ঞানে পরিত্যাগপূর্বক একমাত্র হরিভজনে নিযুক্ত হইলেন।

আমাদের নিশ্বাসের বিশ্বাস নাই। আমার মঙ্গল এই দণ্ডেই গ্রহণ করা কর্তব্য। যদি আমি প্রকৃত মঙ্গল চাই, তাহা হইলে আমার মঙ্গলের প্রতিকূলে জগতে কাহারও কথা শুনিব না—

গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎস্যান্ন পতিশ্চ স স্যাৎ
ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেত-মৃত্যুম্॥ (ভাঃ ৫।৫।১৮)

ধামসেবা

শ্রীল প্রভুপাদ পাইচারী করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন ;—

"ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিতেন, রাজমিস্ত্রীর কাজ অগ্রসর হইতে দেখিলে তাঁহার কৃষ্ণসেবা প্রবৃত্তি বৃদ্ধি হয়। রাজমিস্ত্রীগণ কাজ করিতে থাকিলে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর পরমোৎসাহে মালিকা হস্তে মিস্ত্রীগণের কার্য দর্শন করিতেন। তাঁহার স্থপতিকার্য ও গৃহ নির্মাণের প্রতি এই রকম উৎসাহ দেখিয়া আধ্যক্ষিক বিচারপর কেহ কেহ রহস্য করিয়া বলিতেন, ইনি বিচার বিভাগে অবস্থিত না হইয়া পূর্তবিভাগে থাকিলেই ভাল হইত। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিতেন, ভগবদ্ভক্তগণের ভজন-স্থান-নির্মাণ দর্শনে নিজের ভজনে স্পৃহা বৃদ্ধি হয়, ভজনকারী ভক্তগণের সেবা করিবার জন্য চিত্ত ব্যস্ত হইয়া ওঠে। ইট, চূণ, শুরকি প্রভৃতি কৃষ্ণসেবায় অযুক্ত ব্যক্তিগণের কাছে জড় ও নিজভোগ্য বস্তু বলিয়া বিবেচিত হইলেও যাঁহারা সমস্ত বস্তু কৃষ্ণসেবায় নির্বন্ধ করিয়াছেন, সেই সততযুক্ত ব্যক্তিগণের নিকট সেইগুলি ভগবৎ সেবার উদ্দীপন-অবলম্বন-স্বরূপ। ইট, চূণ, শুরকি প্রভৃতি তাঁহাদের বিষ্ণুবৈষ্ণব দর্শনের আবরণরূপা হইতে পারে না। বরং তাহারা আরও অধিকতরভাবে বিষ্ণুস্মৃতির উদ্দীপনা করিয়া দেয়। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীধামে বৈষ্ণবগণের ভজনের জন্য বাসস্থান নির্মাণ ও ধামোৎপন্ন দ্রব্য দ্বারা বৈষ্ণবসেবায় বিশেষ উৎসাহ বিশিষ্ট ছিলেন। তিনি বলিতেন, ধামোৎপন্ন দ্রব্য, জল বায়ু সকলই কৃষ্ণসেবার প্রবৃত্তিতে Fully Saturated—ঐ সকল বস্তুর সেবা করিলে তাঁহাদের কৃষ্ণসেবা প্রবৃত্তির ভাগ পাওয়া যায়।

*　　*　　*　　*

প্রভুপাদ আরও বলিলেন—"এই স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের Health ভাল রাখা না রাখার কথা হইতেছে না—সেইটা ত' ভোগ। আত্মার health উদ্বোধন করিতে হইবে। আত্মার স্বাস্থ্য হইতেছে কৃষ্ণসেবা প্রবণতা আর অনাত্মার স্বাস্থ্য হইতেছে ভোগ প্রবণতা বা কর্ম, জ্ঞান ও অন্যাভিলাষ। ধামের সেবা করিতে হইবে। ধামের বস্তু ভোগ করিবার চেষ্টায় ধামাপরাধ করিতে হইবে না। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের যে কি রকম ধাম সেবার প্রবৃত্তি ছিল তাহা সাধারণ কর্মিসম্প্রদায় বুঝিতে পারিবেন না।

শ্রীমন্দির নির্মাণ

কোন ব্যক্তি প্রাকৃত অর্থদ্বারা প্রাকৃত প্রতিষ্ঠার জন্য মন্দির নির্মাণ করিয়াছেন—উহাও এক প্রকার কর্মমার্গ। চেতনের বৃত্তিদ্বারা মন্দির প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। জড় প্রতিষ্ঠার জন্য যিনি কাজ করেন, জন্ম-জন্মান্তরের পরে তাঁহার (শুদ্ধভক্ত্যুন্মুখী) সুকৃতি উৎপন্ন হইতে পারিবে। প্রতিষ্ঠা দুই প্রকার—Piety-প্রতিষ্ঠা ও Notoriety-প্রতিষ্ঠা।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ইদানীন্তন খুব চৈতন্যভাগবত পড়িতে বলিতেন। এমন কি, চৈতন্যচরিতামৃত না পড়িয়াও চৈতন্যভাগবত আলোচনা করিতে বলিতেন। তিনি বলিতেন, চৈতন্যভাগবতে সমস্ত শুদ্ধভক্তির কথা আছে। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পাদপদ্মের নিকট যিনি নিষ্কপটে রহিয়াছেন তিনিই বুঝিতেন যে, তিনি কি সকল কথা বলিতেন। অপরে 'আমি শিষ্য', কি 'আত্মীয় স্বজন' মাত্র মনে করিয়া দূর হইতে দণ্ডবৎ করিয়া যাইতেন। তাঁহারা তাঁহার কথা কিছুই বুঝিতে পারেন নাই।"

প্রভুপাদ বলিতেন—"এক এক জনকে হরিকথা বলিতে হইলে দুই শত গ্যালন রক্ত নষ্ট না করিলে তাঁহাদের কোন impressionই হয় না,অনেকের আবার তাহাতেও কিছুই হয় না; তথাপি আমরা হরিকথা বলিতে প্রস্তুত আছি। জগতে হরিকথার বড় দুর্ভিক্ষ—বড় দুর্ভিক্ষ!

শ্রীমদ্ভাগবতের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব

অনন্তকোটী জীবন বেদান্ত পড়িয়া মুক্তি হইবে না—অনন্তকাল নাক টিপিয়া দশ বিশ হাত উঁচু হইতে পারিলে কোনও মঙ্গল হইবে না, যিনি নিজে শ্রীমদ্ভাগবত—এমন ব্যক্তির মুখে শ্রীমদ্ভাগবত শুনিলে জগতের সকল জীবের মঙ্গল হইবে। পৃথিবীর সমস্ত পুস্তক যদি অগ্নিতে ভস্মসাৎ হইয়া যায় তাহাতেও কোন ক্ষতি হয় না, যদি একটি মাত্র গ্রন্থ থাকেন—শ্রীমদ্ভাগবত। হাজার হাজার বিদ্যাপীঠ সব উঠিয়া গেলে কোন অসুবিধা হইবে না, যদি একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবতের পঠন-পাঠন থাকে। কিন্তু কি আশ্চর্য—মায়ার কি খেলা, সেই পুস্তকখানা লইয়াই যত ব্যবসায়! গৌরসুন্দরের কথার ঠিক বিপরীত পথে জগতের স্বাভাবিক গতি। * * * বহু লোককে বলিলাম,—শ্রীমদ্ভাগবত প্রচার কর, অসংখ্য লোক ভাগবত প্রচারের বিরোধী, ভাগবত প্রচারের পরম শত্রু। আমি এখন একা নই, বহু লোক হইয়াছে, তাহাতে বহু শত্রুও হইয়াছে। অসংখ্য শত্রু হইয়াছে, তথাপি সেই শত্রুদের মঙ্গল হউক, সত্যকথা প্রচারিত হউক—ইহাই আমার সঙ্কল্প।

ভাগবতধর্মই বাস্তব ধর্ম

জগতের যত লোকের ভোগের যত কথা, তাহাতে সত্য সত্য ধর্ম নাই; জগতে যত নীতি, যত বাহ্য ধর্ম, তাহাতে কোনও অকৈতব

সত্য নাই ; সমস্ত ধর্ম—সমস্ত সত্য একমাত্র মহাপ্রভুর পাদপদ্মে অবস্থিত। লোকে এই কথা শুনিয়া আমাকে 'পাগল' বলিবে বলুক, তাহাতে আমার ক্ষতি নাই ; আমি সকলের পথ ছাড়িয়া উল্টা পথে চলিতেছি লোকে বলুক, আমি এইরূপ উল্টা পথেই চলিব। আমি জগতে খুব একটা ধাক্কা পাইয়াছি, সুতরাং জগতকে সেইরূপ ধাক্কা না দিলে জগতের জড়তা ভাঙ্গিবে না—তাহারা শ্রীচৈতন্যের পাদপদ্মে আকৃষ্ট হইবে না। 'আমি একজন মহা সত্যবাদী, মহা moralist, মহাপণ্ডিত দার্শনিক'—আমার এমন দুর্বুদ্ধি যখন হইয়াছিল তখন আমি গুরুদেবের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম। সেই গুরুদেবকে দেখিয়াছি—তিনি আমাকে দেখিয়া দণ্ডবৎ করিতেন। আমার মহাসত্যবাদিতা, নির্মল নৈতিক জীবন, পাণ্ডিত্য ও ঐশ্বর্যবোধকে যখন তিনি অকিঞ্চিৎকর জানিয়া ধাক্কা দিলেন, তখন আমি বুঝিলাম—যিনি আমার এত ভালকে ধাক্কা দিতে পারেন, তিনি না জানি কত ভাল। গুরুকে দেখিয়াছি মুর্খ, অবরকুল দরিদ্র!

যখন এমন অহঙ্কার হইয়াছে—আমি গণিতশাস্ত্রে বড় পণ্ডিত, দর্শনশাস্ত্রে মহাপণ্ডিত, সকাল হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্র বারটা পর্যন্ত যে কোন পণ্ডিত আসুক না কেন তাহার কথাকে ছিন্নভিন্ন করিয়া কাটিয়া দিব তখন গুরুদেবের দর্শন পাইলাম। তিনি যে ধাক্কা দিলেন, তাহাতে বুঝিতে পারিলাম আমার ন্যায় হীনব্যক্তি আর নাই, এইটীই আমার স্বরূপ। আমার ন্যায় ঘৃণিত ব্যক্তি আর নাই। আজ ২৭।২৮ বৎসর পূর্বের কথা—আমি যে পাণ্ডিত্য, নৈতিক চরিত্র প্রভৃতি পরম লোভনীয় মনে করিয়াছি, দেখি সেই মহাত্মা সেই সকল বস্তুর কোন আমলই দিতেছেন না। তখন বুঝিলাম এই মহান ব্যক্তিতে কি জিনিষই না আছে! তখন বিচার করিলাম,—হয় ইঁহার অত্যন্ত দয়ার পরিমাণ আছে, নয় ইনি অত্যন্ত অহঙ্কারী। আমি একদিন যে ধাক্কা পাইয়াছি,

তাহাতে বুঝিয়াছি পৃথিবীর লোককেও সে ধাক্কা না দিলে তাহাদের চেতন হইবে না। তাই সকলকে বলিয়াছি—আমি সকলের চেয়েও—পৃথিবীর যত লোক আছে, সকলের চেয়ে মূর্খ, তোমরা আমার মত মূর্খ হইও না। মাপিয়া লইবার কথার মধ্যে তোমরা থাকিও না, বৈকুণ্ঠ কথার মধ্যে প্রবেশ কর, খুব বড় লোক হইয়া যাইবে। আমি যাহাকে পরম মঙ্গল বুঝিয়াছি—তোমাদিগকে সেই মঙ্গলের কথা বলিতেছি।

১৩১৫ সালে শ্রীচৈতন্যমঠের দক্ষিণ দিকের কুটিরটি দেওয়া হয়, তখন মায়াপুরে ছিলাম। মহাপ্রভুর বাড়ীতে তখন ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ছিলেন, শ্রীমদ্ভাগবতের 'শ্রবণং কীর্তনং', 'মতি র্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা' শ্লোক ব্যাখ্যা করিতেছি। উকিল বাবু পরেশচন্দ্র দত্ত, রায় বাহাদুর নগেন্দ্র পাল চৌধুরী, বঙ্গবাসীর উপেন্দ্র সিংহের খুল্লতাত প্রভৃতি কয়েকজন আসিয়াছেন ; তাঁহারা মহাপ্রভুর বাড়ী, চৈতন্যমঠ—সব দর্শন করিলেন। আমার পাঠ শুনিয়া নগেন্দ্র বাবু বলিলেন, আমরা এখানেই থাকিব আর আপনার মুখে ভাগবত ব্যাখ্যা শুনিব। এমন ব্যাখ্যা ত কখনই শুনি নাই। তখন 'মতি র্ন কৃষ্ণে' শ্লোকটি খুব ব্যাখ্যা করিতাম। 'গৃহব্রত' ও 'কৃষ্ণব্রত' এই কথা লইয়া খুব আলোচনা হইত।

*　　*　　*　　*

২৩।২৪ বৎসর পূর্বের কথা। একদিন মহাপ্রভুর বাড়ীতে প্রসিদ্ধ কৃষ্ণদাস বাবাজী তাঁহার একজন শিষ্যসহ আসিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস বাবাজী, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, কৃষ্ণদাস বাবাজীর সেই শিষ্যটি এবং আরও কয়েকজন লোক মহাপ্রভুর বাড়ীতে ভাণ্ডার ঘরের বারান্দায় প্রসাদ পাইতে বসিয়াছেন। কৃষ্ণদাস বাবাজীও খুব সম্মান করিয়া প্রসাদ পাইলেন। তাঁহার শিষ্য মনে করিয়াছিল, যখন এখানে নিমন্ত্রণ খাইতেছি,

তখন বোধ হয় অনেক রকম চর্ব্য চূষ্য খাইতে পাইব। সে বলিল এই রকম মোটা প্রসাদ! ঠাকুরদের জন্য ভাল ভাল প্রসাদ করা আবশ্যক। কৃষ্ণদাস বাবাজী শিষ্যকে বলিলেন, মহাপ্রভুর প্রসাদকে এইরকম বলিতে নাই। তখন মোটা চাল ও ধান্যোৎপন্ন ধুন্দুলের তরকারী ভোগ হইত, আর সারাদিন হরিনাম, হরিকথা—এইসব হইত। জিহ্বার বেগ হইতেই শিশ্ন বেগ উপস্থিত হয়।

'জিহ্বার লালসে যে ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥'

খুব সোজাসুজি প্রসাদ পাইতে হইবে, আর সারাদিন হরিসেবা করিতে হইবে—হরিনাম করিতে হইবে।

পাপিষ্ঠ লোক কৃষ্ণপূজা করে না। স্বল্পবিচারপর লোক কৃষ্ণপূজা করিয়া থাকেন। আর বুদ্ধিমান লোক কৃষ্ণের ভক্তের পূজা করিয়া সত্য সত্য কৃষ্ণ পূজা করেন। কৃষ্ণ পূজা করে—'কনিষ্ঠাধিকারী', কৃষ্ণের ভক্তের পূজা করেন—'মধ্যম অধিকারী' ও 'উত্তম ভাগবত'। প্রাকৃত সহজিয়াগণ ইহা বুঝিতে পারে না; তাহারা মনে করে, যে কৃষ্ণের পূজা করে, সেই বুঝি খুব বড়,—এই মনে করিয়া তাহারা নিজকে বৈষ্ণব অভিমান করিয়া অপরের পূজা নেয়, নিজে বৈষ্ণবের পূজা ছাড়িয়া দেয়। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীগোস্বামিগণের কথা শুনিয়াছেন যাঁহারা, তাঁহারা জানেন—কৃষ্ণের ভক্তের পূজায়ই প্রকৃত কৃষ্ণ-পূজা, কৃষ্ণভক্তের পূজা ছাড়িয়া কৃষ্ণ-পূজার ছলনার কোন মূল্য নাই। কৃষ্ণ-পূজাকারী বা নামভজনকারীর প্রতি পদে পদে অপরাধ সম্ভব। নাম-ভজনকারীর 'সাধু নিন্দা' অপরাধ হইতে পারে, অপরাধ থাকিলে কৃষ্ণ নাম বা কৃষ্ণের সেবা হইল না। কিন্তু কৃষ্ণভক্তের পূজাকারীরই প্রকৃত

কৃষ্ণপূজা ও নাম হয়। ঠাকুর মহাশয় কতভাবে এইসব কথা বলিয়াছেন—গোস্বামীগণ কতভাবে এইসব কথা জানাইয়াছেন—

'ছাড়িয়া বৈষ্ণবসেবা নিস্তার পেয়েছে কেবা'।

ঠাকুর মহাশয় নিজের উপর কথাগুলি আরোপ করিয়া কিরূপ কঠোরভাবে সহজিয়া সম্প্রদায়কে শাসন করিয়াছেন—

'অনেক দুঃখের পরে, লয়েছিলে ব্রজপুরে,
কৃপা-ডোর গলায় বাঁধিয়া।
দৈব মায়া বলাৎকারে, খসাইয়া সেই ডোরে,
ভবকূপে দিলেক ডারিয়া॥

*　　*　　*　　*

অর্থলাভ এই আশে, কপট বৈষ্ণব বেশে,
বুলিয়া বেড়াই ঘরে ঘরে॥'

সহজিয়াগণ মনে করেন, এই অহং মম বুদ্ধিযুক্ত দেহটাকে ভোগের জন্য টিকিট কাটা বৃন্দাবনে রাখার নামই—'ব্রজবাস', আর ব্যভিচার, লাম্পট্য, কপটতা, বৈষ্ণব-সেবা ত্যাগ, হরিকীর্তন-ত্যাগ করিয়া প্রতিষ্ঠানুসন্ধানই—হরিভজন।

কৃষ্ণভক্তের পূজা ছাড়িয়া ব্রজবাস প্রভৃতির ছলনা দেহটা লইয়া গিয়া কৃষ্ণকে ভোগ করিবার চেষ্টা। কত পাপী লোক ত' বৃন্দাবনে, নবদ্বীপে একত্র হইয়াছে। তাহারা ইন্দ্রিয়তর্পণের খাতিরে শুদ্ধবৈষ্ণবের কোন কথা বুঝিতে না পারিয়া কেবল তাঁহাদের চরণে অপরাধই করিয়া থাকে। কৃষ্ণভক্তের পূজাকারীর প্রতিই শ্রীচৈতন্যদেব ও গোস্বামিগণের কৃপা হয়।"

[শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবক কয়েকজন ভক্ত মিলিয়া

রহস্য করিয়াছিলেন,—শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রেষ্ঠ না শ্রীগৌড়ীয়মঠ শ্রেষ্ঠ? প্রভুপাদ একটু দূরে ছিলেন, ভক্তগণের প্রেম-কল্লোল শুনিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—] "শ্রীচৈতন্যমঠে চৈতন্যদেব থাকেন, আর গৌড়ীয়মঠে গৌড়ীয় বৈষ্ণব থাকেন, তাহা হইলে কোনটি শ্রেষ্ঠ? চৈতন্যমঠে চৈতন্যদেবের পূজা হয়, গৌড়ীয়মঠে চৈতন্যদেবের ভক্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পূজা হয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব চৈতন্যদেবেরই অনুগত। **গৌড়ীয়মঠ চৈতন্যমঠের অনুগত।"**

"যাহারা স্ত্রীপুত্র প্রতিপালনের জন্যই ব্যস্ত এবং সেইরূপ মোহজাত ভোগেচ্ছা পরিপোষণার্থ পরমোপাস্য শ্রীভগবান্‌কে তাহাদের ইন্ধন-সংগ্রহের নিমিত্ত নিযুক্ত করিবার জন্য সচেষ্ট, তাদৃশ ব্যক্তি কি প্রকারে লোকশিক্ষক জগদ্‌গুরুর কার্য করিতে পারে? শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তগণের আচার প্রচারে কি দেখিতে পাওয়া যায়? যাঁহাদের দ্বিতীয়াভিনিবেশজাত ভয়, শোক মোহ বা দেহ-দ্রবিণ-সুহৃৎ প্রভৃতির জন্য শোক, স্পৃহা, লোভ, পরিভব প্রভৃতি বৃত্তি রহিয়াছে, তাঁহারা ভগবানে শরণাগত হন নাই। তাদৃশ অশরণাগত ব্যক্তি কখনই অপর জীবকে শরণাগত হইবার উপদেশ দান করিতে পারেন না, আর কেবল মৌখিক উপদেশ প্রদান করিলেও তাদৃশ আচারহীন প্রচার ফলপ্রদ হয় না। যিনি নিষ্কিঞ্চন—২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টা—শতকরা শত পরিমাণ কৃষ্ণে নিষ্কপট শরণাগত বা কৃষ্ণের একান্ত সেবক, সেইরূপ মহাভাগবত বৈষ্ণবই আচার্যের আসন গ্রহণ করিতে পারেন।

ভগবানের নাম-সেবা, ধাম-সেবা ও কাম-সেবা এই তিন সেবায় যাঁহারা যোগদান করেন; তাঁহারাই জগতের বরেণ্য। নাম-সেবা ব্যতীত জীবমাত্রেরই প্রাপঞ্চিক-বিচার হইতে উদ্ধার লাভের উপায় নাই। নাম-সেবার ফলে মানব-জগত সকল কুসংস্কারের হাত হইতে উদ্ধার

লাভ করিয়া কৃষ্ণ-কামসেবায় প্রতিষ্ঠিত হন। ধামসেবা হইতে মায়াবাদ —অর্থাৎ 'আমি প্রভু,—ঈশ্বর, ভগবানের নিত্য নাম-রূপ-গুণ-লীলা তদ্রূপ বৈভবাদি নাই—এই ভীষণ অসৎ মতবাদের কবল হইতে উদ্ধার লাভ করা যায়, আর কৃষ্ণ-কাম-সেবা হইতে নিজের আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণের অভিলাষরূপ ভীষণ বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, নশ্বর কাম হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া অপ্রাকৃত কামদেবের সেবা, কাম গায়ত্রীর সেবায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়।

স্থূল শরীর ধারণ করিতে যাইয়া ইন্দ্রিয়তর্পণ-মূলে যে সকল ইতর বাসনার উদয় হইয়াছে, সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করিতে যাইয়া ভগবৎ-সেবা-চেষ্টায় উদাসীন হইয়া যে সকল মনোধর্মচালিত বিপরীত পথে ধাবিত হইতেছি, সেই মুখটা উল্টাইয়া যায়, যদি আমাদের কৃষ্ণ-কাম-সেবায় রতি উদিত হয়। সেই কৃষ্ণ-কাম-সেবা আবার লাভ হয়, যদি আমরা ধামসেবা করি।

ধাম অর্থে—রশ্মি, প্রভাব, তেজঃ, গৃহ, স্থান, শরীর, জন্ম প্রভৃতি। বিদ্বদ্রূঢ়ি বৃত্তিতে যেখানে আত্মহিংসা, মৎসরতা ও নশ্বরতা নাই—যাহা নিত্য স্বপ্রকাশ—যাহা নিত্য চিন্ময়, যাহা নিত্য আনন্দময় তাহাই শ্রীধাম। সেই শ্রীধামে শ্রীচৈতন্যদেব উদিত হইয়া জগৎকে চৈতন্যবিশিষ্ট করিয়াছেন।

আমরা এই ধামের প্রভাব বুঝিতে না পারিয়া অন্যান্য কার্যে ব্যস্ত ছিলাম, ধাম-সেবায় আদৌ রুচি ছিল না, শ্রী অর্চায় তাদৃশ শ্রদ্ধা ছিল না—অধ্যয়নে ব্যস্ত ছিলাম, যুক্তিদ্বারা পাণ্ডিত্য-প্রতিভা-দ্বারা চরিত্র গৌরবের দ্বারা জগতের লোককে পরাভূত করিব এরূপ বুদ্ধি-বিশিষ্ট ছিলাম; কিন্তু কোন মহাত্মা 'ধাম-সেবায়ই তোমার সর্বমঙ্গল লাভ হইবে'—এই বলিয়া শ্রীধাম-সেবায় নিযুক্ত করিলেন। যিনি এই

ধাম-সেবায়, নাম-সেবায়, কৃষ্ণ-কাম-সেবায় নিযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহার আনুষ্ঠানিক চেষ্টা হইতেই এই শ্রীধাম-প্রচার-কার্য আরম্ভ হইয়াছে। তাঁহারই শিক্ষা সকলকে ধাম-সেবায় নিযুক্ত করুন। ধামসেবা হইলে শ্রীনাম-সেবা হইবে, শ্রীনাম-সেবা হইলে কৃষ্ণ-কামসেবা হইবে। ধামে যিনি সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহার গ্রামে রতি, গ্রাম্য সম্বন্ধ অচিরেই বিদূরিত হয়। ধামে সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে শ্রীনামসেবারূপ অভিধেয় অত্যল্পকাল মধ্যেই কৃষ্ণ-কামরূপ প্রয়োজন লাভ করায়—ইহাই মানব জীবনের একমাত্র প্রয়োজন-তত্ত্ব।

সকল জিনিষই কালে পরিণামশীল, এই সকলে আস্থা স্থাপন করিয়া অনেকদিন থাকিতে পারিব না। যে জিনিষ অনিত্য, তাহাতে এত আকর্ষণ কেন? কামের চেষ্টা কেন? কৃষ্ণে আকর্ষণ—কৃষ্ণসেবায় কাম হয় না কেন? ঈশ-বিমুখ-ভাব আমাদের এত প্রবল কেন? আমরা চেতনে সম্পূর্ণ উদাসীন—আমরা শিক্ষা পাই নাই—দক্ষিণে বামে বিভিন্ন অচৈতন্য শিক্ষকের প্রণালী আমাদিগকে গ্রাস করিয়াছে। অচৈতন্যের কথা বা বিদ্ধ-চেতনের কথা আলোচনা-দ্বারা মনোধর্মী হইয়া আমাদের কোন মঙ্গল হইবে না। মানব জাতির বিচারভ্রান্তি হইতে কি আমরা উদ্ধার লাভ করিতে পারি না? নিশ্চয়ই পারি। চেতনের আশ্রয় গ্রহণ করিলে অচেতনের ক্লেশ—হেয়তা হইতে নিশ্চয়ই উদ্ধার লাভ করিতে পারি।

একমাত্র বৈকুণ্ঠ-নাম কৃপা করিয়া ইহ জগতে আগমন করিয়াছেন। এই নাম যাঁহার উপর আহিত, তাহা শ্রীধাম,—এই শ্রীধামের সেবাদ্বারা আমাদের নাম-সেবা বা কৃষ্ণ-কামসেবা লাভ হয়। শ্রীধামের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া নাম-সেবার ছলনা কখনও কৃষ্ণ কাম-সেবারূপ প্রয়োজন প্রদান করে না। সর্বতোভাবে শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রয় ব্যতীত

জীবের মঙ্গল লাভ হইতে পারে না। কেবল চেতনের ধর্ম কি, তাহা যদি কখনও বিদ্যুতের কণার ন্যায়ও চৈতন্যজনগণের কৃপাবলে আঁমাদের দৃষ্টিপথে আগমন করে, তাহা হইলে অন্ধকার রাজ্যের মানবজাতির পরামর্শ হইতে আমরা উদ্ধৃত হইতে পারি। বিশ্ববধূ-জীবন শ্রীনামের সেবা শ্রীধামে অবস্থিত না হইলে হইতে পারে না। শ্রীনামসেবা না হইলে কৃষ্ণ-কাম-সেবাও হয় না।"

"গদাধরের চরিত্র লিখুন ; লিখিবার পূর্বে গদাধর-চরিত্রের সংগৃহীত উপকরণগুলি কি ভাবে সাজাইতে হইবে এবং তাঁহার চরিত্রের কি কি বৈশিষ্ট্য, তাহা আমাকে একবার দেখাইয়া ও শুনাইয়া লইবেন। এইরূপভাবে অন্যান্য বৈষ্ণবাচার্যগণের চরিত্র লেখা আবশ্যক। বৈষ্ণবাচার্য-গণের সেবা ব্যতীত আমাদের মঙ্গল হইতে পারে না। মহাপ্রভুর সেবা হইতে মহাপ্রভুর ভক্তগণের সেবা আরও বড়। মহাপ্রভুর ভক্তগণের সেবা করিলে সপরিকরবৈশিষ্ট্য নাম-রূপ-গুণ-লীলাময় মহাপ্রভুর সেবা হয়। চরিত্রের ঘটনাবলীর সঙ্গে সঙ্গে হরিভজনের কথা বিবৃত থাকা আবশ্যক। যদিও হরিভজনের কথা সকলে বুঝিবেন না এবং যাঁহারা বুঝিয়াছেন বলিয়া অভিমান করিবেন, তাঁহারাও বিকৃত ও বিপরীতভাবেই ভজনের কথা গ্রহণ করিবেন, তথাপি সৌভাগ্যবান ব্যক্তিগণের জন্য হরিভজনের কথা থাকা আবশ্যক।"

"গীতা শাস্ত্র বলিয়াছেন, জীব বা আত্মা স্থূল ও সূক্ষ্ম আবরণে আবৃত হইয়া ভগবদ্‌বিস্মৃতি ফলে জগতে উপস্থিত হয়। ঐরূপ আবৃতাবস্থায় মনের দ্বারা যে ধ্যান এবং ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে রূপ রসাদি বিষয় গৃহীত হয়, তাহাতে আরও অধিকতর ক্লেশ পরম্পরা উদিত ও ভগবৎস্মৃতিরূপ আত্মস্বভাব আবৃত হইতে থাকে। মন পরিবর্তনশীল ; আত্মা অপরিবর্তনীয়, নিত্য। মনের কার্য—ভোগ বা নির্ভোগ, আর

আত্মার কার্য--সেবা। মন তৃতীয় মানের বস্তু পর্যন্ত জানিতে পারে, আত্মাই চতুর্থমান বা তুরীয়ের অভিজ্ঞান প্রাপ্ত হইতে পারে। বর্তমান অবস্থাতে সেই সমস্ত বিষয় জানা অত্যন্ত কঠিন—ইহা যেইরূপ সত্য, তদ্রূপ সেই সব বিষয় জানিবার যে উপায় আছে, তাহাও সত্য। আমাদের দূরদেশস্থ বান্ধবের সংবাদ 'পিয়ন' আমাদের নিকট আনিয়া দেয়। [পুনরায় প্রশ্নকর্তা বলিলেন—কাহারও কাহারও সংবাদ 'পিয়ন' নাও আনিতে পারে। তদুত্তরে প্রভুপাদ বলিলেন,]—"পিয়ন যাহাদের চিঠি আনিয়া দিল না, জানিতে হইবে, তাহাদের কপাল বড়ই মন্দ। যাহারা সংবাদের জন্য আর্ত, তাহাদের নিকট অবশ্যই 'পিয়ন' সংবাদ আনিয়া দিয়া থাকে।"

[পুনঃ প্রশ্ন—'সেই পিয়নকে কিরূপে চেনা যাইবে এবং সংবাদের সত্যত্ব ও মিথ্যাত্বই বা কিরূপে জানা যাইবে? তদুত্তরে প্রভুপাদ বলিলেন—]

"কোন বস্তু-বিষয়ে জ্ঞান উপার্জন করিতে হইলে জগতে দুটি উপায় দেখিতে পাওয়া যায়, একটি—জগতের অভিজ্ঞতা দ্বারা বস্তু জানিবার প্রয়াস, আর একটি জগতের অভিজ্ঞতার অসম্পূর্ণতা জানিয়া যে রাজ্যের জ্ঞান, সেই রাজ্য হইতে অবতীর্ণ পুরুষের নিকট সর্বতোভাবে আত্ম-সমর্পণপূর্বক শ্রুতিমূলে জ্ঞান লাভ।" [প্রশ্ন হইল—জগতের ভিতরেই আমাদের অবস্থান, সেই অভিজ্ঞতা পরিপূর্ণরূপে বর্জন করিয়া কোন অতিমর্ত্য বস্তুতে কিরূপে শরণাগত হওয়া যাইতে পারে? উত্তরে প্রভুপাদ বলিতেছেন—] "কঠিন মনে করিয়া ভীত হইলে চলিবে না; সত্যবস্তু জানিতে হইলে হৃদয়ে খুব বল চাই। সাঁতার শিখিতে হইলে প্রথমে জল দেখিয়া ভীত হইলে সাঁতার শিক্ষার ফল পাইবে না। শরণাগতি ব্যাপারটী কঠিন নয়, উহাই আত্মার পক্ষে অতি স্বাভাবিক

ও সহজ। শরণাগতির বিপরীত যাহা কিছু, তাহাই অস্বাভাবিক ও ক্লেশকর। ভগবানের কথা শুনিতে হইলে ভগবানের এজেন্টের নিকট হইতে শুনিতে হইবে। যখন সেই কথা শুনিব, তখন জগতের সমস্ত অভিজ্ঞতা কুতর্ক প্রভৃতিকে বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। ভগবানের পরাক্রমপূর্ণ বীর্যবতী কথা শুনিতে শুনিতেই হৃদয়ের দৌর্বল্যাদি অনর্থগুলি দূরীভূত হইবে। হৃদয়ে অভূতপূর্ব সাহস আসিবে, তখন শরণাগতি বা আত্মার সহজধর্ম সম্পূর্ণভাবে উদিত হইবে। সেই শরণাগত হৃদয়ে চতুর্থমান অর্থাৎ তুরীয় অতীন্দ্রিয় রাজ্যের স্বপ্রকাশ সত্য স্বয়ং প্রকাশিত হইবে। এই উপায়েই সত্য জানা যায়, অন্য কোন পন্থায় আর অকৈতব সত্য জানিবার উপায় নাই। ভগবৎকথা ও জগতের কথায় পার্থক্য আছে। প্রত্যেক শব্দের দুই প্রকার বৃত্তি ; একটি জগতের পরিবর্তন-শীল বস্তু নির্দেশ করে এবং ভগবান্‌কে বিস্মৃত করাইয়া দেয় ; আর একটি নিত্যবস্তু নির্দেশ করে এবং ভগবানের স্বরাজ্যের উপলব্ধি ও উদ্দীপনা করায়। বৈকুণ্ঠের শব্দব্রহ্ম এবং এই কুণ্ঠিত জগতের শব্দের মধ্যে কি তফাৎ—আচার্যের মুখে শ্রবণ করিলে ভগবন্নাম-গ্রহণের যোগ্যতা লাভ হয়।"

"ঐশ্বর্য, বীর্য, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যশঃ ও শ্রীর জন্য আকাঙ্ক্ষা বহির্মুখ জীবের নিসর্গগত। আমি স্বতন্ত্র থাকিব, অধীনে থাকিলে অপরের বিচারের অন্তর্গত থাকিতে হয়, নিজের ভোগ-যথেচ্ছার পরিপূরণ হয় না—এইরূপ ভোগময়ী বুদ্ধি আসিয়া মানবকে আনুগত্য-ধর্ম হইতে ভ্রষ্ট করে। কিন্তু বহির্মুখ জীব বুঝিতে পারে না যে, এই সকল (ঐশ্বর্য-বীর্য-জ্ঞানাদি) নিত্য-বশ্য-স্বরূপযুক্ত জীবের থাকিতে পারে না। ঐ সকল ঈশতত্ত্বেই থাকিতে পারে। শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুতে ঐরূপ বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য, জ্ঞান বীর্য, যশঃ, শ্রী সকলই স্বাভাবিক

থাকিয়া ধন্য হইয়াছিল ; কিন্তু তিনি ঐশ্বর্য, বৈরাগ্য, জ্ঞান, যশঃ প্রভৃতির জন্য কোন যত্ন করেন নাই। সমস্ত ঐশ্বর্য, বিভুতা, সিদ্ধি তাঁহার করতলগত ছিল ; কিন্তু তিনি কর্মি-জ্ঞানি-যোগি-তপস্বীর ন্যায় ঐশ্বর্যের ভিখারী বা ঐশ্বর্য প্রদর্শনে লোলুপ ছিলেন না। কর্মি-জ্ঞানি-যোগি-তপস্বীর কখনও যে সকল ঐশ্বর্যের বিন্দুমাত্র প্রাপ্তি ঘটিবে না, সেইরূপ অনন্ত নিখিল ঐশ্বর্য শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর পদনখে বিরাজিত থাকিয়া ধন্য হইলেও শ্রীল রঘুনাথ সেই সকল ঐশ্বর্যের বণিক ছিলেন না। ফল্গু মায়াবাদীর ন্যায় তাঁহার বৈরাগ্য-চেষ্টাও ছিল না। তিনি কর্মি-জ্ঞানি-যোগিগণের ন্যায় বৈরাগ্যের ভিক্ষুকও ছিলেন না। বৈরাগ্য সিদ্ধির অবধি তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া ধন্য হইয়াছিল।

শ্রীল রঘুনাথ বৈরাগ্যাদির জন্য যত্ন করেন নাই কেন? জীব নিজের প্রেয়ের জন্য ব্যস্ত। প্রেয়ঃ জিনিষটা খারাপ নয়, যদি কৃষ্ণকে কেন্দ্রীভূত করিয়া হয়। কৃষ্ণকে যিনি নিজের অপেক্ষা শতগুণ অধিক ভালবাসেন—কৃষ্ণপ্রেমকে সহস্রগুণ ভালবাসেন, তাঁহার এইরূপ হয় :—

'আশাভরৈরমৃতসিন্ধুময়ৈঃ কথঞ্চিৎ
কালো ময়াতিগমিতঃ কিল সাম্প্রতং হি।
ত্বঞ্চেৎ কৃপাং ময়ি বিধাস্যসি নৈব কিং মে
প্রাণৈ র্ব্রজেন চ বরোরু বকারিণাপি ॥'

[হে বরোরু রাধে, অমৃতসমুদ্রময় আশা প্রাচুর্যে আমি অতি কষ্টে কালাতিপাত করিয়াছি ; এখন যদি তুমি আমার প্রতি কৃপা বিধান না কর, তাহা হইলে আমার প্রাণ, ব্রজবাস, এমন কি কৃষ্ণে কি প্রয়োজন?]

এইরূপ বৈরাগ্য-সিদ্ধি-পরাকাষ্ঠার কথা কি কেহ কখন শুনিয়াছেন? শ্রীল রঘুনাথ প্রভু রাধাদাস্য ব্যতীত কৃষ্ণকে পর্যন্ত চাহেন নাই। এত বড় বৈরাগ্যের কথা নৃলোকে সম্ভব হয় না—শ্রীস্বরূপের কৃপাভিষিক্ত একান্ত-জন ব্যতীত এই বৈরাগ্যের আদর্শ অপর কেহ বুঝিতেও পারে না। যিনি রাধাদাস্য ব্যতীত কৃষ্ণ পর্যন্ত চাহেন না, তিনি কি ইহ লোকের সামান্য বৈরাগ্য, শ্রী, ঐশ্বর্য, বীর্য, জ্ঞানের জন্য যত্ন করিবেন?

কৃষ্ণপ্রেষ্ঠকে কত দূর সেবা করিলে, কৃষ্ণপ্রেষ্ঠে কতদূর প্রীতি-পরাকাষ্ঠা থাকিলে এইরূপ বিচার হয়! সেইদিন যেমন শ্রীচৈতন্যমঠে গান হইয়াছিল—

'তোমার গরবে গরবিনী হাম্
রূপসী তোমার রূপে।' ইত্যাদি।

প্রাকৃত সাহজিকগণ এই গান গায় বটে, কিন্তু ইহার তাৎপর্য বুঝে না। ·········লোক রাইকানুর গান করেন; কিন্তু তাঁহাদের বিচারের ভুল কোথায়? রাই কানুর গানে প্রচুর সাহিত্য আছে, খুব কর্ণরসায়ন, তাহাতে মনের তর্পণ হয়, ইহাতে তাঁহারা মনে করেন যে, তাঁহারা ভগবদ্ভক্তির কথার খুব নিকটেই আসিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের যে অসুবিধা রহিয়াছে, তাঁহারা নিজের স্বরূপ, কৃষ্ণের স্বরূপ, কৃষ্ণপ্রেমের স্বরূপ কিছুই উপলব্ধি করিতে পারেন না, কেবল আত্মেন্দ্রিয় তর্পণেই ব্যস্ত। ঐ সকল গানে তাঁহাদের সেবা-বুদ্ধি, সেব্যের ইন্দ্রিয়তর্পণ করিবার চেষ্টা উদ্রিক্ত হওয়ার পরিবর্তে গানের সাহিত্য, কাব্য, সুর-তান-মান-লয়ই এত 'বড়' হইয়া উঠে যে, তাঁহাদের সুবুদ্ধিকে ডুবাইয়া দেয়। মায়ার এমনই ছলনা!

*　　*　　*　　*

ন প্রেমগন্ধোঽস্তি দরাপি মে হরৌ
ক্রন্দামি সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুম্।
বংশীবিলাস্যাননলোকনং বিনা
বিভর্মি যৎ প্রাণপতঙ্গকান্ বৃথা ॥"

কৃষ্ণে আমার সামান্য প্রেমগন্ধও নাই। তবে যে আমি ক্রন্দন করি, তাহা কেবল নিজের সৌভাগ্যাতিশয্য প্রকাশ করিবার জন্য। বংশীবদন কৃষ্ণের দর্শন ব্যতীত আমার প্রাণ-পতঙ্গ ধারণ নিরর্থক।

আমার কৃষ্ণবহির্মুখতা ইহার দ্বারাই প্রমাণিত হইতেছে যে, কৃষ্ণের সাক্ষাৎ পাইতেছি না, অথচ প্রাণধারণ করিয়া আছি।

"কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ লাগিয়া।
এ অধম দাস কেন না গেল মরিয়া ॥"

আমার কৃষ্ণ দর্শন হইতেছে না অথচ প্রাণ ধারণ করিবার এত সাধ? আমার মত কৃষ্ণ-বহির্মুখ আর কে?

বহুদিন পূর্বের কথা, একদিন আমি মহাপ্রভুর বাড়ীতে আছি, ঘোর অমাবস্যা রাত্রি। পরমহংস বাবাজী মহারাজ (ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজ) তখন (আমাদের বাহ্য দর্শনের বিচারে) দিনের বেলায়ই চোখে দেখিতে পান না; কিন্তু অমাবস্যার ঘোর অন্ধকারে রাত্রি ১টার সময় কুলিয়া হইতে শ্রীমায়াপুরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত! কেই বা তাঁহাকে পথ দেখাইয়া দিয়াছিলেন, কেই বা নদী পার করিয়া দিলেন! আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—এই ঘোর অন্ধকার অমাবস্যার মধ্যরাত্রিতে কে আপনাকে পথ দেখাইয়া দিলেন? আমাদের গুরুদেব তাহা শুনিয়া হাস্য করিলেন। তখন বুঝিলাম তাঁহাকে কৃষ্ণই পথ দেখাইয়া দিয়াছেন।

তিনি কি এক ভাবে উন্মত্ত হইয়া কৃষ্ণানুসন্ধান করিতে করিতে শ্রীযোগপীঠে আসিয়া উপস্থিত! তিনি তখন শ্রীযোগপীঠে ক্ষেত্রপাল শিবের মন্দিরের নিকট কদমতলায় থাকিতেন, ঘরে প্রবেশ করিতেন না। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামিপ্রভুর বৈরাগ্য, আমরা আমাদের শ্রীগুরুদেবেই দেখিয়াছি।”

ভক্তিগ্রন্থ ও ভক্তের অবস্থানের জন্যই শ্রীমন্দিরের প্রয়োজন

“যেমন বাহ্যে গৌড়ীয়মঠের বিপুল সৌধ নির্মিত হইল, তদ্রূপ আভ্যন্তরীণ হরিভজনের কথা জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিবার জন্য কতকগুলি গ্রন্থও রচিত হওয়া আবশ্যক; ইষ্টক প্রস্তরাদি নির্মিত বা সৌধ অপেক্ষা অপ্রাকৃত কীর্তনচর্চার মন্দির ও নাট্যমন্দিরস্বরূপ গ্রন্থভাগবত—ভক্তভাগবতসমূহ রচিত হইলে জগতে হরিকথা আরও অধিকতর দিন প্রচারিত থাকিবে। এখন আসন নির্মিত হইল মাত্র, একজনের সমস্ত জীবনের উপার্জিত অর্থদ্বারা ভগবৎকথা-প্রচারের দুর্গ স্থাপিত হইল বটে, কিন্তু এই দুর্গে থাকিয়া বহির্মুখ জগতের সঙ্গ হইতে—কলি-কোলাহল হইতে আত্মরক্ষা করিয়া এখানে বসিয়া হরিকথা প্রচার করিতে হইবে। আরও কতকগুলি গ্রন্থ প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। গ্রন্থ-সৌধ ও আদর্শ জীবন নির্মিত হইলেই ভগবদ্-ভক্তির কথা জগতে স্থায়ী হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবত

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের একটি বিবৃতি রচিত হওয়া আবশ্যক। ঐ বিবৃতি কেবল কতকগুলি অনুস্বার- বিসর্গের পণ্ডিত বা প্রাকৃত

সহজিয়ার বাগাড়ম্বরের প্রদর্শনী মাত্র হইবে না ; কিন্তু যাঁহাদের প্রকৃত অপ্রাকৃত সৌন্দর্য পিপাসার উদয় হইয়াছে, সেই সকল লৌল্যযুক্ত ব্যক্তির প্রয়োজনীয় পাঠ্য হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতের মত পুঁথি জগতে আর নাই। এই একটা গল্পের কথা নয় ; মানুষ যদি সত্য সত্য নিরপেক্ষ বিচারক হইয়া ইহার অনুধাবন করেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে, ভাগবতের মত গ্রন্থ জগতে হয় নাই ও হইবে না। আমরা যে কথা বলিয়া থাকি, সেই সংশয়-নাস্তিক্য-নির্গুণ-ক্লীব-পুরুষ-মিথুন-স্বকীয়-পারকীয় বিলাসের উত্তরোত্তর ক্রমোৎকর্ষের কথা এই ভাগবত গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে। দশম স্কন্ধে কৃষ্ণলীলার কথা বিবৃত রহিয়াছে ; কিন্তু তৎপূর্বে আর নয়টি স্কন্ধ রচনা করিবার কি প্রয়োজন ছিল? যে গ্রন্থের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়—কৃষ্ণ-লীলা, সেই গ্রন্থ স্বরাট্ কৃষ্ণের স্বেচ্ছাচারিতার কথা বলিবার জন্য তৎপূর্বে নয়টি স্কন্ধ স্থাপন করিলেন। তাহাতে সংশয়, নাস্তিক্য, নিগুণ, ক্লীব, পুরুষ, মিথুন, স্বকীয় বিচার প্রদর্শন করিয়া অপ্রাকৃত পারকীয় বিলাসের কথা দশম স্কন্ধে গোপীগীতা প্রভৃতিতে স্থানে স্থানে প্রদর্শন করিলেন। ভাগবত মহাপ্রভুর প্রকট-কালের পূর্বেও ত অনেকে পাঠ করিয়াছেন, কিন্তু যাঁহারা রূপানুগবর কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর শ্রীচরিতামৃত পাঠ করিয়া ভাগবত পাঠ করিয়াছেন—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকৃত তাৎপর্য—শ্রীমদ্ভাগবতের উদ্দিষ্ট বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। প্রাকৃত সহজিয়াগণ যে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন, ব্যবসায়ী যে ভাগবত ব্যাখ্যা করেন, তাহাতে শ্রীরূপানুগ-পন্থায়—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উদ্দিষ্ট পন্থায় ভাগবতপাঠ আবৃত হয়। আমরা সেইরূপভাবে দশমস্কন্ধের বিবৃতি লিখিবার জন্য প্রস্তুত নই। অসংখ্য সহজিয়া সেইরূপ ভাবের ব্যাখ্যা বিবৃতি লিখিয়া লোকের

চিত্তরঞ্জন-পূর্বক পরের ও নিজের নরকের পথ পরিষ্কার করিতে পারে।

শ্রীমদ্ভাগবত নিগম কল্পতরুর গলিত ফল :—

নিগম-কল্পতরোর্গলিতং ফলং
শুকমুখাদমৃত-দ্রব সংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং
মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ ॥

'নিগম' শব্দে বেদ; সেই বেদ—কল্পতরু অর্থাৎ কল্পনা, সঙ্কল্পিত বা আকাঙ্ক্ষিত ফল প্রসবকারী। অভক্তগণ ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ কামনা বা সংকল্প করিয়া থাকে; কিন্তু যাঁহাদের ভুক্তি মুক্তিকাম নিরস্ত হইয়াছে—যাঁহারা ভাবনার পথ অতিক্রম করিয়াছেন, তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা বা সংকল্প ঐরূপ কুরস বা নীরসযুক্ত বস্তু নহে। অন্যাভিলাষী কর্মী—বিকৃতরসের প্রার্থী আর নির্ভেদজ্ঞানী নির্বিশেষ নীরসের প্রার্থী; ভাগবত সেইরূপ কুরস বা নীরস-যুক্ত ফল প্রসব করেন না। ভাগবতে বিষয় আশ্রয় ভাবের—সেব্য-সেবক ভাবের বিচার কিরূপে অত্যন্ত সঙ্কুচিত, ঈষৎ মুকুলিত, পুষ্পিত, বর্ধিত, পরিপুষ্ট ও প্রপক্ক অবস্থা লাভ করিয়া উত্তরোত্তর ক্রমোৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়াছে, তাহা বিশেষভাবে অনুধাবন করা যায়। সেই সংশয়, নাস্তিক্য, নির্গুণ, ক্লীব, পুরুষ, মিথুন, স্বকীয়, পারকীয় বিলাসের উত্তরোত্তর ক্রমোৎকর্ষ পল্লবিত হওয়ায় ভাগবত কল্পতরুর ন্যায় সৌন্দর্য পিপাসাতুর ব্যক্তিগণের সঙ্কল্পের ফলপ্রদানকারী আর অন্য কোন প্রকার বৃক্ষ চতুর্দশ ব্রহ্মাণ্ডে এমন কি, বিরজা ব্রহ্মলোকের অতীত বৈকুণ্ঠে পর্যন্ত নাই। তরুণ, কষায়, পক্ক, প্রপক্কভেদে পরপর উৎকর্ষ— যাহা পারকীয় বিচারের তারতম্যে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা আমরা

অপ্রাকৃতরূপের সেবা-পিপাসুগণের—রসিক ভাবুকগণের ভাগবতাস্বাদনের মধ্যেই দেখিতে পাই। যাঁহারা স্থায়ী ভাবভূমিকায় অবস্থিত আছেন, তাঁহারাই ভাবুক। স্থায়ী ভাবের সহিত চতুর্বিধ সামগ্রীর সম্মেলনে যে অপ্রাকৃত রসের উদয় হয়, সেই রসে যাঁহারা অভিষিক্ত—প্রাকৃত ভাবনার পথ বিশেষভাবে অতিক্রম করিয়া এক অপ্রাকৃত মহা চমৎকার-প্রাচুর্যের ভূমিকায় বিশুদ্ধ-সত্ত্বোজ্জ্বল হৃদয়ে যে রস আস্বাদিত হয়, সেই রসের যাঁহারা রসিক, তাঁহারাই এই নিগমকল্পতরুর ফল আস্বাদন করিতে পারেন। এই ফল—গলিত ফল। অন্যান্য ফল ভক্ষণকালে কণ্ঠরোধ হইতে পারে, কিন্তু এই ফল কেবল রস-যুক্ত, সুপক্ক বলিয়া অতি সহজে গলাধঃকরণ করা যায়। এই ফলে কোন প্রকার খোসা, আঁটি, আঁশ, ছোবড়া প্রভৃতি অসার বা পরিত্যাজ্যাংশ নাই। অন্যাভিলাষ কর্ম-জ্ঞান-যোগবিদ্ধা ও মিশ্রাভক্তি-প্রতিপাদক গ্রন্থে নানাপ্রকার হেয়াংশ ও আবরণ রহিয়াছে; কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে সেই প্রকার কোন হেয়তা নাই। ইহা সুনির্মল সুপক্ক কেবল রসস্বরূপ। শ্রীমদ্ভাগবত সাক্ষাৎ অখিলরসামৃতসিন্ধু কৃষ্ণ। 'আলয়ং'—লয়মভিব্যাপ্য—মুক্তাবস্থায়ও এই ভাগবত-রস আস্বাদ্য। মুক্তকুলই এই শ্রীমদ্ভাগবতের নিত্য আস্বাদন করিয়া থাকেন। মুক্তকুলশিরোমণি পরমহংস বৈষ্ণবগণের মুখে ভাগবত শ্রবণ না করিয়া যাঁহারা অনর্থযুক্ত ও অনর্থরক্ষণশীল ভৃতক ব্যক্তিগণের মুখে কেবল কাব্য, সাহিত্য, অনুস্বার, বিসর্গ প্রভৃতির বাহ্য বিচারে প্রমত্ত হইয়া ইন্দ্রিয়-তর্পণের অভিলাষ হেতু ভাগবত শ্রবণের অভিনয় করে, সেই সকল প্রাকৃত সহজিয়া ভাগবতের নির্মলরস আস্বাদন করিতে পারে না; উহারা বিরস বা কুরসকেই 'রস' বলিয়া ভ্রান্ত হইয়া থাকে। শুকদেবাদির ন্যায় মুক্ত পরমহংস যখন ভাগবত কীর্তন করেন, তখন পরীক্ষিতের ন্যায় জীবনের

নশ্বরতা সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় ব্যক্তি ভাগবত শ্রবণ করিয়া ভাগবতের রসে নিত্য রসিক হইয়া পড়েন, তখন তাঁহার আর ইতরবিষয়াসক্তি থাকে না।

ভাগবতের দশম স্কন্ধ ভাল করিয়া আলোচনা হওয়া আবশ্যক,—ভাল করিয়া ভাগবতের দশম স্কন্ধের বিবৃতি লেখা আবশ্যক। রাস-পঞ্চাধ্যায়, ভ্রমরগীতা, গোপীগীতা প্রভৃতি রূপানুগ-গৌড়ীয়-বিবৃতি নির্মাণ করা কর্তব্য। জগতে রূপের কথা নাই, কুরূপের কথা আছে। প্রাকৃত সহজিয়াগণ 'এঁচড়ে পাকামি' করিবার জন্য ভ্রমরগীতা, গোপী-গীতা প্রভৃতি লইয়া যে ছিনিমিনি খেলিতে চায়, সেই সকল দুর্বুদ্ধি অপসারিত করিয়া ভ্রমরগীতার, গোপীগীতার প্রকৃত বিবৃতি লেখা আবশ্যক। এতদিন আমাদের যে কার্য হইতেছিল, তাহা কেবল **অতন্নিরসন** মাত্র। 'গৌড়ীয়' আটবৎসর যাবৎ অতন্নিরসন সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছেন, সেই সকল পাঠ করিলে সহজিয়াগণের মঙ্গল হইতে পারে; কিন্তু অতন্নিরসন বা অনুকূল গ্রহণেই আবদ্ধ থাকিলে আমরা হরিভজনের কথায় অগ্রসর হইতে পারিব না। সহজিয়া সম্প্রদায় বলিতেছে—'আমরা নামাপরাধ ছাড়িব না'; আমাদের লোকেরা বলিতেছেন—'আমরা তোমাদের ন্যায় নামাপরাধ করিব না'। ইহাতে অনুকূল ক্রিয়া মাত্র হইতেছে; কিন্তু হরিভজন হইতেছে না। অনুকূল গ্রহণমাত্র হইলেই হইবে না, কৃষ্ণানুশীলন হওয়া চাই, নতুবা মৃগীব্যাধিযুক্ত ব্যক্তির ন্যায় অনুকূলমাত্র গ্রহণ করিয়া পথে চলিতে চলিতে সময় সময় মাঝ পথে অকস্মাৎ এক একটা মূর্চ্ছা উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে ফেলিয়া দিবে। প্রতিকূল কিছু আসিলেই আমরা হোঁচট খাইয়া পড়িয়া যাইব—হয়ত এক ভাণ্ড কুরস খাইয়া ফেলিব। অনুকূল ক্রিয়াতে জন্মজন্মান্তরে সুবিধা হইবে বটে, কিন্তু

এই জীবনেই বিদেহ মুক্তি, সিদ্ধিলাভ বা প্রকৃত হরিভজন হইবে না। কৃষ্ণের রূপ-গুণে মুগ্ধ না হইলে কৃষ্ণ হইতে অনেক দূরে থাকিতে হইবে। রূপের জন্য যাঁহাদের লৌল্য জন্মিয়াছে—যাঁহারা সৌন্দর্যপিপাসু, তাঁহারাই কৃষ্ণের সন্নিধানে যাইতে পারিবেন। আমি প্রকৃত সৌন্দর্যের কথা বলিতেছি না, শ্রীরূপের আনুগত্যই যাঁহাদের সকল আশা-ভরসা—শ্রীরূপমঞ্জরীর পাদপদ্মই যাঁহাদের ভজন-পূজন,—শ্রীরূপ পাদপদ্মে সিদ্ধিই যাঁহাদের একমাত্র লালসা, সেইরূপ সৌন্দর্যপিপাসু ব্যক্তিগণই হরিভজনের কথা বুঝিতে পারিবেন। এই সৌন্দর্যপিপাসু ব্যক্তিগণের জন্যই দশম স্কন্ধের ভাগবত-বিবৃতি লেখা আবশ্যক। আমরা প্রাকৃত সহজিয়াগণের ভ্রমরগীতা, গোপীগীতার পাঠ ব্যাখ্যাগুলির অনুমোদন করি না, কিন্তু ঐ সকলের যথার্থ ব্যাখ্যাও তৎসঙ্গে প্রদান করা কর্তব্য। কেবল 'ইহা নহে—ইহা নহে' বলিবার সঙ্গে সঙ্গে 'ইহা হয়' বলাও আবশ্যক। অতন্নিরসন ব্যাপারটী কেবল ঋণ-জাতীয় (Negative)—ধন জাতীয় (Positive Side) নহে। অতন্নিরসন করিয়া কেবল 'তৎ' এর সন্ধান বলিলেও হইবে না, 'সঃ' এর—Absolute Personality র (বাস্তব বস্তুর—পরম সবিশেষ বস্তুর) নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-বৈশিষ্ট্য লীলায় প্রবেশ করিতে হইবে। যাঁহারা ইহ জগৎকেই ভূমিকা করিয়া অতন্নিরসন করিতে ব্যস্ত থাকেন, তাঁহারা 'তৎ' পর্যন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারেন। 'তৎ-সৎ'—সেই বস্তু সত্তাবান্ এই পর্যন্ত বলেন; কিন্তু যাঁহারা ইহ জগতের প্রতিবিম্বিত মূল অবিকৃত বিশ্বস্বরূপ নিত্যধাম হইতে দর্শন করেন, তাঁহারা অদ্বয়জ্ঞান বস্তুকে 'সঃ' অর্থাৎ নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-লীলাময় সবিশেষ তত্ত্বরূপে দর্শন করেন—তাঁহাকে 'রসো বৈ সঃ' রূপে দর্শন করেন। তিনি অখিলরসামৃত-মূর্তি। যেমন, শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন,—

"অখিলরসামৃতমূর্তিঃ প্রসৃমর রুচি-রুদ্ধ তারকা-পালিঃ।
কলিতশ্যামা ললিতো রাধাপ্রেয়ান্ বিধুর্জয়তি॥"

কর্মি-জ্ঞানি-অন্যাভিলাষি-সম্প্রদায় বলিবে,—তোমরা লবণ তৈয়ার কর না কেন?—চরকা ঘুরাও না কেন? —লাঙ্গল চাষ কর না কেন? —কলেরা-রোগীর মেথরের কাজ কর না কেন?—মরা ফেল না কেন? —অর্থাৎ তাহারা কৃষ্ণসেবাকে তাহাদের কোন না কোন একটা ইন্দ্রিয়-তর্পণের কার্যে জুড়িয়া তাঁহাদের উপরে চড়িতে পারিলেই তাহাদের কার্য সিদ্ধি হইল মনে করিবে; কিন্তু আমরা তাহাদিগের অপেক্ষাও চতুর—কৃষ্ণভক্ত সয়তানের সয়তান; তাহাদিগকে আমরা কিছুতেই ঘাড়ে লইব না; এক গৌরসুন্দর, রাধা-গোবিন্দ ও তাঁহাদের জন ব্যতীত কেহই আমাদের ঘাড়ে চাপিতে পারিবে না। যে ঘাড়ে আমরা গৌরসুন্দরকে চড়াইয়াছি—যে স্কন্ধদ্বয়ে রাধাগোবিন্দকে ধারণ করিয়াছি এবং তাঁহাদের নিজজনকে বসাইয়াছি, সেখানে কিছুতেই ইতর লোককে আসিতে দিব না। আমরা শ্রীরূপের উপদেশামৃত অনুসরণ করিব—প্রতিকূল ত্যাগ করিয়া অনুকূল গ্রহণ করিব। অনুকূলমাত্র গ্রহণ করিয়াই আমরা ভক্তি স্তব্ধ করিব না, আমরা পতিত হইব না—মৃগীরোগীর ন্যায় মাঝে মাঝে মূর্চ্ছাগ্রস্ত হইব না—আছাড় খাইব না—আমরা পরমোৎসাহভরে কৃষ্ণ-নাম-চরিত অনুশীলন করিব—মথুরা ও ব্রজে বাস করিব—শ্রীরূপের আনুগত্য করিতে করিতে কৃষ্ণকীর্তন করিব, তাহা হইলেই আমাদের স্মরণ হইবে—আমরা রাধাকুণ্ডতটে, নিরন্তর স্বসেব্য কুঞ্জে থাকিয়া আশ্রয়ানুগত্যে বাহে নিরন্তর নামাশ্রয়ে বার্ষভানবীদয়িতের অষ্টকালীয় সেবায় পরিচর্যা করিতে করিতে আমাদের সকল আশার পরাকাষ্ঠা লাভ করিব। ইহা ব্যতীত আমাদের অন্য কোন অভিলাষ নাই—ইহা ব্যতীত অতিমুক্তের

আর কিছু অভিলাষ থাকিতে পারে, ইহাও আমাদের ধারণায় নাই।

শ্রীগুরু, শ্রীনাম, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীরাধাগোবিন্দ ও শ্রীগৌরসুন্দর—সকলেই অভিন্ন তত্ত্ব। আমরা কৃষ্ণেতর পঞ্চোপাসনা করিয়া অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী হইব না। আমরা কৃষ্ণের পঞ্চোপাসনা করিব—আশ্রয়জাতীয় কৃষ্ণ শ্রীগুরুদেবের উপাসনা করিব—অপ্রাকৃত শব্দাবতার নাম-কৃষ্ণের উপাসনা করিব—ভাগবত কৃষ্ণের উপাসনা করিব,, রাধাকৃষ্ণের উপাসনা করিব—গৌরকৃষ্ণের উপাসনা করিব—আমরা কৃষ্ণকে পঞ্চরসে উপাসনা করিব এবং শ্রীরূপানুগ হইয়া পঞ্চরসের পরিপূর্ণ ভাণ্ডার মধুর রসে কৃষ্ণোপাসনা করিব। আমরা প্রতিকূল ত্যাগ-মাত্র করিয়াই ক্ষান্ত হইব না, অনুকূল গ্রহণ মাত্র করিয়া ভক্তি স্তম্ভন করিব না, আমরা কৃষ্ণানুশীলন করিব। শ্রীচৈতন্যদেব যে অনর্পিতচর উন্নতোজ্জ্বল রস প্রদান করিয়া ঔদার্যবিগ্রহরূপে আমাদের নিকট প্রকাশিত হইয়াছেন, আমরা সেই ঔদার্য-সিন্ধুতে অবগাহন করিব—উন্নতোজ্জ্বল রসের অধিকারী হইব, আমরা শ্রীস্বরূপ দামোদরের আনুগত্য করিতে করিতে বলিব—

> হেলোদ্ধুলিত-খেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া
> শাম্যচ্ছাস্ত্র-বিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
> শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া স-মদয়া মাধুর্যমর্যাদয়া
> শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে, তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া॥

ব্রহ্মসংহিতায় পঞ্চোপাস্য-তত্ত্ব

ব্রহ্মসংহিতায় এক একটি উপমাদ্বারা পঞ্চোপাস্য-তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে ; যেমন, শম্ভুতা বা রুদ্রত্ব বুঝাইতে গিয়া দুগ্ধের বিকৃতি দধির

উদাহরণ প্রদান করিয়াছেন ; গোবিন্দ—দুগ্ধস্থানীয়, রুদ্র—দধি স্থানীয় ; দধি কিছু দুগ্ধ নয়, দুগ্ধ কিছু দধি নয়, উভয়ের সঙ্গে একাকার হয় না, তথাপি দধি কারণরূপ দুগ্ধ হইতে পৃথক তত্ত্ব নহে—শম্ভু কৃষ্ণ হইতে পৃথক আর একটি ঈশ্বর নহেন, শম্ভুর ঈশ্বরতা গোবিন্দের ঈশ্বরতার অধীন। দুর্গা বা শক্তিতত্ত্ব বুঝাইতে যাইয়া ব্রহ্মসংহিতা আর একটি উপমা দিয়াছেন ; যেমন—বিম্ব ও প্রতিবিম্ব—কায়া ও ছায়া। স্বরূপশক্তি—কায়া স্বরূপিণী, আর বিরূপশক্তি—ছায়াস্বরূপিণী। দুর্গা সেই চিচ্ছক্তির ছায়াস্বরূপা প্রাপঞ্চিক জগৎ দুর্গের বা সংসার-দুর্গের রক্ষয়িত্রী। এই জড় জগৎ বিম্বরূপ চিজ্জগতের হেয়, অসম্পূর্ণ, বিকৃত প্রতিবিম্ব। আবার যেমন—গোবিন্দ ও ব্রহ্মার স্বরূপ বুঝাইতে গিয়া সূর্য ও সূর্যকান্তমণির উপমা দিয়াছেন। কৃষ্ণ—সূর্যসম, সূর্য যেমন নিজ তেজঃ সূর্যকান্তাদি মণিসমূহে কিয়ৎ পরিমাণে বিকীর্ণ করিলে অন্যবস্তু সমূহ দগ্ধ হয়, সেই রকম কৃষ্ণের শক্তিতেই রজোগুণাবতার ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন। ব্রহ্মার নিজের কোন স্বতন্ত্র সামর্থ নাই।”

“বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী তত্রাপি রাসোৎসবাদ্
বৃন্দারণ্যমুদারপাণিরমণাত্তত্রাপি গোবর্ধনঃ।
রাধাকুণ্ডমিহাপি গোকুলপতেঃ প্রেমামৃতাপ্লাবনাৎ
কুর্যাদস্য বিরাজতো গিরিতটে সেবাং বিবেকী ন কঃ॥”

[উপরি উক্ত শ্লোকটি উচ্চারণ মুখে শ্রীল প্রভুপাদ বলিতে লাগিলেন—]

“বৈকুণ্ঠ নির্বিশেষ লোকের উত্তর লোক। সেইটি ভগবানের সবিশেষ লোক দেবীধামে, বিরজায় ও ব্রহ্মলোকে ভগবানের চিদ্‌বিলাস বা সবিশেষত্ব আক্রমণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। দেবীধামস্থ মহামায়ার কারাগারে নিক্ষিপ্ত বহির্মুখ লোকসকল আপনাদিগকেই বিলাসী

অভিমান করে। 'আমরাই জগৎ ভোগ করিব, আমাদেরই চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয় সমূহ থাকিবে, আমরাই বিলাসী'—এই রকম বিচারে একমাত্র অদ্বিতীয় বিলাসীর অনুকরণে চিদ্‌বিলাসকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা প্রদর্শিত হইয়াছে। অচিদ্‌বিলাসীগণ অদ্বিতীয় চিদ্‌বিলাসীর আনুকরণিক ক্ষুদ্র প্রতিযোগী হইয়া স্ব স্ব দুর্দশা বরণ করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে বিলাস করিতে পারিতেছে না, বিলাসের চেষ্টা দেখাইতে গিয়া বদ্ধ হইয়া যাইতেছে। দেবীধাম ব্যাপ্ত হইয়া যে জলধি 'বিরজা' নামে খ্যাত তাহাতে এই দেবীধামের মিশ্রসত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের অধিষ্ঠান না থাকিলেও অর্থাৎ তথায়, ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা হইলেও তা প্রারম্ভিক তটস্থ-ভাব-নির্গত। শাক্যসিংহাদির বিচার বা অচিন্মাত্রবাদ যে স্থানে পর্যবসিত হইতে পারে সেখানে বিলাসের কোন কথা নাই, কেবল স্থৈর্যভাব আছে মাত্র; সুতরাং বিরজাতেও চিদ্‌বিলাস আক্রান্ত। তৎপরে ব্রহ্মলোক বা নির্বিশেষধাম। এখানে অদ্বিতীয় বিলাসীর হাত-পা-নাক-কাণগুলি কাটিয়া ফেলিবার অবৈধ চেষ্টা প্রদর্শিত হইয়াছে। যেমন মহাপ্রভু মায়াবাদী প্রকাশানন্দের কথা বলিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

"কাশীতে পড়ায় বেটা প্রকাশানন্দ।
সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড॥
বাখানয়ে বেদ মোর বিগ্রহ না মানে।

* * * *

সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ বসয়ে কাশীতে।
মোরে খণ্ড খণ্ড করে বেটা ভালমতে॥
পড়ায় বেদান্ত, মোর বিগ্রহ না মানে।

* * * *

সত্য সত্য করোঁ তোরে এই পরকাশ।
সত্য মুই, সত্য মোর দাস, তার দাস ॥”

নির্বিশেষবাদীর বিচার,—‘বিলাস’ কথাটি থাকিলেই তাহাতে অচিৎএর হেয়তা মিশ্রিত হইতেই হইবে! চিৎএরই একমাত্র বিলাস হইতে পারে। পরিপূর্ণ পরমোপাদেয় নিত্য অখণ্ড চিদবিলাসেরই অসম্পূর্ণ, হেয়, অনিত্য, খণ্ড প্রতিফলনই যে অচিদ্‌বিলাস—ইহা মায়াবাদীর মস্তিষ্কে ধারণার বিষয় হয় না। সুতরাং নির্বিশেষলোকে চিদ্‌বিলাস আক্রান্ত।

‘বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো’ ও ‘কর্মিভ্যঃ পরিতো’ শ্লোকদ্বয়ের ব্যাখ্যা

বৈকুণ্ঠ অর্থাৎ যেখানে যাবতীয় কুণ্ঠাধর্ম—কুণ্ঠ জগতের চিন্তাস্রোত বিগত হইয়াছে, সেই বৈকুণ্ঠ হইতে চিদ্‌বিলাসের কথা আরম্ভ হইল। এইজন্য শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ বৈকুণ্ঠ হইতে কথা আরম্ভ করিলেন অর্থাৎ বৈকুণ্ঠের পূর্বের যত কথা, সেগুলি পারমার্থিক রাজ্যের পথিকের গণনার মধ্যেই আসিতে পারে না; কারণ, বৈকুণ্ঠের পূর্বে ভগবত্তার স্বরূপই আরম্ভ হয় নাই, সেই সকল স্থানে অজ্ঞেয়তা, নাস্তিক্য, অহংগ্রহোপাসনার উদ্যোগ-ভূমিকারূপ কুণ্ঠাধর্ম বিরাজমান। দেবীধামের অচিদ্‌বিলাসী সুখদুঃখভোগ, বিরজার অচিন্মাত্রবাদী বোধিসত্ত্বা অঙ্গীকার-কারী যোগী, নির্বিশেষ ব্রহ্মলোকের চিন্মাত্রবাদ অঙ্গীকারকারী জ্ঞানী—কাহারও চিদ্‌বিলাসের উপলব্ধি না থাকায় চিচ্ছুদ্ধ ভাগবত মধ্যেই গণ্য হইতে পারেন না। ঐ সকলের কুণ্ঠাধর্ম যেইস্থানে বিগত হইয়া চিদ্‌বিলাসের কথা—চিন্ময় বাস্তবধর্মের কথা আরব্ধ হইল, সেই বৈকুণ্ঠ হইতে শ্রীরূপপাদ তাঁহার কথা আরম্ভ করিলেন। চিদ্‌বিলাসে অচিদ্‌-বিলাস-বিবর্ত-বুদ্ধি করিয়া বিবর্তবাদী ‘নিরস্ত-নিখিলদোষহনবধিকাতি-শয়াসংখ্যেয়কল্যাণগুণগণযুতঃ’ পুরুষোত্তমের ঐশ্বর্য স্বীকার করিতে

কুণ্ঠিত হইলে—কেবল কল্যাণগুণগণ পুরুষোত্তমের অঙ্গকান্তির ঐশ্বর্যে বিমোহিত-চক্ষু হইয়া পড়িলে সত্যানুসন্ধিৎসু পারমার্থিকের জন্য নির্বিশেষ লোকের উত্তর মহৈশ্বর্যলোক—যেখানে ভগবান্ বহু ভৃত্যাদি-দ্বারা পরিসেবিত হইয়া বিলাস করেন, রত্নময় সিংহাসনে অনন্ত ঐশ্বর্য সহকারে লক্ষ্মীর সঙ্গে বিহার করেন—যেখানে অসংখ্য বিলাসের উপকরণ—অসংখ্য ঐশ্বর্যের সমাবেশ রহিয়াছে, সেই বৈকুণ্ঠলোক আবিষ্কৃত হইল। সেই বৈকুণ্ঠলোকে বিলাসের কথা থাকিলেও মধুপুরীতে বিলাস আরও ব্যক্ত।

বৈকুণ্ঠ হইতে মথুরা শ্রেষ্ঠ—'জনিতঃ'—অজের জন্মনিবন্ধন, বৈকুণ্ঠে অজের জন্ম নাই। বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণ মাতা-পিতা হইতে জাত নহেন। জন্মের উপাদেয়ত্ব ও নিত্যত্ব, নিত্যজন্মের নিত্যত্ব নারায়ণ-ধাম বৈকুণ্ঠে ব্যক্ত নয়। যাঁহাদের চিদ্বিলাস আক্রমণ করিবার প্রবৃত্তি, তাঁহারা বলেন—যেখানে জন্ম সেখানেই হেয়তা। মাতাপিতা হইতে প্রাপ্ত দেহ—নশ্বর ও হেয়তাযুক্ত। নশ্বর মাতা-পিতার নশ্বর পুত্র। চিদ্-বিলাস-বিরোধীর এই আক্রমণের পূর্ণ বাস্তব প্রতিবাদ সম্পূর্ণভাবে বৈকুণ্ঠে প্রদত্ত হয় নাই। কেন না সেখানে অজের জন্মকথা পরিব্যক্ত হয় নাই, কিন্তু অজের কিরূপে জন্ম হইতে পারে; যুগপৎ বিরুদ্ধ-ব্যাপার চিদ্বিলাসরাজ্যে কিরূপে অতি সুন্দরভাবে সমন্বিত হইয়া চিদ্বিলাসের সৌন্দর্য প্রকাশ করিতে পারে, তাহা মথুরায় প্রদর্শিত হইয়াছে, কাজেই বৈকুণ্ঠ হইতে মধুপুরী শ্রেষ্ঠা।

মধুপুরীতে বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা চিদ্বিলাস সৌন্দর্য অধিকতর ব্যক্ত হইলেও বৃন্দারণ্যে তদপেক্ষা অধিকভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। মথুরায় রাসোৎসব হয় না। তথায় বসুদেব দেবকীনন্দনের ঐশ্বর্যময় বাৎসল্যরস প্রকাশিত থাকিলেও নন্দনন্দনের মধুর রতি মহোৎসব মথুরায় প্রকাশিত

হয় নাই। গোপীজনবল্লভ নন্দনন্দন কৃষ্ণের মধুর রসের মহামহোৎসব বৃন্দাবনীয় রাসক্রীড়ায় প্রকাশিত হইয়াছে।

কিন্তু এই রাসোৎসবে চন্দ্রাবলীর যূথ সমঞ্জসারতির নায়িকাগণও উপস্থিত থাকায় রাসোৎসবের সমন্বয়-বিচার কৃষ্ণের পরমমুখ্যা সর্বশ্রেষ্ঠা সেবিকার মনঃপূত হয় নাই। শ্রীমতী রাধিকা বিচার করিয়াছিলেন,—'আমি কি কৃষ্ণকে সর্বাপেক্ষা অধিক সেবা করি না যে, আমার জন্য কৃষ্ণ সকল নায়িকাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না? যদি পারেন, তবে জানিব আমি কৃষ্ণসেবা করিতেছি।' এই বিচার করিয়া শ্রীরাধিকা রাসমণ্ডলীতে গোপীগণের সাধারণ প্রেমসুলভ মমতা-দর্শনে কৌটিল্য-বামতাহেতু রাসমণ্ডলী ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিলেন।

দুই দুই গোপীর মধ্যে রাসমণ্ডলে একমূর্তি কৃষ্ণ এবং শ্রীরাধিকার পার্শ্বে একমূর্তি কৃষ্ণ—এইরূপে প্রকাশিত হইয়াছিলেন। রাধিকা তাহাতে স্বীয় কুটিল প্রেমের বামতা প্রকাশ করিলেন—ক্রোধ ও মানভরে রাসস্থলী পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। কৃষ্ণের ইচ্ছা, রাধিকা রাসোৎসবের রস পুষ্টি করেন; কিন্তু রাধিকা চলিয়া গেলে শ্রীকৃষ্ণ মদনবাণে জর্জরিত হইয়া বিলাপ করিতে করিতে শ্রীমতীর অন্বেষণে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

'কংসারিরপি সংসারবাসনা-বদ্ধশৃঙ্খলাম্।
রাধামাদায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ॥
ইতস্ততস্তামনুসৃত্য রাধিকামনঙ্গবাণব্রণখিন্নমানসঃ।
কৃতানুতাপঃ স কলিন্দনন্দিনী তটান্ত-কুঞ্জে বিষসাদ মাধবঃ॥'

রাসমণ্ডলীতে দক্ষিণা ও বামার বিচার—সমঞ্জসা ও সমর্থা বিচারের সমন্বয় থাকায়, চন্দ্রাবলীর যূথ প্রবেশ করায় বৃন্দাবনীয় রাসমণ্ডলী অপেক্ষা গোবর্ধন-গিরিগুহা অধিকতর শ্রেষ্ঠ। কারণ, গোবর্ধন-গিরিগুহা

উদারপাণির রমণস্থান—ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বের নির্জন কেলিকলার কন্দর। রাসোৎসবে কেবল মাধুর্য-প্রকাশ, কিন্তু গোবর্ধনে মাধুর্যের অন্তর্গত ঔদার্য উদারপাণিরমণের দ্বারা প্রকাশিত। চন্দ্রাবলীর যূথস্বরূপ শ্রীরূপানুগবিরোধীদল শ্রীবার্ষভানবীর চরণসেবাকাঙ্ক্ষী—শ্রীরাধিকার যূথ-স্বরূপ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের প্রতিযোগীতায় বালগোপালের উপাসনা হইতে কিশোর গোপালের উপাসনা বা বৃন্দাবনে রাসোৎসব পর্যন্ত আসিবার চেষ্টা করিতে পারেন, আরও অধিকতর প্রতিযোগীতামূলে গোবর্ধনে আসিবার চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ উহাদিগকে গোবর্ধনে চতুর্ভুজ দেখান। তাঁহারা প্রকৃত শ্রীনন্দনন্দনের সেবা বা শ্রীবার্ষভানবীর আনুগত্য করিতে পারেন না; তাঁহারা বালগোপালের উপাসক সূত্রে গোকুল, প্রতিযোগীতামূলে কিশোর-গোপালের উপাসনা দেখাইতে যাইয়া বৃন্দাবন এবং বৃন্দাবন হইতে গোবর্ধন পর্যন্ত আগমন করিতে চাহেন; কিন্তু রাধাকুণ্ডে তাঁহাদের প্রবেশাধিকার নাই। রাধাকুণ্ড একমাত্র রাধিকা-যূথের দুর্গ। তাঁহারা প্রতীপজনকে কখনও সেই কুণ্ডের তীরে আসিতে দেন না; এখনও গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ রাধাকুণ্ডের তীরে অপর বিচারাবলম্বীকে আসিতে দেন না; কিন্তু কি দুর্ভাগ্য! ভাগ্যহীনের প্রাকৃত দর্শন অপ্রাকৃত শ্রীরাধাকুণ্ডের অধিষ্ঠান কলুষিত করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীরাধাকুণ্ডকে প্রাকৃত সহজিয়াগণের অধিকৃত মনে করে। ভাগ্যহীন প্রাকৃত সহজিয়াগণ রাধাকুণ্ডের তীরে বাস করিতে পারে না—অপ্রাকৃত রাধাকুণ্ডের জল স্পর্শ করিতে পারে না। রাধাকুণ্ড অপ্রাকৃত ভাব-জগতের শিখামণি-স্বরূপ। কেননা, সেই শ্রীরাধাকুণ্ড গোবর্ধন হইতেও শ্রেষ্ঠ; যেহেতু তাহা প্রেমামৃতের পূর্ণতম প্লাবণক্ষেত্র। শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু প্রেমের সংজ্ঞা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বলিয়াছেন,—

'সম্যঙ্ মসৃণিতস্বান্তো মমতাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে॥'

সেই প্রেমের পরিপূর্ণ প্লাবন—শ্রীরাধাকুণ্ড। সেই গোবর্ধনতটে বিরাজিত রাধাকুণ্ডের সেবা বিবেকিগণই করিয়া থাকেন অর্থাৎ যাঁহাদের বস্তু-বিচারে কোন্‌টি সর্বশ্রেষ্ঠ, সেব্যাধার-বিচারে কোন্‌টি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সেব্য—এই বিবেকোদয় হইয়াছে, তাঁহারাই রাধাকুণ্ডের সেবা করিবেন। রাধাকুণ্ডের তীরে বাস—রাধাকুণ্ডতটস্থিত কুঞ্জকুটিরে বাস অপেক্ষা রাধাকুণ্ডে অবগাহনের আরও অধিকতর বৈশিষ্ট্য আছে। শুধু তীরে বাস নয়—তীরস্থ কুঞ্জে বাস নয়, কুণ্ডে রাধিকার ভাব-বিশেষে অবগাহন করিয়া রাধাকান্তের সেবা আরও অনেক বেশী কথা। 'রাধিকার ভাবে অবগাহন' শব্দে আপনাকে মূলধনস্বরূপ আশ্রয়-বিগ্রহের অভিমান নয়—কারণ উহা অহংগ্রহোপাসনা; ললিতা-বিশাখা প্রভৃতির অভিমানও অহংগ্রহোপাসনা। রাধিকার ভাব-পোষণী অনুচরীর অভিমানে, ললিতার ভাব-পোষণী মঞ্জরীর পরিচারিকা অভিমানে অবগাহন। অভিসারিকা, বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা, কলহান্তরিতা, প্রোষিতভর্তৃকা, স্বাধীনভর্তৃকা—এই আট প্রকার নায়িকার অন্যতমার ভাবানুসরণে মুক্ত আত্মা তাঁহাদের পরিচর্যামূলে রাধাকুণ্ডে অবগাহন করিয়া কৃষ্ণ-সেবা করেন।

শ্রীধাম মায়াপুর প্রদর্শনীতে রাধাকুণ্ডের তীরে অবস্থানমাত্র দেখান হইয়াছে। রাধাকুণ্ডে রাধিকার ভাবে অবগাহন করিয়া কৃষ্ণসেবার কথা কিছু বলা হয় নাই। শ্রীরামানন্দ-সংবাদে যখন রামানন্দ রায় 'ইহা বই বুদ্ধি গতি নাহি আর' বলিয়া মহাপ্রভুকে প্রেম-বিলাস-বিবর্তের কথা বলিতে উদ্যত হইলেন, তখন মহাপ্রভু নিজ হস্তদ্বারা রামানন্দ রায়ের মুখ চাপিয়া ধরিলেন। 'আত্মার চরম বিকাশের

কথা ইহার পরে আর জগতে প্রকাশিত হইতে পারে না'—এই জন্য মহাপ্রভু রামানন্দ রায়ের মুখ আচ্ছাদন করিলেন।

'বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী' শ্লোকে আধার বা স্থানের উত্তরোত্তর উৎকর্ষ বিচারিত হইয়াছে ; তৎপরে 'কর্মিভ্যঃ পরিতঃ' শ্লোকে সেবকপাত্রসমূহের উত্তরোত্তর উৎকর্ষের বিচার হইয়াছে। অজ্ঞেয়, সগুণ, নির্গুণ, ক্লীব, পুরুষ, মিথুন, স্বকীয়, পারকীয় প্রভৃতি বিচারে সেব্য-পাত্রের উত্তরোত্তর উৎকর্ষ-বিচার প্রদর্শিত হইয়াছে। জ্ঞেয়ের অজ্ঞেয়-বিচার, সংশয়-বিচার হইতে অর্থাৎ আত্মার সম্পূর্ণ masked (মুখোস পরা) অবস্থা হইতে ক্রমশঃ আরোহবাদে পরমার্থ-ভূমিকায় পারকীয়-বিচার পর্যন্ত আরোহণ করা যায়। যেমন, প্রথমে অজ্ঞেয়তার কোষ ছিন্ন করিয়া ত্রিগুণের কোষ, অচিৎসগুণের কোষ ছিন্ন করিয়া নির্গুণ-বিচারের কোষ, নির্গুণ-কোষ-বিচার ছিন্ন করিয়া ক্লীবব্রহ্ম-বিচারের কোষ, তাহা ছিন্ন করিয়া পুরুষ-বিচার বা চতুর্ব্যূহাত্মক বা বাসুদেব-বিচারের কোষ, তাহাও অতিক্রম করিয়া মিথুন বিচারের কোষ, তাহাও অতিক্রম করিয়া স্বকীয় বিলাসের কোষ এবং তাহাও অতিক্রম করিয়া পারকীয় বিচারের কোষ। Immanent * (প্রকৃতিতে ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত) হইতে transcendent (প্রকৃতির অতীত বা অপ্রাকৃত) এর বিচার অথবা অবরোহ-বিচারে অপ্রাকৃত হইতে অন্তর্যামিত্ব-বিচারে যেমন নারিকেলের হরিৎ ত্বগাবরণের অভ্যন্তরে ছোবড়া, তদভ্যন্তরে কঠিন কোষ্ঠ, তদভ্যন্তরে আর একটি সূক্ষ্ম আবরণ, তদভ্যন্তরে নারিকেল-শস্য এবং জল—রাধাকুণ্ডে অবগাহন। যদি রাধাকুণ্ড-তীরের কোন

* Transcendent শব্দের বিপরীত অর্থবোধক।

এজেণ্ট জগতে আসিয়া আমার নিকট শ্রৌতপরম্পরায় সেই দেশের কথা বলেন এবং আমি কোষসমূহ ছিন্ন করিতে করিতে বৈকুণ্ঠ-দূতের কৃপারজ্জু ধরিয়া আরোহণ করিতে থাকি, তবেই ঐ রকম আরোহবাদ স্বীকৃত হইতে পারে। নতুবা নিজের চেষ্টায় ঐ রকম ছিন্ন করিতে করিতে আরোহণ করিবার চেষ্টা করিলে প্রাকৃত সহজিয়া বা এঁচড়ে পাকা হইয়া যাইতে হইবে। অথবা আর এক বিচারে আমরা জানিতে পারি যে, প্রথমে পূর্ণতমা সেবার বিচারে পারকীয় বিচার এবং সেই সেবার বিচার ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া স্বকীয়-বিচার, মিথুন-বিচার, পুরুষ-বিচার, ক্লীবব্রহ্ম-বিচার, নির্গুণ-বিচার, সগুণ-বিচার, অজ্ঞেয় বা সংশয়-বিচার। এখানে transcendent হইতে Phenomena (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রাকৃত ব্যাপার সমূহ) এবং তদভ্যন্তরে Immanent। ক্লীবব্রহ্ম বা নির্বিশেষ বিচার অসম্যক্, পুরুষ-বিচারও আংশিক। পুরুষমাত্রবাদে ক্লীবত্ব নিরস্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু স্ত্রীভাবের অভাব থাকায় অর্দ্ধপরিচয় মাত্র—পূর্ণ নহে। সুতরাং কেবল-বাসুদেবের বিচার—আংশিক বিচার, কেবল-বাসুদেবের বিচার উন্নত হইয়া মিথুন-বিচারে পূর্ণতা দেখিতে পাওয়া যায়। মিথুন-সম্বন্ধিতে একপত্নীব্রতত্ব বা সীতারামের বিচারও পূর্ণতম বিচার নহে, উহা মধুর রতি নামে পরিচিত হইতে পারে না, তাহা দাস্যরসের বিচার মাত্র। যেহেতু সেখানে তটস্থাশক্তির যোগ্যতা নাই। অপরে প্রকাশ-বিগ্রহাবতার রাঘবকে সীতার ন্যায় সেবা করিতে পারে না, তাহার প্রমাণ দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিগণ যখন রাঘবপ্রকাশের কন্দর্প-বিনিন্দিত নব-দূর্বাদল-শ্যামকান্তি ভুজ দর্শন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা তাঁহাদের পুরুষশরীরে একপত্নীব্রতধর রামচন্দ্রকে স্বয়ং মধুর-রতিতে সেবা করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন এবং তজ্জন্যই বহুবল্লভ কৃষ্ণকান্তা গোপীজন্ম বাঞ্ছা করিয়াছিলেন। সীতার

অনুগত হইয়া যে রামচন্দ্রের সেবা, তাহাও দাস বা দাসীত্ব বিচারে সেবা। রুক্মিণীশের সেবায় স্বয়ংরূপার যে স্বকীয়তা, উহাও সর্বচিন্ময়াঙ্গ-দ্বারা কান্তের সেবা নহে। দেবী জানকীর—সাধ্বীর পতিসেবা মাত্র। তবে দেবী রুক্মিণীর সেবা প্রকাশ-সেবার পরিবর্তে স্বয়ংরূপের সেবা। একপত্নীব্রতধর রামচন্দ্র পরকান্তার মুখ দর্শন করেন না, কিন্তু কৃষ্ণ স্বকীয়-বিচারেও কোটিকান্তা-বিলাসী ; দ্বারকায় স্বকীয়-বিচারে মর্যাদা-নীতি বর্তমান, কিন্তু স্বয়ংরূপের স্বেচ্ছাচারিতার নিকট তাহাও বিপর্যস্ত হইয়াছে। ডক্টর ভাণ্ডারকার জড়দর্শনে রাম-সীতার উপাসনা পর্যন্ত বুঝিয়া থাকেন, ইহার পরের কথা আর বুঝিতে পারেন না। স্বকীয় মিথুনে সেবার পরিপূর্ণতা প্রকাশিত হয় নাই, তাহাতে বহু আশ্রয়ের বিচার থাকিলেও এবং তাহা ঐশ্বর্যমিশ্র মধুর হইলেও উহাও একপ্রকার দাস্যরসেরই অন্যতম। রুক্মিণী, সত্যভামা প্রভৃতি স্বকীয়া মহিষীবৃন্দের অনুচরীবৃন্দ স্বকীয়ানুগত্যে স্বদরিদ্রতামুখে কৃষ্ণের ঐশ্বর্য সেবা করিতে পারেন। কেবল স্বকীয়-বিচারে ঐশ্বর্যভাব প্রকাশিত থাকায় কান্তরতির মধুরতা ও আগ্রহ পরিস্ফুট হইতে পারে না। ঐশ্বর্য-প্রবল স্বকীয়রসে রাসরসোৎসবের মাধুর্য প্রকাশিত হয় নাই। যে স্থানে আত্মার অনুরাগ আর্যধর্মের অন্তঃসীমা পর্যন্ত উল্লঙ্ঘন করিয়াছে, সেই অনুরাগ পারকীয়বিচার-ব্যতীত স্বকীয় বিলাসে নাই। পারকীয় মিথুনেই চিদ্‌বিলাস-সেবার পরিপূর্ণতা। পারকীয়-মিথুনের মাধুর্য-পরিমলে স্বকীয় শ্রীগণের শ্রীও বিশ্রী হইয়াছে।

মিথুনবাদে ত্রিবিধ মিথুন স্বীকৃত হইয়াছে; পুরুষবাদে তাহা নাই। প্রাঙ্‌মিথুন, মিথুন ও পরমিথুন। যেমন—দেবকী-বসুদেব, রুক্মিণী-বাসুদেব ও রতি-প্রদ্যুম্ন। পরকীয়-মিথুনে 'ইদং' এর বিচারটুকু মাত্র নয়, পূর্ণতম 'সঃ' এর বিচার—'রসো বৈ সঃ'—পূর্ণতম সবিশেষ—স্বেচ্ছাচারী

সবিশেষ—স্বরাট্ সবিশেষ—সুন্দরতম সবিশেষ। 'মিথুন' বলিতে এখানে প্রাকৃত স্ত্রীপুরুষ বা প্রাকৃত দাম্পত্য নহে। দেহ বা মনের বিচারের অন্তর্গত মিথুন বা প্রাকৃত সহজিয়াগণের জঘন্য ভণ্ড পারকীয়বাদের প্রাপঞ্চিক হেয় লাম্পট্য আমাদের আলোচ্য নহে, পরিচ্ছিন্ন অনুপাদেয় প্রাকৃত ভাবহীন অপরিচ্ছিন্ন পরমোপাদেয় অপ্রাকৃত ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বের পারকীয় কথাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবের আনুকরণিক প্রতিযোগীতামূলে :নিম্বার্কদলের কেহ কেহ—'অঙ্গে তু বামে বৃষভানুজাং মুদা বিরাজমানমনুরূপ সৌভগাম্। সখীসহস্রৈঃ পরিসেবিতাং সদা স্মরেম দেবীং সকলেষ্টকামদাম্॥" —প্রভৃতি শ্লোক রচনা করিয়া যুগলভজনের বিজ্ঞাপন প্রচার করিলেও তাঁহারা প্রকারান্তরে শ্রীরুক্মিণীশ স্বকীয় মিথুন পর্যন্তই ধারণা করিতে পারেন ; রাধাকুণ্ডের তীরে তাঁহাদের প্রবেশাধিকার নাই। রাধাকুণ্ড-স্নান শ্রীরূপের ভাণ্ডারের নিজস্ব সম্পত্তি—স্বরূপের ভাণ্ডারের গুহ্য সম্পুট ; স্বরূপ-রূপানুগগণই উহা প্রাপ্ত হন, অন্যে নহে।

এই সকল কথা গৌড়ীয়মঠের পারমার্থিক প্রদর্শনীতে ভাল করিয়া প্রদর্শিত হওয়া আবশ্যক। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবব্রুব সমাজ-দেহে প্রাকৃত-সহজিয়া সমাজদেহে যে সকল বদ্‌রক্ত জন্মিয়াছে, তাহা অস্ত্রোপচারে বাহির করিয়া দিয়া তাহার প্রকৃত স্বাস্থ্য আনয়ন করা আবশ্যক। তাহা হইলে তাহারা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের অমন্দোদয় দয়া-বিচারের আব-হাওয়ায় থাকিতে পারিবে। ঐ সকল পারমার্থিক প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হইতে পারিলে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের প্রচারের বৈশিষ্ট্য সকলের হৃদয়ঙ্গম হইবে। কৃষ্ণ যতটা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন, ততটা প্রকাশিত হইবে—

"ক্বাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ক্ব কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ।"

সাধ্য ও সাধন তত্ত্ব

শ্রীনন্দনন্দনের সেবাই সকল সাধ্য-সাধন-শ্রেষ্ঠ
পারকীয়বাদেই কৃষ্ণপ্রীতি স্বাভাবিকী

["কীর্তনই আমার একমাত্র কৃত্য" বলিয়া প্রভুপাদ বলিলেন,—] "যে গানটী শুনিলেন, 'ভজহুঁরে মন, শ্রীনন্দনন্দন, অভয়চরণারবিন্দরে'— সেই শ্রীনন্দনন্দনের সেবাই—সকল সাধনসাধ্য শ্রেষ্ঠ"। [কথাপ্রসঙ্গে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নানাপ্রকার দার্শনিক মতবাদ এবং অন্যান্য সৎ-সম্প্রদায়ের উপাস্য-তত্ত্বের সম্বন্ধে ধারণা কিরূপে মহাপ্রভুর প্রচারে নির্দোষ ও পূর্ণতা লাভ করিয়াছে; তাহা দেখাইলেন। শ্রীনন্দনন্দনের উপাসনাই উপাসনার পরাকাষ্ঠা। প্রভুপাদ আরও বলিলেন,—] "পরমেশ্বরের ঐশ্বর্য যদি তাহা হইতে সরাইয়া লওয়া যায়, তবে স্বকীয়বাদ ন্যূনাধিক বিপন্ন হয়। পরমেশ্বরের যে ঐশ্বর্যে মুগ্ধা হইয়া রুক্মিণীদেবী দ্বারকেশকে পতিত্বে বরণ করেন, দ্বারকেশ যদি সেই ঐশ্বর্য সঙ্গোপন করেন, তাহা হইলে রুক্মিণীদেবীর পরমেশ্বরীত্বের সঙ্গোপনে ঐশ্বর্যময় দাম্পত্য শ্লথ হয়। গোপললনাগণ নন্দনন্দনের ঐশ্বর্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে কান্তরূপে বরণ করেন নাই—কৃষ্ণের কোনও ঐশ্বর্য ব্রজবামাগণকে আকৃষ্ট করে নাই। কৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদিগের প্রীতি স্বাভাবিকী। কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়পরিতর্পণ-কামনাই তাঁহাদিগের একমাত্র অভিলাষ এবং সেই অহৈতুকী কামনাই কৃষ্ণকে কান্তরূপে বরণ করিয়াছে। [পরে প্রভুপাদ বলিলেন,—] "এই সকল কথার গ্রাহকের পরিমাণ খুবই কম। জীবের সৌভাগ্যের তারতম্যের উপর এই কথা গ্রহণ করিবার যোগ্যতা হয়। কেহ বা এক জন্মে, কেহ বা দুই জন্মে, কেহ বা শত শত জন্মে, আবার কেহ বা

সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ জন্ম পরেও এই কথায় রুচি লাভ করে না ; কিন্তু এই প্রকৃত বাস্তব সত্যের প্রতিবাদ করিবার কোন যুক্তি, তর্ক বা মতবাদ জগতে কোনও কালে থাকা একেবারেই উচিত নয় ।"

[প্রশ্ন হইল—বহুদিন ধরিয়া গৃহস্থালীতে মজিয়া থাকায় যাঁহাদের চিত্তবৃত্তি অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, কোন্ সহজ উপায়ে তাঁহাদের চিত্ত স্থির হয় ?]

চিত্তচাঞ্চল্য দূর করিবার উপায়

[প্রভুপাদ বলিলেন,—] "সর্বে মনোনিগ্রহ-লক্ষণান্তাঃ—সকল সাধন-ভজনের উদ্দেশ্য মনোধর্ম বা মনের চাঞ্চল্য নিরাস করিয়া আত্মধর্মে প্রতিষ্ঠিত হওয়া । একমাত্র কৃষ্ণকীর্তনের দ্বারাই মন নিগৃহীত হইতে পারে । কর্ম, জ্ঞান ও যোগাদি পন্থায় মনের সাময়িক স্তব্ধভাব পুনরায় প্রতিক্রিয়া আনিয়া মনকে অধিকতর চাঞ্চল্য-সাগরে পাতিত করে । এই বিষয়ে দীর্ঘকাল হিরণ্য ও কশিপুর সেবারত হিরণ্যকশিপুর মূর্তপ্রতীক অসুরবর্গের প্রতি প্রহ্লাদ মহারাজের উপদেশই মনের চাঞ্চল্য নিরাস করিবার একমাত্র উপায় ও উপেয় ।

*　　　*　　　*　　　*

ভগবৎসেবামুখে দুঃসঙ্গ-ত্যাগ ইষ্টলাভের উপায়

[প্রভুপাদ বলিলেন,] "দুঃসঙ্গ ত্যাগ—ভাগবতের বিচার । উহা সাধকের ইষ্ট প্রাপ্তির উপায় । তবে আমরা যে ক্ষেত্রে পরমেশ্বরকে বাদ দিয়া—তাঁহার সেবা বাদ দিয়া কেবলমাত্র আমাদের জড় ইন্দ্রিয়ের সাময়িক সুখের জন্য অপর ভোগি-সম্প্রদায়ের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত

করি, সে ক্ষেত্রে আমাদিগকে অধিকতর ঈশ্বর-বিমুখ করাইয়া জন্ম-জন্মান্তর নিরীশ্বরভোগী হইবার সুযোগ প্রদান করে।”

নামাশ্রয়েই গৌরকৃপালাভ

“বৈকুণ্ঠ-ভগবানের সেবাই জীবের নিত্যধর্ম। জগতে অবৈকুণ্ঠ রাজ্যে যে সকল বস্তুর পশ্চাতে জীবসকল ধাবিত হয়, সে সকলই জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গাধীন। অসতে-অনিত্যে ‘সত্য-নিত্য’ বুদ্ধি করিয়া সুখের বিনিময়ে দুঃখই মানবের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে ; কিন্তু মানব যখন বুদ্ধিমান হয়, দেখিয়া শুনিয়া চতুর হয়, তখন সাধুসঙ্গে সেই অশোক, অভয়, অমৃতাধার ভগবানের পাদপদ্ম-সেবায় জীবন উৎসর্গ করে। শ্রীরাধা-গোবিন্দ-সেবাই জীবের সাধ্য-পরাকাষ্ঠা। শ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিত তনু শ্রীগৌরসুন্দর আপামরকে সেই সেবাশ্রী প্রদানের জন্য প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীনামাশ্রয়দ্বারা সেই কৃপা লব্ধ হয়, এতদ্ব্যতীত অন্য উপায় নাই।

ভক্তিধর্ম গৃহে গৃহে—দেশে দেশে, পৃথিবীর সর্বত্রই প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। তবে আমরা যে ভোগ ও ত্যাগের ধারণা রাখি, শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু সেই রকম ‘ভোগ ও ত্যাগ’ উভয়কেই বর্জন করিতে বলিয়াছেন। চক্ষু, কর্ণ, নাসাদির দ্বারে জড় রূপ, শব্দ ও গন্ধাদির গ্রহণই ভোগ। এই ভোগে আপাততঃ ক্ষণিক সুখ থাকিলেও পশ্চাতে দুঃখের পরিমাণ সুখ অপেক্ষা অনেক বেশী। এই কারণে ভোগ অপেক্ষা ত্যাগেরই আদর।”

ভোগ ও ত্যাগের বিচার

“ত্যাগ বা বিরাগ বড়ই ভাল। কিন্তু যে বিরাগে—ত্যাগে—‘নেতি’ ‘নেতি’ করিয়া ত্যাগ করিতে করিতে শেষে পরমেশ্বর পর্যন্ত পরিত্যক্ত

হইয়াছেন, সে ত্যাগ ঐ ভোগেরই আর একটা দিক। জগৎকে যাঁহারা 'মিথ্যা' বলেন, কাকবিষ্ঠার ন্যায় জ্ঞান করেন, তাঁহাদের বিচার ভ্রান্তি-পরিপূর্ণ। কেননা, তাহাতে সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের সৃষ্ট্যাদি শক্তির অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়। বিশ্ব—সত্য, বিশ্বের যাবতীয় বস্তুই নশ্বর ধর্মযুক্ত—এই বিচারই বেদান্তবিদ্‌গণের একমাত্র সুষ্ঠু বিচার।

ভোগ যেমন বস্তুতে ভগবানের আন্তর অবস্থান দেখিতে দেয় না, ভোগীকে ভোগ দিয়া ভোক্তা সাজায়, ত্যাগও সেই প্রকার সকল বস্তুই যে ভগবানের সেবোপকরণ, তাহা বুঝিতে অবসর দেয় না; ভগবৎসম্বন্ধী বস্তুর প্রতি অবজ্ঞা আনয়ন করে। শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীবারাণসীক্ষেত্রে শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুকে শিক্ষাদানকালে 'ভোগ ও ত্যাগ' সম্বন্ধীয় তত্ত্ব ও সুকৌশলপূর্ণ দুইটি শ্লোক বলিয়াছেন;—তাহাই শ্রীল রূপগোস্বামি-প্রভু লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥ ১ ॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধি-বস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥ ২ ॥

বিষয়সমূহই বিশ্বের বৈভব। সেই রূপাদি বিষয়সমূহ আবার চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের গতি। সুতরাং ইন্দ্রিয়বর্গ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সকল গ্রহণে কখনই পরাঙ্মুখ হইবে না বা বিরতি লাভ করিবে না। যদিও মাঝে মাঝে বাহ্য ইন্দ্রিয়কুল সংযত করিয়া বিরাগবিশিষ্ট জনগণ বাহিরে বৈরাগী সাজিয়া থাকেন, তথাপি ইন্দ্রিয়বর্গের রাজা মন, তাহার মানস ইন্দ্রিয় দ্বারে সকলের অজ্ঞাতসারে বিষয়ভোগেই বিভোর হইয়া

থাকে। আবার যদি কেহ বৈরাগ্য লাভের জন্য বিষয়গ্রহণের দ্বার-স্বরূপ ইন্দ্রিয়সমূহের বিনাশ সাধনে নিযুক্ত হন, তাহা হইলে বৈরাগ্য লাভের পূর্বেই ইন্দ্রিয়বিয়োগ-দুঃখ ঐ বৈরাগীকে ব্যথিত করে। সুতরাং শ্রীচৈতন্যদেবের বিচারে বিষয়ীর ও বিষয়ের স্বরূপ-বিষয়ক বিজ্ঞানেরই আদর দেখা যায়।

সংক্ষেপে সম্বন্ধজ্ঞান

আমরা দেহী। আমরা দেহ নহি,—দেহ আমাদের সম্পত্তি। সেই দেহ দুই প্রকার,—স্থূল ও সূক্ষ্ম। ক্ষিত্যাদি-নির্মিত বাহিরের দেহ—স্থূল, আর মনঃ-বুদ্ধি-অহঙ্কার-নির্মিত ভিতরের বাসনাময় দেহ—সূক্ষ্ম। দেহী বা যাহার দেহ, সেই আত্মা, ঐ দুই প্রকার আবরণের অভ্যন্তরে অবস্থিত। সেই আত্মা জড় দেহ বা সূক্ষ্ম দেহের ন্যায় জড় বস্তু নহে—চৈতন্য বস্তু। আমি পরমচৈতন্যপূর্ণ বিভু-চৈতন্য ভগবানের অনুমিত অংশমাত্র। সেই অনুচৈতন্য আত্মা যখন নিজের কথা—স্বরূপের কথা স্মরণ রাখেন, তখন তিনি এই জড় জগতের জড় বিষয়ভোগে প্রমত্ত হন না। বরং বস্তুর অভ্যন্তরে—বিষয়ের অন্তরে স্বীয় প্রভুকে বিরাজিত দেখিয়া কৃষ্ণকার্ষ্ণময় দর্শনে মহাভাগবতের লীলা করেন। আর যখন দুর্ভাগ্যক্রমে—দুর্দৈব-বশতঃ স্বরূপের রূপে আকৃষ্ট না হইয়া বিরূপকে—বাহ্য দেহদ্বয়কে 'আমি' বলিয়া অভিমান করেন, তখনই সেই বদ্ধ আত্মা ইন্দ্রিয়-সমাবিষ্ট জড় দেহদ্বারে জড় বিষয়ভোগে ভোগী হইয়া পড়েন।

এজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রয়াগে দশাশ্বমেধ ঘাটে শ্রীরূপ প্রভুকে শিক্ষা দিবার পূর্বেই বারাণসীর দশাশ্বমেধ ঘাটে শ্রীল সনাতন প্রভুকে সম্বন্ধ-জ্ঞানের বিজ্ঞান বলিয়াছেন। কাশী তখন জ্ঞানকাণ্ডীয়—শুষ্ক জ্ঞানালোচনাকারিগণের বসতিস্থল। সকলেই নিত্য, শুদ্ধ, সনাতন

আত্মার ধ্বংস-চেষ্টায় ব্রহ্মৈক্যবাদ-বিতণ্ডায় বিব্রত। এ হেন বিপদ—মহাবিপদের হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে পরমোদার গৌরসুন্দর প্রথমে 'আমি'র বিচার—আত্মার বিচার—জীব-স্বরূপের সঙ্গে সঙ্গে পরস্বরূপ বা ভগবৎস্বরূপের বিচার উত্থাপন করিলেন। এই বিচারে বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারিলে সকলের সকল বিচার কুবিচারে পরিণত হইয়া সর্বানর্থ—অনর্থ হইতেও অনর্থের উৎপত্তি হয়।

সংক্ষেপে অভিধেয় তত্ত্ব

সম্বন্ধ-বিচার বলার পর মহাপ্রভু আমাদিগকে অভিধেয়তত্ত্ব শ্রীরূপ-শিক্ষা প্রদান করিলেন। আমরা চেতন, কর্মই আমাদের স্বরূপের চৈতন্য-বিষয়ক চৈতন্য দান করে। কিন্তু যে কর্ম বর্তমানে আমাদিগকে চৈতন্য আত্মার জ্ঞান লোপ করাইয়া চেতন রাজ্যের বিপরীত অজ্ঞানে দিকে লইয়া যাইতেছে, তাহারই দিক পরিবর্তন করিয়া—উদ্দেশ্য স্থির করিয়া বলিলেন—

'লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে।
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্যা ভক্তিমিচ্ছতা॥'

জড় ইন্দ্রিয়ের সুখের আশায় আশান্বিত হইয়া আমরা কার্য করি; কিন্তু আমাদের স্বরূপের—আত্মার প্রভু সেই শ্রীভগবানের সেবার জন্য যদি আমাদিগের লৌকিকী, বৈদিকী এবং সকল ক্রিয়াই অনুষ্ঠিত হয়, তবে সেই কর্ম জড় সুখ-দুঃখ-ভোগদায়ক না হইয়া অচ্যুতের সেবা অনুষ্ঠান বিধায় অচ্যুতে ভক্তি প্রদান করে।

সুতরাং কৃষ্ণভগবানের সেবার উদ্দেশ্যে জীবনধারণকালে যাবতীয় বস্তু ভগবানের সেবোপকরণ-জ্ঞানে ভজনের অনুকূলে বিষয়-গ্রহণই 'বিরাগ'। সেই বিরাগ-বিশিষ্ট বস্তু পরম পুরুষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে রাগ

বা রতি উৎপন্ন করাইয়া ভোগ্যজ্ঞানে বিষয়ভোগে বিগত রাগ বৈরাগ্য আনয়ন করে।

যাঁহারা হরিসেবানুকূল বস্তু বা বিষয়সমূহের প্রাপঞ্চিকতায় বিরক্ত হইয়া নিজ নিত্য হরিসেবক আত্মার হরিদাস্যের প্রতিও বীতরাগ হন, স্বয়ং এবং অপরের দ্বারা সেব্যের সেবা সংহার করিবার প্রয়াস করেন, তাঁহারা আত্মবিনাশী ফল্গু বৈরাগী বা ত্যাগী।

ত্যাগ বা ভোগ আত্মার বৃত্তি নয়, সেবাই আত্মার নিত্যবৃত্তি। মুক্ত আত্মা বৈকুণ্ঠে নিজ সেব্যের সেবা-বিভোর, আর বদ্ধাত্মা বদ্ধাবস্থা হইতে শুদ্ধ বা মুক্তাবস্থায় যাইবার জন্য ভগবৎপ্রদত্ত ইন্দ্রিয় ও বিষয়গুলি ভোগানুকূলে গ্রহণ করেন না, ত্যাগানুকূলে ত্যাগও করেন না, কেবল সেবানুকূলে গ্রহণ ও প্রতিকূলে ত্যাগ করেন। তিনি শ্রীরূপানুগবর্য শ্রীগুরুদেবের দয়া উপলব্ধি করিয়া বলেন,—

'বংশীগানামৃতধাম, লাবণ্যামৃত-জন্মস্থান,
যে না দেখে সে চাঁদ বদন।
সে নয়নে কিবা কাজ, পড়ুক তার মুণ্ডে বাজ,
সে নয়ন রাখে কি কারণ?'

আর সাধনাবস্থায় সিদ্ধির অনুকূলে শ্রীগুরুদেবের কৃপা প্রার্থনা করিয়া বলেন—

'(কবে) দেখিব তোমার ধাম নয়ন ভরিয়া।'

ফল্গুত্যাগিগণ কামক্রোধাদি যে রিপুবর্গকে বিজয় করিবার জন্য লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া—অভ্যাস অনাহারাদির দ্বারা কঠোর পরিশ্রম করিয়া সময়ান্তরে ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বস্তুর সমাগমে প্রবল বেগে পরিত্যক্ত বিষয়ে প্রসক্ত হইয়া পড়েন, ভোগিগণ যে রিপুষট্‌কের হস্তে

লাঞ্ছিত, পদতাড়িত হইয়া দুঃখ—অতিদুঃখ-নিষ্পেষিত হয় এবং বিষয়ান্তর বা গত্যন্তর না পাইয়া উচ্ছিষ্ট—চর্বিত বস্তু পুনশ্চর্বনে নিযুক্ত হয়, শ্রীরূপ-শিক্ষায় সুশিক্ষিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের অনুগ্রহভাজন, ভোগ-ত্যাগে-উদাসীন ভক্তিযোগিগণ সেই ইন্দ্রিয়দ্বারা—হৃষীকের দ্বারা হৃষীকেশের সেবা-ফলে হৃদয়ে ভক্তিসাম্রাজ্য সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করেন। শ্রীগুরুবাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া তাহারা বলেন,—

"কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ মদ মাৎসর্য-দম্ভ সহ
স্থানে স্থানে নিযুক্ত করিব।
আনন্দ করি' হৃদয়, রিপু করি' পরাজয়,
অনায়াসে গোবিন্দ ভজিব॥
'কাম' কৃষ্ণ-কর্মার্পণে, 'ক্রোধ' ভক্তদ্বেষি-জনে,
'লোভ' সাধুসঙ্গে হরিকথা।
'মোহ' ইষ্ট লাভ বিনে, 'মদ' কৃষ্ণ-গুণ-গানে,
নিযুক্ত করিব যথা তথা॥
অন্যথা স্বতন্ত্র কাম, অনর্থাদি যার' ধাম,
ভক্তিপথে সদা দেয় ভঙ্গ।
কিবা বা করিতে পারে, কাম-ক্রোধ সাধকেরে,
যদি হয় সাধুজনার সঙ্গ॥
ক্রোধে বা না করে কিবা, ক্রোধত্যাগ সদা দিবা,
লোভ-মোহ এই ত কথন।
ছয় রিপু সদা হীন, করিব মনের অধীন
কৃষ্ণচন্দ্র করিয়া স্মরণ॥
আপনি পলাবে সব, শুনিয়া গোবিন্দ-রব,
সিংহরবে যেন করিগণ।

সকল বিপত্তি যাবে, মহানন্দ সুখ পাবে,
যার হয় একান্ত ভজন ॥”

প্রচারের জন্য সমস্ত বাধাবিপত্তি উপেক্ষণীয়

[শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন—]

“দেখুন, ভোগবার্তা প্রচারকের কোন বিপদ নাই, অসুবিধা নাই। কিন্তু ভগবানের সেবার কথা—আত্মার নিত্যবৃত্তির কথা—জীবের জীবন সর্বস্ব ভক্তির কথা প্রচার করিতে গেলে প্রতিপদে বিপদই লাভ হইবে—পদে পদে অসুবিধা আসিয়া নিরুৎসাহ করিবার চেষ্টা করিবে ; কিন্তু জানিতে হইবে যে সেই বিপদ—সেই অসুবিধা আমাদের প্রভুভক্তির প্রভুসেবা-বুদ্ধির পরিমাণ পরীক্ষা করিতে আসিয়াছে এবং আমাদিগকে উত্তরোত্তর সেবাপথে অগ্রসর হইবার সহায়তা করিতেছে। এই সময় নামাচার্য ঠাকুর হরিদাস ও ভক্তরাজ প্রহ্লাদের সেবা সহিষ্ণুতা-সুমেরুর আদর্শ আকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে হইবে। মানুষ মোহগ্রস্ত হইয়া অনিত্য বস্তু লাভ করিবার জন্য শত শত জন্ম বঞ্চিত হইতেছে। সহস্র সহস্র উদাহরণ দেখিয়াও মানুষ যদি এক ঘেয়ে ভাবে তুচ্ছ জিনিষের জন্য বাধা বিপত্তিতে বিহ্বল না হইয়া জীবন পর্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারে, তাহা হইলে কি বুদ্ধিমান জনগণ, আদি, মধ্য, অন্তে সত্য—ত্রিকাল সত্য—নিত্য সত্যের জন্য নিত্য জীবনের নিশ্চলা চেষ্টা নিযুক্ত করিতে পারিবেন না।

সহজে ভগবৎসেবা লাভের উপায়

[প্রশ্ন হইল—কি করিয়া সহজে ভগবানকে পাওয়া যায় ? তদুত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ বলিতে লাগিলেন,—]

ভগবানের সেবা করেন যাঁহারা—ভগবানের ভক্ত যাঁহারা, তাঁহাদের

সঙ্গে ভগবদ্ভক্তি লাভ হয়। ভক্তগণ ভগবানের সেবা সার করিয়াছেন। তাঁহারা ভগবানের নাম, ভগবানের রূপ, ভগবানের গুণ এবং ভগবানের লীলা-কথাকেই জীবন-সর্বস্ব করিয়া সর্বদা সেই সকলের আলোচনা করেন। সাধারণ মানুষের মধ্যে ভগবানের যে আলোচনা হয়, ভক্ত-মণ্ডলীতে যে আলোচনা, তার মধ্যে পার্থক্য ত আছেই; পরন্তু একেবারেই বিপরীত। সাধারণ্যে অনেকেই ঐহিক এবং পারলৌকিক সুখের জন্য ভগবানকে সুখ-দাতা জানিয়া ভজন করেন, আবার বেশী বুদ্ধিমান অর্থাৎ বাহিরে ত্যাগী, অন্তরে ভোগীশ্রেষ্ঠ সর্বভোক্তা ভগবানের সমান হইয়া তাঁহার সঙ্গে মিশিবার জন্য ভগবদুপসনার ভান করেন; আর মধ্যম লোকেরা অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি সিদ্ধির উদ্দেশ্যে উপাসনা করেন। ইহাতে উপাসনার অভিনয় থাকিলেও উপাস্য ভগবানের নিত্য-নাম-রূপাদি স্বীকৃত হয় নাই; তাঁহারা সর্বপ্রভু পরমেশ্বরকে কর্মাধীন জ্ঞান করেন। বিশেষতঃ এই শ্রেণীর উপাসকগণ (?) ভগবানের সেবার জন্য—সুখের জন্য সেবা করেন না; প্রভুকে দিয়া নিজেদের সেবা করাইয়া লইয়া থাকেন।

ভক্তগণের ভাব পৃথক। তাঁহারা ইহলোকের, পরলোকের, দেহ-গেহাদির সুখের সিদ্ধির, এমন কি মানুষের মহামৃগ্য মুক্তিরও অপেক্ষা রাখেন না—প্রয়োজন মনে করেন না। তাঁহারা স্বভাবে—ভাবে ভাবে—হৃদয়-ভবনে ভগবানেরই সেবা করেন। সেই সেবা-প্রবৃত্তি কোন বাধা মানে না। সাগরের অভিমুখে অতিক্রত প্রবাহিনী গঙ্গাধারার ন্যায় উঁচু-নীচু সকল স্থান ডুবাইয়া—সম্মুখের সব বাধা বিদূরিত করিয়া ছুটিতে থাকে। সেই ভক্তি-প্রবাহের বাধা নাই—বিপত্তি নাই—বিরাম নাই; তাহা প্রাণারামের রমণের জন্য—নয়নাভিরামের নয়নে নব-নবায়মান রমণীয়রূপে স্বরূপ ধারণ করিয়া তাঁহারই কোটিচন্দ্রসুশীতল

পদতল বিধৌত করিয়া সেই পদতলেই অবস্থান করে। ভক্তগণ ভগবানের সেবায় সতত যুক্ত। অন্যত্র অন্যবিষয়ে অন্য কার্যে যুক্ত-প্রবণচিত্ত, সেই নিত্যযুক্ত যোগিগণের বিক্রীতাত্মস্বরূপে বৃত্ত রচনার সুযোগ পায় না। ভগবানের ভক্তগণ—সেবকগণ ভগবানের সেবায়, ভগবানের ভক্তের সেবায় প্রীতিযুক্ত—নিত্য প্রীতিযুক্ত। দেহ ও দৈহিক স্ত্রীপুত্রাদিতে, গেহ ও গৃহসম্বন্ধীয় আত্মীয় স্বজনে, পাল্য পশুপক্ষী প্রভৃতিতে এবং বৃত্তি-কুলাদিতে প্রীতি-প্রয়োগের প্রাণ তাঁহাদের নাই। প্রাণের প্রাণ-সর্বপ্রাণ-প্রাণ-পরেশের প্রীতিতে পড়িয়া তাঁহারা প্রাণপণে প্রপন্ন। এহেন ভক্তগণ—ভাগবতগণ ভগবানকেই সার করিয়াছেন এবং ভগবানও ভক্তগণের ভাবে আবদ্ধ হইয়া সারাৎসার হইয়াও তাঁহাদিগকে সার করিয়াছেন।

ভক্তগণ যে ধর্মের কথা বলেন, তাহার সন্ধান ভাগবতে আছে। সেই ধর্ম লৌকিক ধর্ম নয়—পারলৌকিক ধর্ম নয়—সেই ধর্ম কোন বর্ণ-বিশেষের কিম্বা আশ্রমবিশেষের পালনীয় ধর্ম নয়—সেই ধর্ম জগতের কোন দেশ-বিশেষের অধিবাসীর জন্য নির্দিষ্ট নয়—সেই ধর্ম বালক-বৃদ্ধ-যুবা-স্ত্রী-পুরুষভেদে—পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গভেদে নয়, পরন্তু সেই ধর্ম সার্বদেশিক, সার্বকালিক এবং সার্বজনীন—সেই ধর্ম দেহের নয়, মনের নয়—আত্মার। সেই ধর্মই নিত্য ধর্ম, সনাতন ধর্ম এবং জৈব ধর্ম।

সেই ধর্ম—কৈতব রহিত। কৈতব—ছলনা বা কপটতা। সেই ধর্মে ধর্মযাজনকারীর দেহসুখ, মনঃসুখ অর্থাৎ ভুক্তি বা ভোগ, সিদ্ধি অথবা মুক্তি বা মোক্ষলাভের লোভ দেয় না। যেই ধর্ম ভোগা দিয়া প্রথমে ধার্মিককে, ধন-জন-অর্থাদি কামীকে ধনজনাদি প্রদানে সাময়িক সুখে প্রমত্ত করিয়া পরে পুনরায় সেই সুখ-নেশার বস্তুগুলি ধার্মিকের হাত হইতে ছিনাইয়া লয়, এইধর্ম সেইরূপ কপট ধর্ম নয়। আবার যেই ধর্ম

সিদ্ধিকামীকে সিদ্ধি সংগ্রহের সুযোগ দিয়া শেষে ঋদ্ধি-সিদ্ধি ভোগে প্রমত্ত করিয়া এবং পরিশেষে ঋদ্ধি নেশার অবসানে পুনরায় পূর্ব হইতে অধিক দুঃখ প্রদান করে, এইরূপ পরিণামে সিদ্ধিনাশক ধর্ম—ভাগবত-ধর্ম নয়। অথবা যেই ধর্ম আদিতে সাধককে 'নেতি নেতি' নীতিনিগড়ে আবদ্ধ করিয়া ভোগসিদ্ধির পরপারে ভগবান্ হইবার ইচ্ছা প্রবল করিয়া ইচ্ছাময়েরই ইচ্ছায়—বৃক্ষ-প্রস্তরাদি স্থাবরদেহলাভে লোভ-লাম্পের পরিচারিণী করে, এই ধর্ম ঐ প্রকার বিষকুম্ভ-পয়োমুখ-ধর্ম নয়; পরন্তু ইহা সেই মুক্তি-স্পৃহা-পিশাচি পরিত্যাগকারী একমাত্র পরমহংসগণের পরিপালনীয় পরম-পুরুষ প্রণীত পরম ধর্ম। এই ধর্ম শুধু তাপত্রয়-ত্রাতা নহেন, উহা ত্রিতাপোন্মূলনকারী শিবদ বা নিত্য মঙ্গলপ্রদ। এই ধর্মে ধার্মিকগণ—সাধকগণ ভুক্তিমুক্তি সিদ্ধি লোভে লুব্ধ না হইয়া লোভ মোহের পরপারে পরম পুরুষের সেবা লাভ করেন; আবার কেবলমাত্র সেই সর্ব-স্বরূপের স্বরূপ ঈশ্বরস্বরূপের সেবায় সন্তুষ্ট না হইয়া—সংপ্রীত না হইয়া সেই সর্বসেব্য ভগবান্ যিনি সেবা বিগ্রহগণের সেবা লোভে লুব্ধ হইয়া, বিমুগ্ধ হইয়া সেব্যপদবীর পরমোচ্চ পদবী হইতে পদপ্রান্তে পতিত পতি-পরিজন-পরিত্যক্তা গোপ-ললনাগণের ললিত রমণ হইয়া, গোপ্য হইয়া, পাল্য হইয়া, লাল্য হইয়া সেবক হইয়া সেবকের সেবক হন, সেই অহৈতুকী নির্মলা সেবাবাধ্য, ভক্তিবাধ্য, ভক্তের ভক্ত ভগবানের ভজন-রহস্য প্রদান করিয়া থাকেন।

সহজে এক কথায় বলিতে হইলে আমরা মহাপ্রভুর মহোপদেশে দেখিতে পাই—

"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।"

অতএব ভক্তসঙ্গে সর্বস্বের সেবায় সর্বস্ব সমর্পণকারী, ভাগবত-স্বরূপ ভক্তগণের সঙ্গে ভাব স্ফূর্তি ভাগবতের আলোচনা ও

উভয়বিধ ভাগবত সেবার দ্বারাই সহজে ভগবনের সেবা লাভ হয়।

"সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য" শ্লোকের ব্যাখ্যা

[প্রয়াগধামে য্যাড্‌ভোকেট শ্রীযুক্ত হরিমোহন রায় মহাশয় কর্তৃক প্রেরিত মোটরযানে তাঁহার আলয়ে গত ১১ই ভাদ্র (১৩৩৭ বঙ্গাব্দ) তারিখে উপস্থিত হইয়া তাঁহার পুত্র উকীল শ্রীযুত নীলমাধব রায় মহাশয়ের "সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" শ্লোকটীর ব্যাখ্যা সম্বন্ধীয় পরিপ্রশ্নের উত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ বলিতে লাগিলেন—]

গীতায় শ্রীভগবান্ সকল প্রকার ধর্ম ছাড়িয়া তাঁহার চরণে শরণ গ্রহণের কথা বলিয়াছেন। যেই ভগবান্ গীতার অন্যত্র স্বয়ং উপদেশ করিয়াছেন যে, স্বধর্ম ছাড়িয়া পরধর্ম গ্রহণ করিলে কোনও শুভোদয় হয় না—স্বধর্মে থাকিয়া নিহত হওয়া ভাল, তবুও ভয়াবহ পরধর্ম যাজন করা উচিত নয়, সেই ভগবান্ আবার বলিয়াছেন, তোমাদের যাবতীয় ধর্ম পরিত্যাগ কর। এই উভয়বিধ ভগবদ্-বাক্যের সামঞ্জস্য কোথায়? দেখুন, মানব নিজ বিদ্যা, বুদ্ধি, পারদর্শিতার প্রভাবে পুরুষোত্তম ভগবান্‌কে জানিতে পারে না। ভগবানেরই কৃপায় লোকে ভগবান্‌কে জানিতে পারে। আমরা যদি সেই কৃষ্ণচন্দ্রের ঔদার্যময়-লীলা প্রকটকারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর—যিনি কৃষ্ণ হইয়া কৃষ্ণের কথা—নিজের কথায় চৈতন্য বা জ্ঞান দিবার জন্য জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাঁহার কথা আলোচনা করি, তবে এই প্রশ্নের প্রত্যোত্তর সুষ্ঠুভাবে পাইতে পারি। মহাপ্রভু সন্ন্যাসের পর কাশীতে চন্দ্রশেখরের গৃহে বাস করিতেছেন। বাংলার বাদসাহ হোসেন শাহের প্রধান মন্ত্রী সাকর মল্লিক বা শ্রীসনাতন প্রভু তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। মহাপ্রভুর নিকট তিনি প্রশ্ন করিলেন—

'কে আমি, কেন আমায় জারে তাপত্রয় ?
ইহা না জানি—কেমনে হিত হয় ॥'

ইহার উত্তরে মহাপ্রভু কি বলিলেন শুনুন,—

'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি ভেদাভেদ—প্রকাশ ॥
কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব—অনাদি বহির্মুখ।
অতএব মায়া তা'রে দেয় সংসার দুঃখ ॥'

শ্রীচৈতন্যদেব সম্মুখে উপস্থিত ব্যক্তিকে কর্ণাটদেশীয় ব্রাহ্মণ দেখিলেন না—বাদসাহের প্রধান মন্ত্রী দেখিলেন না—প্রৌঢ় পুরুষ বলিয়া দেখিলেন না—পণ্ডিত বলিয়া বুঝিলেন না। বাহিরের কোনও কথা, কোনও বিচার গ্রহণ না করিয়া তিনি 'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস' বলিয়া বক্তব্য বলিতে আরম্ভ করিলেন। সেই শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু—পরিপূর্ণ চৈতন্যের স্বরূপ মহাপ্রভু—সকল চেতনের চেতন মহাপ্রভু সনাতনকে বাহ্য অনিত্য দেশ, কাল ও পাত্র অর্থাৎ জড়ীয় দেহ মনের পরিচয়ে পরিচিত না করিয়া তাঁহার নিত্যস্বরূপের—আত্মার পরিচয় প্রদান করিলেন। গীতায় যে দেহ ও মনকে ভগবান্ তাঁহার অপরাপ্রকৃতি, জড়াপ্রকৃতি, বিশ্ব প্রসবিনী মায়া-শক্তিজাত পদার্থ বলিয়া বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন এবং সেই স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহদ্বয়ে আবৃত পরা প্রকৃতির অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য আত্মার কথা বলিয়াছেন, জীব যদি অজ্ঞানাবৃত জ্ঞানে অর্থাৎ মোহবশে পুনরায় সেই নিত্য ও অনিত্য বস্তুর বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি না করিয়া, নিত্যে উদাসীন হইয়া, বিমুখ হইয়া,অনিত্যকে নিত্য বুদ্ধি করে, তবে দোষ কাহার? আবার যে ভগবান্ কৃপা করিয়া প্রাপ্তোদ্দেশ জীবকুলকে অনিত্যে নিত্য-বুদ্ধি বিদূরিত করিয়া নিত্যবস্তুর —আত্মার আত্মা পরমাত্মার ভজনের কথা, এমন কি কত না করুণা

করিয়া চরম ভজনের কথা বলিয়াছেন তাহার পর অবশেষ বুঝিবার কথা, ভাবিবার কথা থাকে কি? সব অজ্ঞান—সব অসুবিধা, সব মোহ দূর করিতেই এই শ্লোকের অবতারণা।

জীব পরম চৈতন্যের ভেদাংশ চৈতন্য—একথা গীতায়ও গীত হইয়াছে। সেই ভেদাংশ চৈতন্য বা অণুচৈতন্য জীব বৃহচ্চৈতন্য সেব্য-ভগবানের সেবক-সম্বন্ধে নিত্য সম্বন্ধ অর্থাৎ প্রভু ও দাস সম্বন্ধ উভয়ের অন্তরে বিদ্যমান। সেই চৈতন্য বস্তুর কথা, আত্মার কথা ভুলিয়া যখন আমরা দেহ ও মনকে 'আমি' বা 'জীব' বলিয়া বিবেচনা করি, সেই কালে যত অসুবিধা, যত বিভ্রাট্। তখন আমার দেহের উৎপত্তি যে কুলে, যে দেশে সেই কুল ও দেশকে আমার বলিয়া থাকি। তখন আমি নিজেকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, অন্ত্যজ বা ম্লেচ্ছ, পুরুষ, স্ত্রী অভিমান করিয়া থাকি। আবার দেহের পরিবর্তন বা অবস্থা ভেদে আপনাকে বালক, বৃদ্ধ, যুবা বলিয়া জানিয়া থাকি। সেই দেহকে 'আমি' জানিয়া 'আমি ভারতবাসী', 'আমি ল্যাপল্যাণ্ডবাসী', 'আমি বাঙ্গালী,' আমি হিন্দুস্থানী,' 'আমি পাঞ্জাবী' বলিয়া অভিমান করি। আবার আশ্রমীর অভিমানে আপনাকে ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থী এবং সন্ন্যাসী বলিয়া অভিমান করি। দেখুন, এই অবস্থায় ধর্মভেদ বা বহুধর্মের অবতারণা-কল্পনা সৃষ্টি।

গীতার বক্তা ভগবান্। তিনি কোন গানই বাকী রাখেন নাই—সবই গাহিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন আত্মা নিত্য, অপরিবর্তণীয়; দেহ—অনিত্য এবং হ্রাস-বৃদ্ধি যুক্ত। যাহারা দেহের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তনশীল আত্মার পরিবর্তন বা জন্ম মৃত্যু স্বীকার করে, তাহারা মূর্খ! সুতরাং 'সর্বধর্ম' শব্দে বদ্ধজীবের দেহ-মনকে

আত্মবুদ্ধি করিয়া যতপ্রকার ঔপাধিক ধর্ম স্বীকৃত হইয়াছে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র বর্ণধর্মসমূহ, ব্রহ্মচর্য-গার্হস্থ-বাণপ্রস্থ-সন্ন্যাস আশ্রম-ধর্মসমূহ এবং তদ্ব্যতিরিক্ত অন্ত্যজাদি ধর্ম, লৌকিক, নিজভোগ বা ত্যাগপর পারলৌকিক ধর্ম এবং সবিশেষভাবে বলিতে হইলে চতুর্দশভুবনান্তর্গত ধর্ম সমূহ।

দেখুন, ধর্ম—বস্তুর নিত্যসহচর। ধর্মকে ছাড়িয়া বস্তু এবং বস্তুকে ছাড়িয়া ধর্ম থাকিতে পারে না। বস্তু অর্থাৎ নিত্য সত্তা। তবে আত্মার উপর অনিত্য, পরিণামী, আদি মধ্য অন্ত্যবিশিষ্ট সত্তা বা দেহ ও মন বর্তমানে আসিয়া পড়িয়াছে। উহার ধর্ম—অনিত্য ধর্মকে ত্যাগ করিয়া শুধু ত্যাগ করিয়া নয় পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ দেহ-মনের স্মৃতিতে বিস্মৃতি আনিয়া—(যাহা গুরুপাদপদ্মাশ্রয়ে যত্নের সঙ্গে আলোচনা করিতে করিতে আপনিই আসিয়া যায়)—নিত্যাত্মার নিত্যধর্ম পরমাত্মা অর্থাৎ আমার ভজনা কর,—এই কথা শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন। কিন্তু এই সহজ সত্যের কথা ভ্রান্ত জীব হঠাৎ গ্রহণ করিতে পারে না। তাঁহার প্রমাণ দেখুন, পরবাক্যে ভগবান্ বলিয়াছেন,—"অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি"। অনিত্য জড় দেহ মনোধর্ম ছাড়িয়া নিত্য ধর্ম গ্রহণ করিতে হইলে জীব পূর্বাসক্তির বশে—মোহাবেশে যে বস্তু অনিচ্ছাসত্ত্বেও ছাড়িয়া যাইবে—চলিয়া যাইবে—বিনাশ প্রাপ্ত হইবে, সেই অনিত্য ধর্মত্যাগে পাপ হইবে বলিয়া বিচার করিয়া থাকে। হায়! হায়! যে নিত্যধর্মের অপালনই মহাপরাধ, আজ সেই নিত্যে উদাসীন, অনিত্যে নিত্যবুদ্ধিকারী বদ্ধজীব অনিত্যধর্মের অপালনকে পাপ বলিয়া বুঝিতেছে। আবার শুধু পাপে বুদ্ধি করিয়া উদ্ধার নাই—শোক করিতেছে। সেইজন্য "মা শুচঃ" ভগবদুক্তি।

শোক—শূদ্রের স্বভাব বা ধর্ম। বেদ-বিদ্যাদি সুপারঙ্গত পরব্রহ্ম-জ্ঞান-বিজ্ঞান-নিষ্ণাত গুরুসেবা, ব্রহ্মচর্যাদি পালন, শাস্ত্রাদি অধ্যয়নে অনধিকারী ব্যক্তিগণই শূদ্র। কিন্তু আবার যদি বেদাদি শাস্ত্রপাঠী বর্ণশ্রেষ্ঠ, আশ্রমশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ দেহে আত্মবুদ্ধি করেন, তাহা হইলে তাঁহারাও শূদ্র ব্যতীত অপর কিছুই নহেন। অতএব জড়দেহাভিমানী পাপ-পরায়ণ জনগণকে আত্মাভিমানে পরমাত্মা ভগবানের সেবার উপদেশ ভগবানই স্বয়ং প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গীতার এত বড় বাক্যকেও "এহো বাহ্য আগে কহ আর" বলিয়া রায় রামানন্দপ্রভুকে বলিয়াছেন। কেননা ভক্তি আত্মার সহজ বৃত্তি; তাহাতে ভগবানকে বলিয়া কহিয়া প্রতিজ্ঞাপত্র দিয়া ভক্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হয় না।

পিতাকে যদি সাধনা করিয়া পুত্রকে স্বভক্ত করাইতে হয়, তাহা হইলে পুত্রের মহিমা বা পুত্রের কৃতিত্ব বুঝিতে সাধারণের বাকী থাকে কি? কোথায় ভক্ত আপনা হইতে আপনভাবে আপন প্রভুর সেবা করিবে, তাহা না হইয়া বিপরীত হইতেছে না কি? এইস্থলে ভক্ত শুধু ভগবান্‌কে ভুলে নাই নিজেকে ভুলিয়াছে, নিজের নিত্য স্বরূপ—নিত্য অস্তিত্বের কথা ভুলিয়া অনিত্যের প্রভু হইয়া অনিত্যের সেবায় নিযুক্ত হইয়াছে। আবার নিজের নিত্যপ্রভু আসিয়া হাতে ধরিয়া টানিয়া আনিয়া আদর করিয়া গুহ্যতম উপদেশ বলিলেও জীব শুনিতেছে না—বুঝিতেছে না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব এত বড় ধারণাকে খুব ছোট দেখাইয়া ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত ধারণা বাহ্য জগদনুভূতির কথা জানাইয়া ব্রহ্মাণ্ডের পর বিরজা, বিরজার পর ব্রহ্মলোক, ব্রহ্মলোকের পর বৈকুণ্ঠ এবং বৈকুণ্ঠের ঊর্ধ্বোর্ধ্ব লোকের কথা—নিজ নিত্যবিহারস্থলীর ভক্তগণের কথা জানাইয়াছেন। পূর্বে অদত্ত প্রেমার কথা, অদ্ভুত প্রেমার সন্ধান

দিয়া জীব-চৈতন্যের চেতনার পরাকাষ্ঠা—চেতনার পরমোচ্চ পদবীতে আরোহণের সুযোগ দিয়াছেন।

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

দ্বিতীয় প্রবাহ

প্রয়াগ তত্ত্ব

[ফতেপুরের মুন্সেফ শ্রীযুক্ত নৃসিংহপ্রসাদ সান্ন্যাল মহাশয় প্রয়াগে শ্রীল প্রভুপাদের নিকটে উপস্থিত হইলে শ্রীল প্রভুপাদ হরিকথা-প্রসঙ্গে বলিতে থাকেন—]

এই প্রয়াগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এসেছিলেন। তিনি দশাশ্বমেধ ঘাটে দশদিন ধরে শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। প্রয়াগ—প্রকৃষ্ট যজ্ঞের স্থান। পূর্বে ব্রহ্মা এখানে প্রতিষ্ঠানপুর স্থাপন করে দশটী অশ্ব অর্থাৎ দশটী ইন্দ্রিয়ের বিলোপসাধন দ্বারা মেধ বা যজ্ঞ করেছিলেন। লোকে তিন ভাবে যজ্ঞ করে। পারলৌকিক লাভের বা স্বর্গ পাবার জন্য অথবা স্বর্গের রাজা ইন্দ্র হওয়ার জন্য। যে যজ্ঞে পশুহননাদির কথা আছে, সে যজ্ঞ প্রয়াগ নহে—নিকৃষ্ট যজ্ঞ। আর এক প্রকার যজ্ঞ, সেও দশ ইন্দ্রিয় দ্বারে। সেটা হয়েছিল —কাশীতে। সে যজ্ঞে যাজ্ঞিকেরা নিজের সুবিধার জন্য যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর সেবাসুখে উদাসীন হলো। নিজেদের ইন্দ্রিয়াদি বধ করে, নিজেদের সবিশেষভাব নষ্ট করে নির্বিশিষ্ট হয়ে সবিশেষ বিষ্ণুর নির্বিশেষভাব-প্রাপ্তি উদ্দেশ্য করেছিল। সেই স্বরূপে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণকে সম্বন্ধ জ্ঞান দিবার জন্য কাশীর দশাশ্বমেধ-তীর্থ-সন্নিধানে

মহাপ্রভু শ্রীসনাতন প্রভুকে সম্বন্ধ-জ্ঞানের কথা বলেছিলেন। আর এখানে ব্রহ্মা ইন্দ্রিয়াদি বিনষ্ট না করে অথবা ইন্দ্রিয়বর্গকে যথেচ্ছ বিহার করতে না দিয়ে ইন্দ্রিয়পতি হৃষীকেশের সেবায় নিযুক্ত করে-ছিলেন। এই ইন্দ্রিয় যজ্ঞ দশাশ্বমেধের কথা আমরা মহারাজ অম্ব-রীষের চরিত্রে দেখতে পাই। মহাপ্রভু দশদিন ধরে দশ ইন্দ্রিয়ের যজ্ঞ শিক্ষা দিলেন। শুধু ইন্দ্রিয়-যজ্ঞে যজ্ঞেশ্বরের যাজন জানান নাই—আত্মার দ্বারা আত্মার পরমোচ্চ অবস্থায় পরমোচ্চ ভাবে ভগবানের পরমোচ্চ অবস্থার ভজনের কথা বলেছিলেন।

দশাশ্বমেধ ঘাট ত্রিবেণীর উপর ছিল। এখন যমুনা সরিয়া যাওয়ায় ত্রিবেণীও দূরে গিয়েছে। ব্রহ্মার দ্বারা দশাশ্বমেধ যজ্ঞ করে যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরি যেমন ব্রহ্মাকে বেদবাণী উপদেশ করেছিলেন, আজ সেই বেদ-পতি, বাণী-বিনোদ মহাপ্রভু, শ্রীরূপপ্রভুকে বেদ-গুহ্যাতিগুহ্য ভক্তির কথা বলে ভোগরাজ্যে—ভগবানের সেবাবিমুখ-রাজ্যে ভক্তিরস-সমুদ্র প্রবাহিত করলেন। গোমুখীর দ্বারে গঙ্গা যেমন প্রবাহিত হয়ে সর্বদেশ পবিত্র করছেন, শ্রীরূপপ্রভুর দ্বারে সেইরূপ প্রেমভক্তিরস-সমুদ্র বিষয়-মরুতে প্রবাহিত হয়ে অমর জগতের পরমামৃতের সন্ধান দিচ্ছেন।

"প্রভু কহে,—শুন রূপ, 'ভক্তিরসের লক্ষণ'।
সূত্ররূপে কহি, বিস্তার না যায় বর্ণন॥
পারাপার-শূন্য গভীর ভক্তিরস-সিন্ধু
তোমায় চাখাইতে তার কহি এক বিন্দু॥"

(চৈঃ চঃ ম ১৯।১৩৬-১৩৭)

ভক্তি-রসসিন্ধুর বিন্দু পানে প্রমত্ত হয়ে শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' রচনা করেছেন। সেই ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর একবিন্দু

পান করলে জীব—ধন্য, ধন্য-ধন্য, ধন্যাতি-ধন্য হয়ে যাবে। জগতে বিদ্বান, বুদ্ধিমান, কবি, সাহিত্যিকের অভাব নেই। এমন কি, ধার্মিক-গণেরও (?) অভাব নেই; কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেই ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু গ্রন্থ আলোচনা করার সৌভাগ্য অনেকেরই নেই। আলোচনা করা ত' দূরে থাক, তাঁর সন্ধানও অনেকে রাখেন না। এই অমূল্য-গ্রন্থ আলোচনার অভাবে মঞ্জুষাবদ্ধ হয়েছেন, আবার দুষ্প্রাপ্যও হয়েছেন। অনেক ধনী ভারতে আছেন। তাঁরা বাজে কাজে, সখে অনেক অর্থ উড়িয়ে দেন; কিন্তু এমন একটি অমর অপার্থিব গ্রন্থের প্রকাশ করেন না, যা প্রকাশ করলে, পাঠ করলে, রসিক ভক্তের সঙ্গে পড়লে তিনিও ধন্য হবেন, বাকী বহুলোক ধন্য হবার সুযোগ পাবে।

পৌত্তলিকতা ও শ্রীবিগ্রহ-সেবা

[স্বনামধন্য স্বধামগত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের কনিষ্ঠ সুযোগ্য পুত্র সপরিবারে শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমনপূর্বক শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের দর্শনলাভ করেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাদিগকে পৌত্তলিকতা ও শ্রীবিগ্রহ-সেবার পার্থক্য জানান।]

নিরাকার ও সাকার প্রভৃতি প্রচলিত পরিভাষা সকলই অতৎ বা পৌত্তলিকতাব্যঞ্জক। নিরাকারবাদী অবকাশ বা আকাশের কিম্বা নিজের কল্পনা-গঠিত জ্যোতিঃ প্রভৃতি পুত্তলের পূজা করেন বলে তাঁরাও তথাকথিত সাকারবাদীর ন্যায় পৌত্তলিক। যাঁরা ব্যুৎ-পরস্ত, তাঁরা স্থূল পৌত্তলিক, আর যাঁরা অবকাশ বা নিজের কল্পনার পূজা করেন, তাঁরা সূক্ষ্ম পৌত্তলিক, এইমাত্র ভেদ। বৈষ্ণবগণ—শ্রীমদ্ভাগবতের সেবকগণ এইরূপ পুত্তল পূজার আদর করেন না। [এতৎ প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের "যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে

ত্রিধাতুকে” শ্লোকের বিচার কীর্তন করেন।] * * * * আপনি শ্রীবিগ্রহ দেখবেন, পুত্তল দেখবেন না। বদ্ধজীবের ন্যায় শ্রীবিগ্রহের দেহ-দেহীতে ভেদ নাই। শ্রীবিগ্রহ-সচ্চিদানন্দাকার পরম কৃপাময় ভগবদবতার।

উপনিষদ্ ও ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য—শ্রীমদ্ভাগবত

[শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ উপনিষদ্ ও ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা কিরূপে শ্রীমদ্ভাগবতেই প্রকৃষ্টরূপে কীর্তিত হইয়াছে, তাহা উপনিষদের বহু মন্ত্র, বাদরায়ণসূত্রের বহু সূত্র এবং শ্রীমদ্ভাগবতের বহু শ্লোক উদ্ধার করিয়া প্রদর্শন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলেন,—]

কৃত্রিম ভাষ্যের দ্বারা বেদান্ত বুঝবার যে চেষ্টা আধ্যক্ষিক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবর্তিত হয়েছে, তদ্দ্বারা বেদান্তের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গমের পক্ষে বিশেষ অনর্থ উপস্থিত হচ্ছে। শ্রীমৎ পূর্ণপ্রজ্ঞ মধ্বপাদ ঋক্ সংহিতার ৩ অধ্যায়ের ভাষ্য লিখেছেন। * * * এখন পর্যন্ত ভক্তিবিরোধিসম্প্রদায় ছান্দোগ্যোপনিষৎ নষ্ট করতে পারেন নাই—একায়ন নষ্ট করতে পারেন নাই, শ্বেতাশ্বতর নষ্ট করতে পারেন নাই, ‘নিত্যো নিত্যানাং’ শ্রুতি, ‘দ্বা সুপর্ণা’ শ্রুতি, ‘ঈশাবাস্যমিদং’ শ্রুতি, ‘নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া’ শ্রুতি, ‘যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ’ শ্রুতি, ‘শন্নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ শ্রুতি, ‘শ্রদ্ধৎস্ব সৌম্যেতি’, ‘তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত’, ‘পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে’, ‘যস্য দেবে পরাভক্তিঃ’ প্রভৃতি অসংখ্য শ্রুতি নষ্ট করতে পারেন নাই। যদি পারতেন, তা হলে কৈবলাদ্বৈতবাদ সিদ্ধ হত। ভাগবত যে কৃষ্ণপদারবিন্দের অবিস্মৃতির কথা বলেছেন, সেই কৃষ্ণস্মৃতি বিনষ্ট করবার জন্য অসংখ্য কংস, জরাসন্ধ উদিত হতে পারেন, কিন্তু তা ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে—শ্রীরূপ প্রভুর দাসগণের কৃপায়। * * *বৈষ্ণবধর্ম—সনাতনধর্ম।

শ্রীগোপীদাস্যপ্রাপ্তিই—শ্রীগৌরসুন্দরের দয়া

[আয়কর-বিভাগের য়্যাসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনার বরিশালনিবাসী রায় সাহেব শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ, প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ব্রহ্ম এম-এ, পি-আর এস, কলিকাতার জমিদার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ শ্রীগৌড়ীয়-মঠে উপস্থিত হইয়া প্রভুপাদের নিকট হরিকথা শ্রবণ করেন। প্রভু-পাদ 'জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য', সতাং 'প্রসঙ্গাৎ' প্রভৃতি ভাগবতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়া 'অনর্পিতচরীং চিরাৎ' শ্লোকের ব্যাখ্যা-মুখে শ্রীগৌরসুন্দরের দয়ার কথা অতিমর্ত্য আবেগভরে কীর্তন করিয়া-ছিলেন। প্রভুপাদ বলেন,—]

যদিও আমরা বর্তমানে অনেকে একটা নৈতিক পরিণয়-গ্রন্থিতে বদ্ধ হয়ে রয়েছি, তথাপি অপ্রাকৃত কামদেব আমাদিগকে উঠিয়ে নিয়ে তাঁর সেবায় সর্বাঙ্গীন অধিকার দিতে পারেন; এমন কি, নারায়ণের লক্ষ্মীকে তিনি গোপীগণের দাসী করে তাঁর সেবা দিতে পারেন; তিনি এত বড় দয়ালু! মানবজাতি এই জাগতিক মনো-ময়ী চিন্তার স্রোতে আবদ্ধ থাকা-কাল পর্যন্ত ভগবানের দয়ার অবধি হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন না। তাঁরা মনে করেন, এ আবার কি দয়া? দুই দিনের ইন্দ্রিয়ের নশ্বর সুখের জন্য বহির্জ্জগতের মুটেগিরি করা, ছাই পাঁশের বোঝা বহন করা, সভ্যতার নামে শঠতা বিস্তার করা, ধর্ম-অর্থ-কাম বা মোক্ষের স্বপ্ন দেখাই কি দয়ার উদাহরণ? ইহা মানবজাতির, বিশেষতঃ গৌড়দেশবাসী বলে যাঁরা অভিমান করেন, তাঁদের পক্ষে মহাদুর্ভাগ্যের কথা।

'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'তত্ত্বমসি', 'প্রজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম' ও 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' শ্লোক-চতুষ্টয়ের গৌরপর ব্যাখ্যা

**** 'ভক্তি' শব্দ একমাত্র পূর্ণভাবে শ্রীকৃষ্ণেই প্রযোজ্য। শতকরা শত পরিমাণ সেবা শ্রীকৃষ্ণই আকর্ষণ করে থাকেন। [এতৎ-প্রসঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখোচ্চারিত "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥" শ্লোকটির প্রতিপদ কিরূপে শঙ্করাচার্যের কথিত চারিটি প্রাদেশিক মহাবাক্যকে ক্রোড়ীভূত করিয়া সার্বদেশিক বেদের সকল বাক্যের তাৎপর্য প্রতিপাদন করেন, তাহা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।] 'অহং ব্রহ্মাস্মি' শ্রুতি মন্ত্র, তৃণাদপি সুনীচ' ও 'অমানী' পদদ্বয়ে ক্রোড়ীভূত হয়েছে। 'গোপীভর্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ' অর্থাৎ ভূতশুদ্ধি বা বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠাই 'অহং ব্রহ্মাস্মি' শ্রুতিমন্ত্রের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য। 'তত্ত্বমসি' শ্রুতি 'তরোরপি সহিষ্ণু' ও 'মানদ' পদে ক্রোড়ীভূত হয়েছে। "যাহাঁ যাহাঁ নেত্র পড়ে, তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে' ইহাই 'তত্ত্বমসি' শ্রুতির তাৎপর্য। 'প্রজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম' 'কীর্তনীয়ঃ' পদে ক্রোড়ীভূত হয়েছে। কীর্তন-জন্য প্রেমাই ঐ শ্রুতির তাৎপর্য। 'একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম' তৃণাদপি শ্লোকের 'হরিঃ' পদে ক্রোড়ীভূত হয়েছে। 'অদ্বয়জ্ঞান কৃষ্ণ ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন' বাক্যই 'একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম' এই শ্রুতির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য।

শ্রীচৈতন্যের দান

"হেলোদ্ধূলিত-খেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া স-মদয়া মাধুর্যমর্যাদয়া
শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে, তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া॥"

যে গৌরসুন্দরের প্রীতিসম্ভাষণে গৌড়দেশের অধিবাসিগণ সর্বতো-ভাবে গৌরবান্বিত, যে শ্রীগৌরসুন্দরের মাধুর্যকথা আলোচনা করে

জগতের সকল লোক শান্তি লাভ করেন, সেই শ্রীগৌরসুন্দর পরম দয়াময়। আমরা সকলেই দয়ার ভিক্ষুক। মানবজাতি—অভাবক্লিষ্ট; সেই অভাব যাঁরা মোচন করেন, তাঁরা 'দাতা' বলে গৃহীত হন। জগতে যে-সকল দানের পরিচয় আছে, সেই সকল দান অল্পকালস্থায়ী ও অসম্পূর্ণ। তারপর জগতের দাতৃগণের সমষ্টিও অতি অল্প। যদি দানপ্রার্থীর আশা ভরসা বেশী থাকে তা' হলে সেই সকল দাতা প্রার্থিগণের আশানুরূপ দান দিয়ে উঠ্‌তে পারেন না। পণ্ডিত মূর্খগণকে, ধনবান্ দরিদ্রগণকে, স্বাস্থ্যবান রোগিগণকে, বুদ্ধিমান্ নির্বুদ্ধিগণকে তাঁদের আশানুরূপ দান দিতে পারেন না, কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর মানবজাতিকে যে দান প্রদান করেছেন, মানবজাতি তত বড় দানের আশা প্রার্থনাও করতে পারে নাই। এত বড় দান জগতে আসতে পারে, জীবের ভাগ্যে বর্ষিত হতে পারে—একথা মানবজাতি পূর্বে ভাবতেও আশা করিতে পারে নাই। **শ্রীগৌরসুন্দর যে অপূর্ব দান মানবজাতিকে দিয়েছেন, তা সাক্ষাৎ ভগবৎ-প্রেমা। জগতে প্রেমের বড়ই অভাব; সেই জন্যই হিংসা, বিদ্বেষ, কামনা, অন্যান্য কথা জীবকুলকে এত ক্লেশ প্রদান করছে।** ভগবানের সেবা করবার জন্য যাঁরা অভিলাষবিশিষ্ট, তাঁ'দিকে বাধা দিবার জন্য এমন কি, দেবপ্রতিম ব্যক্তিগণ—সাক্ষাৎ দেবতাগণ পর্য্যন্ত প্রস্তুত।

আমরা প্রত্যেক মানুষ অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত—অত্যন্ত খর্বদৃষ্টিসম্পন্ন। আমরা ত্রিগুণে তাড়িত হয়ে বাস্তব সত্যের অনুসন্ধান করতে পারি না। এজন্য অনেক অসত্য কথা প্রলোভনের টোপ নিয়ে উপস্থিত হয়। যদি তাতে প্রলুব্ধ হয়ে পড়ি, তাহলে মনুষ্যজীবনের সার্থকতা হয় না।

গৌরসুন্দরের দান কোন্ গোমুখীর মুখ দিয়ে বর্ষিত হয়েছিল? শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী সেই গৌরসুন্দরের দান—সেই প্রেমপ্রয়োজন-মহীরুহের মধ্যমূল। যে প্রেম একমাত্র মৃগ্য—অবিকৃত আত্মার একমাত্র প্রয়োজন, সেই প্রেম যে-ভাবে পাওয়া যায়, শ্রীমাধবেন্দ্রপাদ তার একটী মূলমন্ত্র গান করেছিলেন। সেই গান শ্রীঈশ্বরপুরীপাদ শুনেছিলেন, মহাপ্রভু আবার ঈশ্বরপুরীপাদের মুখে সেই গান শুন্‌বার লীলা দেখিয়েছিলেন। সেই গানটী এই—

'অয়ি দীন' এই বিপ্রলম্ভগীতিই প্রেমের মূলমন্ত্র

"অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্ ॥"

ভারতবর্ষে এই দান দিয়েছিলেন—মাধবেন্দ্র পুরীপাদ; ভারতের অতীত স্থানে দিয়েছিলেন কি না; আমার তা জানি না। কৃষ্ণপ্রেম-প্রদান-লীলার এই মূলমন্ত্রটী যে ভারতবাসীর কাণে পৌঁছেছে, তাঁরই সর্বার্থসিদ্ধিলাভ হয়েছে, আর যাদের কাণে পৌঁছে নাই, তারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। এই মূলমন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা যিনি বুঝ্লেন না, তাঁর মানবজীবন-ধারণ বৃথা। এই বিপ্রলম্ভ-গীতি আমাদের অবিকৃত আত্মার ধর্ম—আমাদের সহজ স্বভাব।

ঠাকুর বিল্বমঙ্গল এককালে কুবিষয়ে অভিনিবেশের অভিনয় প্রদর্শন করেছিলেন। শিখিপিচ্ছমৌলির সেবায় নিরত হয়ে লীলাশুক তাঁর কর্ণামৃতের মধ্যেও বিপ্রলম্ভভজনের কথা ন্যূনাধিক গান করেছেন। গৌরসুন্দর মানবজাতিকে যে-কথা বলবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, সেই কথার আলোচনা হক। 'গৌড়দেশের অধিবাসী' অভিমান করে আমরা এখনও বিষয়-কার্যে অভিনিবিষ্ট রয়েছি!

ইহা এতদূর দরিদ্রতা যে, মানবের ভাষা দ্বারা তা ব্যক্ত হতে পারে না। এই দরিদ্রতা মোচনের জন্য মাধবেন্দ্রপাদ এই বিপ্রলম্ভগীতি গেয়েছিলেন—

'অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্ ॥"

যে-ব্যক্তি আমাদের অভাবের কথা বুঝে না, আমরা তাকে অনেক সময় দুঃখের সহিত ঠাট্টা তামাসা করে বলে থাকি 'দয়িত'। ব্রজবাসিগণের নিকট হতে ভগবান্ যখন মথুরায় চলে গেলেন, তখন ব্রজবাসিগণ নন্দতনুজকে এই কথা বলেছিলেন; আর বল্লেন,—'মথুরানাথ'; 'বৃন্দাবনপতি' বল্লেন না। মাথুরগানের কথা অনেকেই শুনে থাকবেন; এ সকল শব্দ বিপ্রলম্ভময়ী পরিভাষা। যাকে 'বিরহ' বলা হয়, তাকে সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে 'বিপ্রলম্ভ' বলে। ব্রজবাসিগণ কৃষ্ণকে বিরহে বলছেন,—তুমি 'দয়িত' বটে, কিন্তু তুমি 'মথুরা-নাথ'; আমাদের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করে চলে গেছ; আমরা কাঙ্গাল, তুমি আমাদের সর্বস্ব, সেই সর্বস্ব আজ লুণ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং দুঃখের কথা বলতে গিয়ে হাস্যরস ছাড়া আর কি আসতে পারে? তুমি আমাদের নয়নের মণি, আজ আমাদের চোখের আড়ালে চলে গেছ—আমাদিগকে চিন্তাকুল করে মথুরায় চলে গেছ। *

* এই কথা বলিতে বলিতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কণ্ঠস্বর গদগদ, বদনমণ্ডল এক অপার্থিব ভাবের রক্তিম আভায় রঞ্জিত এবং নয়নদ্বয় অদ্ভুত ভাবাবেশে বিভাবিত হইয়া প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল। মহাভাবগম্ভীর প্রভুপাদ সাধারণ্যের সভায় শীঘ্রই ভাব সঙ্কোচ করিয়া পরবর্তী কথাসমূহ বলিতে থাকেন। —**সঙ্কলক**

হে নন্দতনুজ, তুমি কি চিরদিনই অধোক্ষজ থাকবে? তোমার এমন সৌন্দর্য, রূপ রস আমরা দর্শন করতে পাব না? তুমি জ্ঞানগম্য বস্তু; আমাদের জ্ঞান নেই বলে দেখতে পাই না। আমরা যে অজ্ঞান, বালক, অবুঝ। আমাদের সহস্র সহস্র বৎসরের তপস্যা নেই বলে তুমি জ্ঞান-ভূমিতে চলে গেছ—যেখানে আমাদের ইন্দ্রিয় যায় না। কিন্তু তুমিই আমাদের একমাত্র অবলম্বনীয়, আর দয়াতে তোমার চিত্ত আর্দ্র। তোমাকে কবে আমরা দেখতে পাব? তুমি দেখা দিয়েছিলে—আমাদিগের চিত্তবিত্ত সেই দেখা দ্বারা হরণ করেছিলে—আমাদের সর্বস্বহরণকারী সেই হরি আজ মথুরায় চলে গেলে! তোমার দর্শনের অভাবে আমাদের হৃদয় কাতর।

সেই চিত্তের বৃত্তি—কৃষ্ণ-বিরহ-বিভ্রান্ত চিত্তের যে ব্যাধি, তার ঔষধি কোথায়? সেই জিনিষটী হচ্ছে শ্রীগৌরসুন্দরের মূল মন্ত্র,—

"অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥"

অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তনই সর্বশুভদ

গৌরসুন্দর বল্লেন,—হে বিষয়-নিবিষ্ট-চিত্ত মানবকুল, এই দুনিয়াদারীর ছাই-পাঁশের মুটেগিরি করতে করতেও তার প্রতি বিরক্তি এসে কি প্রকারে তোমাদের মঙ্গল হবে, তোমরা কি প্রকারে উৎক্রান্তদশায় এসে উপস্থিত হবে, সেজন্য তোমরা এই শিক্ষা গ্রহণ কর, তোমরা শ্রীকৃষ্ণের সংকীর্তন কর।

"চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনম্॥"

শ্রীকৃষ্ণের সংকীর্তনে আট প্রকার সুখোদয় হয়। হে কর্মঠ জীব-সম্প্রদায়—মনুষ্যজাতি, এই কথাটী একটুকু শ্রবণ কর। শ্রীকৃষ্ণের সম্যগরূপ কীর্তন জয় লাভ করুক। যে সকল লোকের বিষয় কথা শুনতে শুনতে কর্ণ একেবারে বধির হয়ে গেছে, তাদিকে কৃষ্ণ-সংকীর্তন শুনাতে হয়। বহির্জগতের চিন্তাস্রোত তাদিকে ঠেলে মায়াবাদের অকূল সাগরে ফেলে দিচ্ছে। সংসার-সাগরের বিষয়-ভোগের স্রোত তাদিকে মায়াবাদ-সাগরের বিষয়-ত্যাগের স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে কৃষ্ণবিমুখতার চরম আবর্ত-বিবর্তে পাতিত করছে। 'হাম খোদাই' যুক্তিতে চালিত হয়ে মানুষ স্বগত স্বজাতীয়-বিজাতীয় ভেদরহিত হওয়ার স্বপ্ন দেখেন—ত্রিপুটী বিনাশের বিচার অবলম্বন করে আত্মবিনাশের পথে ধাবিত হন। তা হতে রক্ষা পেতে হলে শ্রীকৃষ্ণের সংকীর্তন কর; তাতে আট প্রকার সুখোদয় হবে।

চিত্তদর্পণে দৃশ্যজগতের আবহাওয়া নিরন্তর স্তূপীকৃত আবর্জনা এনে ফেলছে। সেই আবর্জনারাশি চেতনের বৃত্তিকে চাপা দেয়। চিত্তদর্পণে যে ধূলো পড়ে গিয়েছে,—তার উপর যে প্রকারে বিকৃত-ভাবে দৃশ্য জগৎ প্রতিফলিত হচ্ছে, যার ফলে আমরা কেহ কর্মবীর, কেহ ধর্মবীর, কেহ কামবীর, কেহ অর্থবীর, কেহ জ্ঞানবীর, যোগবীর, তপোবীর হওয়ার অবৈধ অভিলাষ সৃষ্টি করে তাতে ধ্বংস লাভ করবার জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠেছি—মানব-সমাজ আমরা প্রেম হতে দিন দিন কতদূরে চলে যাচ্ছি, সেই সব অসুবিধা আনুষঙ্গিক ভাবে অতি সহজে বিদূরিত হতে পারে—কৃষ্ণের সম্যগরূপ কীর্তনে। কৃষ্ণের সম্যক কীর্তনের অভাবে মানব জাতির শুভোদয়ের দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের—'শ্রীকৃষ্ণটী' মানুষের মনোধর্মের কারখানায় প্রস্তুত কৃষ্ণ নন। ঐতিহাসিক কৃষ্ণ, রূপক কৃষ্ণ, তথাকথিত

আধ্যাত্মিক কৃষ্ণ, কল্পিত কৃষ্ণ, প্রাকৃত সহজিয়ার কৃষ্ণ, প্রাকৃত কামুকের কৃষ্ণ, প্রাকৃত চিত্রকরের কৃষ্ণ, যথেচ্ছাচারিতার কবলে কবলিত কৃষ্ণ, মেটেবুদ্ধির কৃষ্ণ, কারও ব্যক্তিগত রুচির ইন্ধন সরবরাহকারী কৃষ্ণ, মায়ামিশ্রিত কৃষ্ণ—"শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্তনের" কৃষ্ণ নন।

বিখ্যাতকীর্তি ঔপন্যাসিক যখন কৃষ্ণচরিত্র বর্ণন করলেন, তখন নবীন বঙ্গীয় যুবকগণ কত উচ্ছ্বাসভরেই না সেই বর্ণনার কীর্তিগাথা বাঙ্গালার হাটে-ঘাটে-মাঠে গেয়ে বেড়াতে লাগলেন। যখন প্রথম কৃষ্ণচরিত্র-গ্রন্থ প্রকাশিত হলো, তখন নবীন প্রবীণ সকলের মুখেই শুনলাম যে, এবার কৃষ্ণচরিত্রের উপর এক নূতন আলোক এসে গেছে! 'মহাভারতের কৃষ্ণ', 'ভাগবতের কৃষ্ণ' প্রভৃতি কত কি বিচার হলো। আমাদের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কৃষ্ণ সেইরূপ কোন লোকের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ইন্ধন-সরবরাহকারী কৃষ্ণ নন। মানুষের মেটেবুদ্ধি সেই শ্রীকৃষ্ণকে মেপে নিতে পারে না।

'শ্রীকৃষ্ণ'—এখানে যে "শ্রী" কথাটী, সেই "শ্রী" আকৃষ্টা হয়েছেন কৃষ্ণের দ্বারা ; এজন্য "শ্রীকৃষ্ণ"। কৃষ্ণ—আকর্ষক, শ্রী—আকৃষ্টা। শ্রী—পরম সৌন্দর্যবতী। পরম সৌন্দর্যবতীকে যিনি নিজ সৌন্দর্যের দ্বারা আকর্ষণ করতে সমর্থ, তিনি শ্রীকৃষ্ণ।

পঞ্চমস্বরে যে বংশীধ্বনি গীত হয়, তা ত্রিগুণতাড়িত ব্যক্তি শুনতে পায় না, এমন কি, চতুর্থমানেও শ্রীকৃষ্ণের মুরলীর পঞ্চম তান অনেকে শুনতে পান না। তূরীয় রাজ্য বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসকগণ কৃষ্ণ-মুরলীর পঞ্চম তানের মাধুরী বুঝতে পারেন না।

যেরূপভাবে রুদ্রের পরিচয়, ব্রহ্মার পরিচয় বা বিষ্ণুর পরিচয় হয়, সেইরূপ গুণাবতারজাতীয় বস্তু শ্রীকৃষ্ণ নন। তিনি গুণাবতারগণের অবতারী। জড়বোধ-ব্যাপার-বিশেষমাত্রও তিনি নন। তিনি

চেতনাভাস মনকে মাত্র আকর্ষণ করেন না; তিনি অনাবিল আত্মাকে আকর্ষণ করেন—তিনি সৌন্দর্যবানকে আকর্ষণ করেন—সৌন্দর্যবতী-গণকে আকর্ষণ করেন।

আমরা যেখানে অত্যন্ত ভীতি, সঙ্কোচ ও সম্ভ্রমের সহিত পূজা করতে যাই, সেখানে আমরা কৃষ্ণকে পাই না—কৃষ্ণের অবতারসমূহকে পাই। আমরা অভাবক্লিষ্ট, এই হেতুমূলক বোধ তখন আমাদিগকে ঐশ্বর্যবানের উপাসক করে তুলে। গৌরসুন্দর যখন দক্ষিণ দেশে গিয়েছিলেন, তখন সে দেশ থেকে একখানা গ্রন্থের একটি অধ্যায় তিনি এনেছিলেন, তার নাম—'ব্রহ্মসংহিতা'। তাতে ব্রহ্মা কৃষ্ণের স্বরূপ বর্ণন করে বলছেন—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্॥

সকল কারণের কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে কৃষ্ণকেই পাওয়া যায়। কার্যকারণবাদের মূল চরম বস্তু অনুসন্ধান করা আবশ্যক। সেই অনুসন্ধান বা জিজ্ঞাসার অন্তিমে শ্রীকৃষ্ণই আবির্ভূত হন। সৌন্দর্য না থাকলে—যোগ্যতা না থাকলে তিনি আকর্ষণ করেন না। দয়া নিতে হলে দয়ার দানীর চিত্ত আকর্ষণ করতে হয়—সকল জগতের সহিত বন্ধুত্ব বিচ্ছিন্ন করে দানীর অব্যভিচারী বান্ধব—প্রেয়সী হতে হয়।

তিনি সৎ, চিৎ ও আনন্দঘনমূর্তি। তিনি নিত্যকাল অবস্থিত; কাল তাঁ হতেই প্রসূত হয়েছে, কালের কাল মহাকাল তাঁর অধীন, তিনি পূর্ণজ্ঞানবস্তু, তিনি নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময় বস্তু।

এইরূপ শ্রীকৃষ্ণের সম্যক কীর্তনে জীবের সর্বসুখোদয় হয়। কৃষ্ণের আংশিক কীর্তন করে যদি জীবের সর্বসুখোদয় না হয়, তাহলে

অনেকে কৃষ্ণকীর্তনের শক্তি বিষয়ে সন্দিগ্ধ হয়ে পড়তে পারেন। কৃষ্ণের বিকৃত কীর্তনে জীবের তুচ্ছফল লাভ হতে পারে। এজন্য বুদ্ধিমানগণ শ্রীকৃষ্ণের সম্যক কীর্তনের বিজয় বাঞ্ছা করেন।

পরমার্থ

সর্বতোভাবে অযোগ্য আমি, সুতরাং ভগবানের দয়ার অধিক পাত্রই আমি। যাঁদের যোগ্যতা অধিক আছে, তাঁরা ভগবানের দয়া অধিক প্রার্থনা না করলেও নিজ-নিজ কৃতিত্ব বলে মঙ্গলের পথে যেতে পারেন, কিন্তু আমার সে আশা ভরসা নেই, আমি সর্বাপেক্ষা দীন, নিতান্ত অকিঞ্চন। সুতরাং ভগবানের দয়া-ভিক্ষা ব্যতীত আমার অন্য কোন সম্বল নেই। সেই সম্বলের দাতা শ্রীগুরুপাদপদ্মই আমার একমাত্র সম্বল।

"অহং ব্রহ্মাস্মি" প্রভৃতি বাক্য অনেক সময় অনেকের মুখে শোনা যায়, এইরূপ উচ্চাকাঙ্ক্ষা অনেক উন্নত হৃদয়ে অভিব্যক্ত; আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট হতে যে কথা শুনেছেন, তিনি সেই উপদেশ আমার কর্ণে প্রদান করে বলেছেন,—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা ।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥

মন্ত্র ও মহামন্ত্র

শ্রীগৌরসুন্দর জগৎকে যে শিক্ষা দিয়েছেন, সেই শিক্ষা আমরা গুরুপাদপদ্ম হতে মন্ত্ররূপে লাভ করেছি। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদিগকে যে জিনিষ দিয়েছেন, তা সাধারণ মন্ত্র নহে—**মহামন্ত্র।** মননধর্ম

হতে ত্রাণ করে যে জিনিষ, সেই জিনিষের নাম—মন্ত্র। সাধারণ মন্ত্র চতুর্থ্যন্ত পদ ও 'নমঃ' 'স্বাহা' 'স্বধা' প্রভৃতি শব্দ-প্রযুক্ত আর মহামন্ত্র—সম্বোধনাত্মক পদ। শ্রীভগবানের নামই—মহামন্ত্র। সেই শ্রীনাম এত শক্তি ধারণ করে, যে-শক্তি আর কোন বস্তুতে পাওয়া যায় না।

বৈকুণ্ঠনাম ও কুণ্ঠনাম

সেই নাম—**বৈকুণ্ঠনাম।** সেই নাম এই কুণ্ঠাধর্মযুক্ত গুণজাত জগতের বিভিন্ন ভাষার শব্দের মত দেখতে হলেও তাঁর সম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্য আছে। সে নাম—বৈকুণ্ঠনাম, "বৈকুণ্ঠনামগ্রহণং অশেষাঘহরং বিদুঃ"—যে বৈকুণ্ঠ নামের আভাসে নিখিল পাপ অনায়াসে বিদগ্ধ হয়ে যায়, সেই নাম সর্বক্ষণ কীর্তনীয়। বৈকুণ্ঠ-নাম উচ্চারণ করলে মানব বৈকুণ্ঠে অবস্থিত হয়—পরম ধর্মে অবস্থিত হয়—পরমার্থ লাভের জন্য ব্যস্ত হয়। মায়িক নাম—কুণ্ঠনাম সেরূপ নয়।

আমাদের ভাগ্য এমন মন্দ যে, আমাদের সর্বশক্তিমান বৈকুণ্ঠ-নামে রতি না হওয়ায় আমরা ইতর কথায় ব্যস্ত রয়েছি। জগতের অন্যান্য কার্য সম্পাদনের জন্য—অন্যান্য অভিলাষ চরিতার্থ করবার জন্য—অন্যান্য চর্চা করবার জন্য আমরা যে-সকল শব্দ ব্যবহার করি, সেই সকল ভাষাগত শব্দ আমাদের সেবা করে—আমাদের ইন্দ্রিয়ের অধীন হয়—আমাদের অভিলাষের সরবরাহ-কার্যে নিযুক্ত থাকে; কিন্তু বৈকুণ্ঠ-নাম সেরূপ নহেন।

আমার মঙ্গলের জন্য "অহং ব্রহ্মাস্মি" শ্রৌতমন্ত্রের যে প্রকৃত অর্থ,—জীবের চরমাবস্থা লাভের পরে যা হয়,—গৌরসুন্দর 'তৃণাদপি সুনীচ' শ্লোকে তা বলে দিয়েছেন। অন্যান্য শব্দ আমাদিগকে উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা দুরাকাঙ্ক্ষার স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, কিন্তু বৈকুণ্ঠ-নাম

আমাদিগকে কৃষ্ণের সেবা-পথে ধাবিত করায়—আমাদিগের উপর তাঁর পূর্ণ প্রভুত্ব, পূর্ণ স্বারাজ্য বিস্তার করে; সেই নাম-প্রভুকে আমি নমস্কার করি। সেই নাম-প্রভুর দাতা-শিরোমণি শ্রীগুরুপাদ-পদ্মকে আমি সর্বাগ্রে বন্দনা করি।

অর্থ ও পরমার্থ

আজকে আমাদের কৃত্যপরমার্থ-বিষয়ের আলোচনা। অর্থ ও পরমার্থের মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে। পরমার্থ—আত্মার পূর্ণগতিকে লক্ষ্য করে। আত্মা—জরবস্তু নহে যে, তাহার গতি থাকবে না। যখন অনাত্ম-প্রতীতি আমাদিগকে জড়ীভূত করে, তখন তা হতে বিমুক্তি লাভের জন্য আমাদের হৃদয়ে একটা শান্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা হয়। যেহেতু আমরা অশান্ত রাজ্যে বাস করছি, সেই হেতু আমরা শান্তির প্রয়াসী হই। সেই শান্তি কি জাড্যজাতীয় বস্তু? নিশ্চয়ই নহে, পরম গতিবিশিষ্ট—যে গতির ন্যায় আর গতি হতে পারে না। অটোমোবাইল, এরোপ্লেন প্রভৃতির জড়গতি সেই গতির সহিত তুলনাই হতে পারে না। সেই শান্তি—পূর্ণপ্রগতিময়ী। যেখানে পূর্ণ-চেতনের ক্রিয়া যত অভিব্যক্ত, সেখানে গতির তত প্রকাশ। এই-রূপ প্রগতির পরাকাষ্ঠাযুক্ত পরমার্থের অনুসন্ধান করা, আলোচনা করা আমাদের কৃত্য হয়েছে। এতদুদ্দেশ্যে আমাদিগকে সহায়তা করবার জন্য আমরা মনীষিগণের নিকট উপস্থিত হয়েছিলাম। আমাদিগের ইহ জগতে কিছুই নেই—আমাদের আভিজাত্য, ঐশ্বর্য, পাণ্ডিত্য, শ্রী—কিছুই নেই; আমরা অকিঞ্চন।

ভগবান্‌কে আশ্রয় না করলে মায়ার প্রভু হবার যে ইচ্ছা আমাদের হৃদয়ে এসে উপস্থিত হয়, সেরূপ প্রভুত্বের কামনা বা

অহঙ্কার আমাদিগকে যে অর্থের জন্য চালিত করে, তা' পরমার্থ নহে—অনর্থ। যেমন গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন,—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্বশঃ।
অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥

সে অনর্থ—সে অধনকে পরিত্যাগ করে ধন-লাভের জন্য যে যত্ন, তাতে গৌরসুন্দরের কথাটী বড়ই অনুকূল হয়,—

'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।'

সর্বক্ষণ তৃণাদপি সুনীচতার সহিত হরি কীর্তনীয়। খাণিকক্ষণের জন্য দৈন্য প্রকাশ কর্‌লাম—কপটতার সহিত আঁকুপাঁকু ভাব দেখালাম, পরক্ষণেই অহঙ্কারে প্রমত্ত হলাম, সেরূপ নয়। আমাদিগকে ভগবানের নাম গ্রহণে যিনি যোগ্যতা দিয়েছেন, তাঁর চরণে পুনরায় অর্থাৎ দ্বিতীয়বার প্রণাম করি।

যাঁরা তৃণাদপি সুনীচ, তদপেক্ষা সুনীচের আদর্শপ্রকটকারী যে অকিঞ্চন পুরুষ, তাঁর দাস্য করলে আমাদের সকল পরম-অর্থ লাভ হবে। তাঁর পাদপদ্মসেবা অতিক্রম কর্‌লে কিছু সুবিধা হবে না। আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম বলেন,—

'পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ।
জগাই মাধাই হৈতে মুই সে পাপিষ্ঠ॥
মোর নাম লয় যেই, তার পাপ হয়।
মোর নাম শুনে যেই তার পুণ্য ক্ষয়॥'

এই প্রকার শ্রীগুরুপাদপদ্মের দাস্য করবার জন্য যে দুরাশা—উচ্চাকাঙ্ক্ষা তা' শ্রীগুরুপাদপদ্মের দাসগণের অনুগ্রহ হলেই লাভ হয়।

জগতের বিদ্বৎসমাজের সহিত বাক্যালাপ করবার মত ভাষা আমার নেই। আমি জগতের সকল লোকের নিকট হতে অনু-

গ্রহপ্রার্থী মাত্র ; সুতরাং আমার ন্যায় অযোগ্যতমকে যে গুরুকার্য্যের ভার দেওয়া হয়েছে, তা আমি নিজে বুঝি এবং সকলেও তা বুঝেন। যদি জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রী থাকে, তবে ভগবান্‌কে ডাকা যায় না ; এই কোনটীতেই আমার সুবিধা হয় নাই। সুতরাং আমার জন্য শাস্ত্রকার লিখেছেন,—

> 'বেদৈর্বিহীনাশ্চ পঠন্তি শাস্ত্রং
> শাস্ত্রেণ হীনাশ্চ পুরাণপাঠাঃ।
> পুরাণহীনাঃ কৃষিণো ভবন্তি
> ভ্রষ্টাস্ততো ভাগবতা ভবন্তি ॥'

আমার কৃষি নষ্ট হয়ে গেছে, সুতরাং ভগবানের সেবা ব্যতীত গত্যন্তর নাই অর্থাৎ আমি যে সর্বাপেক্ষা অধম, এ বিষয়ে আপনাদেরও মতভেদ হবে না। জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রী—যখন কিছুতেই আশা ভরসা নেই, তখন ভগবান্‌কে ডাকা ব্যতীত আমার আর উপায় নেই। সেজন্যই আজ আমাকে এরূপ কার্য্যে নির্বাচিত করা হয়েছে।

অতএব আমি অবনত মস্তকে আমার গুরুবর্গের প্রদত্ত এই ভার গ্রহণ করলাম। আমি এ জগতের কোন কাব্যশাস্ত্রে পণ্ডিত নই, এ জগতের শব্দ-শাস্ত্র, ব্যাকরণে আমার জ্ঞান নেই, এজন্য আপনাদের নিকট আমার ভাষা কঠিন কিম্বা ব্যাকরণদুষ্ট মনে হতে পারে। তথাপি আমি আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম হতে শ্রীচৈতন্য-দেবের যে কথাগুলি শুনেছি, তা আপনাদের নিকট বলবার জন্য আমার অত্যন্ত অভিলাষ হয়। আমি আপনাদের নিকট একটী অভিভাষণ পাঠ করছি। তার প্রারম্ভে শ্রীচৈতন্যদেব কি বস্তু, তা বলা হয়েছে।

বিষয় ও আশ্রয় বিগ্রহ

চিদচিন্মিশ্র জৈবপ্রতীতিসম্পন্ন আমাদের একমাত্র পরমোপাস্য বস্তু, বাস্তব-বিষয়াশ্রয় মিলিত-তনু—শ্রীচৈতন্যদেব। চিৎ বা সম্বিৎ—স্বতন্ত্র, অচিৎ বা অজ্ঞান—অস্বতন্ত্র। জ্ঞান ও জ্ঞানের অভাব—এই মিশ্র-ভাবসম্পন্ন আমরা বদ্ধজীব-সম্প্রদায়। সেইরূপ আমাদের একমাত্র উপাস্য—শ্রীচৈতন্যদেব। বিষয় ও আশ্রয় মিলিত হয়ে যে অপ্রাকৃত শরীরটী, তিনি সেই বস্তু। জড়বিষয় ও জড় আশ্রয়কে লক্ষ্য করে একথা বলা হচ্ছে না। জড়জগতে অসংখ্য বিষয় ও অসংখ্য আশ্র-য়ের অভিমানে সকলে অভিমানী। পূর্ণচেতন কোন অস্বতন্ত্রতার বাধ্য নন, এজন্য তাঁকেই বিষয় বলা হয়। তাঁর যোষা-সম্প্রদায়কে 'আশ্রয়' বলা হয়। শ্রীচৈতন্যদেব যদি কেবল বিষয়বিগ্রহের লীলা করতেন, তাহলে চিদচিন্মিশ্র বদ্ধজীব সম্প্রদায়ের মঙ্গল হতো না, তা হলে তাঁর সঙ্গে ঝগড়া বেধে যেতো। "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি" এই গীতার বাক্যানুসারে আমরা যে জড়জগতের কর্তা বা বিষয়া-ভিমান করছিলাম—শ্রুতির তাৎপর্যবোধে বিমুখ হয়ে "অহং ব্রহ্মাস্মি" বাক্য উচ্চারণ করে যে 'বিষয়' সাজ্‌বার উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা দুরাকাঙ্ক্ষা পোষণ করছিলাম—ক্ষুদ্র হয়ে বৃহৎএর প্রতি যে মুখভঙ্গী করছিলাম, সে অমঙ্গলের হাত হতে আমরা উদ্ধার পেতাম না, যদি বিষয়-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর আশ্রয়-বিগ্রহের রূপ ও ভাব অবলম্বন না করতেন। শ্রীগৌরসুন্দর সেবাধর্মের মূর্তবিগ্রহ, কিন্তু স্বয়ং—বিষয়-তত্ত্ব। যে বিষয়তত্ত্ব হতে অনন্ত কোটি জীব প্রকাশিত হয়েছে, তিনি সেই বিষয়বিগ্রহ বলদেবেরও প্রভু, পরম বিষয়; এজন্য তাঁকে 'মহাপ্রভু' বলা হয়। তিনি বিষয়-বিগ্রহ হয়েও আশ্রয়ের ভাব-কান্তি গ্রহণ করেছেন। এ জগৎ থেকে দেখতে গেলে বিষয়—এক অর্দ্ধ,

অপরার্দ্ধ—আশ্রয়। আমরা বিষয়-বিগ্রহ হতে চ্যুত হয়ে যে জগতের বিষয়বিগ্রহের অভিমান করছি—মূল আশ্রয়-বিগ্রহের বিষয়বিগ্রহের প্রতি সেবার আনুকূল্য হতে পৃথক হয়ে বিপথগামী হচ্ছি, তাহতে রক্ষা করবার জন্য বিষয়বিগ্রহ আশ্রয়বিগ্রহের রূপ গ্রহন করেছেন। তাঁর রূপের তুলনা হয় না। আমি রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দের ভোগী চিদচিন্মিশ্রিত জীব, রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দের পিঞ্জরে—মনোধর্মের পিঞ্জরে আবদ্ধ। এমন নরশরীরবিশিষ্ট হয়ে সর্বদা পরমার্থ বিহীন —সর্বদা ভগবৎ সেবা—বঞ্চিত ; সুতরাং আমাদের শ্রীচৈতন্যদেবের চরণাশ্রয় ব্যতীত আর অন্য গতি নাই। বিষয় একটি—'একমেবা-দ্বিতীয়ম্' ; ছান্দোগ্য বলছেন,—

"শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে"

এখান হতে একটী উর্দ্ধস্থিত গোলোক-পদার্থের একটা দিক দেখা যায়, অপরাংশ দেখা যায় না—উন্নতাংশে না গেলে দেখা যায় না।

সাধারণ সাহিত্যিক-সম্প্রদায় যে বিষয়াশ্রয়ের কথা আলোচনা করেন, তাতে বিষয়ের বহুত্ব। ভরতমুনি অলঙ্কার-শাস্ত্রে যে বিষয়া-শ্রয়ের যুক্ত ভাবের কথা আলোচনা করেছেন, তাতে আমরা জানতে পারি,—বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী—এই চারি প্রকার সামগ্রীর সমগ্রতা সম্পন্ন হয়, যদি তারা স্থায়িভাবের সহিত সংযোগ লাভ করে। তাতে একটী সুন্দর পানা বা রস প্রস্তুত হয়। কেউ কেউ বলতে পারেন, রসের সৃষ্টি ত এ জগতেও হচ্ছে। এখানে অসমগ্রের সহিত অস্থায়িভাবের সম্মিলনে বিকৃত ও খণ্ড-রসের উদয় হচ্ছে, এজন্য উহা পরিবর্তনশীল ধর্মের অধীন। শ্রীচৈতন্যদাসগণই এ কথা সুষ্ঠুভাবে বুঝতে পারেন, অপরের সুদুরূহ ব্যাপার।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম হতে শ্রুত বিষয় ব্যতীত ব্যক্ত বা অব্যক্ত তার্কিকের নিকট হতে কোন কথা শুনবার যদিও আমাদের যোগ্যতা নেই, তা হলেও আমরা তাঁদের নিকট হতে অনেক কথা শুনে ব্যতিরেকভাবে সাহায্য পেতে পারি। অসাত্বত-শাস্ত্রমধ্যেও অনেক কথা আছে, যা সত্যের সমর্থকরূপে উদাহৃত হতে পারে। মহাজনগণও অসাত্বত শাস্ত্র হতে বাস্তব সত্যের সমর্থকরূপে অনেক বাক্য উদ্ধার করে প্রমাণ করেছেন যে, সাত্বত শাস্ত্র ত একথা স্বীকার করেনই, অসাত্বত বিচারকেরও ইহা অস্বীকার করবার উপায় নেই। সুতরাং আমরা এ বিষয়ে অপর পথ গ্রহণ করেছি বলে যে বাহ্য প্রতীতি হচ্ছে, তাতে আমরা বেশী দোষ করি নাই বলেই মনে হয়। আমরা অসাত্বতগণের নিকট হতেও এমন কথা পাব, যা আমাদিগকে সাহায্য করবে—অন্বয়ভাবে নয়, ব্যতিরেকভাবে সাহায্য করবে। কেবল একমাত্র গুরুপাদপদ্মই অন্বয়ভাবে সাহায্য করে থাকেন। মোট কথা, দুঃসঙ্গ করবার জন্য আমাদিগের যত্ন হয় নাই।

[শ্রীল প্রভুপাদের সন্দর্ভাকারে রচিত অভিভাষণ]

চিদচিন্মিশ্র জৈবপ্রতীতসম্পন্ন আমাদের একমাত্র পরমোপাস্য বস্তু বাস্তববিষয়াশ্রয়মিলিত-তনু শ্রীচৈতন্যদেব। তাঁহার আশ্রিত জীবকুল তাঁহার চেষ্টায়ই অনুপ্রাণিত। শ্রীচৈতন্যদেব সারা জীবন ধরিয়া কৃষ্ণানুসন্ধানে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁহার নিত্যকাল-আশ্রিত আমরা ঐ বৃত্তির অনুসরণ করিলেই ত্রিগুণান্তর্গত বর্তমান মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের অতীত রাজ্যেরও অনুভূতি লাভ করিব।

চিদচিন্মিশ্র প্রতীতি আমাদিগকে ন্যূনাধিক ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটবদোষে সংশ্লিষ্ট করিয়া সেই কৃষ্ণানুসন্ধানকার্যে ব্যাঘাত উৎপাদন করে। তজ্জন্য যাঁহারা বিঘ্নসমাকুল নহেন, তাঁহা-

দের সাহায্য ব্যতীত আমরা ত্রিগুনাতীত অপ্রাকৃত বস্তুর কোন সন্ধানই পাই না। আমাদের বর্ত্তমান ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞান পূর্ণতার উপলব্ধি করিতে দেয় না, আমাদিগকে নিত্যের পরিচয়, পূর্ণজ্ঞানের পরিচয়, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের পরিচয় হইতে পৃথক রাখে। এখানকার বস্তু-বিজ্ঞান জড়তা বা নির্বিশেষ-বিচারে আবদ্ধ। যে কিছু সবিশেষের কথা ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের সাহায্যে আমাদের অনুভবের বিষয় হয়, তাহা প্রাগুক্ত দোষ-চতুষ্টয়ের ভূমিকায় অবস্থিত। সেই দোষ হইতে মুক্ত হইতে হইলে ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতা-বাদের অকর্মণ্যতা স্বীকার করিতে হয়।

মনোধর্মজীবিগণ যে সকল ভাষায় স্বীয় ভাবের অভিব্যক্তি প্রদর্শন করেন, সেইগুলি ন্যূনাধিক বিপন্ন ও পরস্পর বিবদমান। তাৎকালিক অভিজ্ঞান বাস্তব অভিজ্ঞান হইতে পৃথক। বাস্তব অভিজ্ঞানের রাজ্যে অগ্রসর হইয়া বাস্তব বস্তুর প্রেমলাভ-চেষ্টাকেই "পরমার্থ" বলে। যাঁহারা লৌকিক অর্থশাস্ত্র-সমূহের আলোচনায় প্রবৃত্ত, তাঁহারাও লোকাতীত বাস্তব-বিজ্ঞানে আকৃষ্ট হইবার যোগ্য। সচ্চিদানন্দ আকর্ষক যাঁহাকে যে পরিমাণ আকর্ষণ করিয়াছেন বা আকৃষ্ট হইবার যোগ্যতা দিয়াছেন, আকর্ষনীয় আমরা সেই পরিমানে বাস্তব-বিজ্ঞানের অনুভূতি-লাভে যত্নবিশিষ্ট হইতে পারি। যাঁহারা লৌকিক-অর্থ-সংগ্রহ ব্যতীত পরম-ধর্ম, পরম-অর্থ, পরম-কাম, পরম-মোক্ষপদের দিকে যতদূর অগ্রসর হইবার অভিপ্রায় করেন, তাঁহাদের ভাষাসমূহ ততদূর চিন্ময় রাজ্যের দিকে অগ্রসর হইবে জানিয়া আমরা কতিপয় প্রশ্ন লইয়া সদুত্তর লাভের আশায় পারমার্থিক-রুচিসম্পন্ন জনগণের সমীপে উপনীত হইয়াছিলাম।

চিদচিন্মিশ্রভাবসম্পন্ন জীবগণের নিকট ভ্রমাদি দোষচতুষ্টয়-রহিত কৃষ্ণানুসন্ধানের কথা পাওয়া যাইতে পারে না জানিয়াও অন্বয় ও

ব্যতিরেকভাবে তত্ত্ববস্তুর জিজ্ঞাসার উপদেশ লাভ করাও আমাদের তাদৃশী প্রবৃত্তি। সুতরাং অন্বয় ও ব্যতিরেকমূলে আমাদের অভীষ্ট কৃষ্ণানুসন্ধান ন্যূনাধিক লাভ হইবে জানিয়া পারমার্থিকের সঙ্গ আমাদের লোভনীয় বিষয় হইয়াছিল। পরম-ধর্মের প্রতিকূল, পরম-অর্থের প্রতিকূল, পরম-কামের প্রতিকূল, পরম-মোক্ষের প্রতিকূল ভাব ও ভাষা-সমূহ আমাদের উদ্দেশ্য বিনাশ করিবার প্রয়াস করিবে জানিয়াও সেইরূপ প্রতিকূল সঙ্গ হইতে আমাদের প্রাপ্যাংশ গ্রহণ করিতে বাধা নাই, জানিয়াছিলাম। অসাত্বত পুরাণ, অসাত্বত পঞ্চরাত্র ও অসাত্বত দর্শনসমূহ, অসাত্বত ধর্মশাস্ত্র অর্থাৎ রাজস-তামস-বর্ণন-পূর্ণ বিভিন্ন উপদেশসমূহের মধ্যেও মঙ্গল-বিস্তৃতি ও অভদ্রনাশের যে সকল কথা সন্নিবিষ্ট আছে, তাহাও পূর্ব মহাজনগণ আলোচনা করিয়াছেন এবং অভীষ্টসিদ্ধিলাভেও তাঁহাদের কোনরূপ ব্যাঘাত হয় নাই জানিয়া আমরা আশ্বস্ত হইয়াছি।

কৃষ্ণানুসন্ধান

"কৃষ্ণানুসন্ধান' শব্দে আমরা দুইটী আলোচ্য ব্যাপার লক্ষ্য করি— "কৃষ্ণ" ও "অনুসন্ধান"। কৃষ্ণ-শব্দে আমরা ঐতিহ্যানুমোদিত বা ত্রিগুণ-ময়ী মানব-বুদ্ধির শব্দার্থ-বৃত্তির অজ্ঞরূঢ়ি গ্রহণ করিব না, পরন্তু বিদ্বদ্-রূঢ়িতে অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ববস্তুকেই জানিব। কৃষ্ণমায়াবৃত, কৃষ্ণ হইতে বিক্ষিপ্ত-কর্ণেতর অপর জড়েন্দ্রিয়গ্রাহ্য অক্ষজবস্তুবিশেষের দ্বারা কৃষ্ণ-শব্দকে কলঙ্কিত করিব না। ব্রাহ্মী, খরৌষ্টি, সানকি ও পুস্করাসাদি প্রভৃতি আকর ভাষাগুলি হইতে যাবতীয় ভাষাসমূহের যে-সকল বিভিন্ন শব্দদ্বারা মানবজাতি অভিধা-বৃত্তিতে ন্যূনাধিক উদাসীন হইয়া লক্ষণা-চালিত হইবার জন্য এবং ইতর ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের সমর্থনের আশায়

যে যত্ন করেন, সেরূপ শব্দ-দ্বারা কোন প্রকৃতিজাত দৃশ্য বস্তুকে লক্ষ্য করিবার বাসনা আমরা পরম-অর্থের প্রতিকূল বলিয়া জানিব। বিভিন্ন ভাষায় তত্ত্ববস্তুকে বিভিন্ন সংজ্ঞায় উদ্দেশ পূর্বক নানা প্রকারে প্রাকৃত বিচার তাহার সহিত সংযুক্ত করিয়া তত্ত্ববস্তুর যে-সকল সংজ্ঞা-লাভ হইয়াছে, সে সকল ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের অধীন, সুতরাং ত্রিগুণান্তর্গত মাত্র, কোনটীই অধোক্ষজ বস্তুর সমতা লাভ করিতে পারে না। কৃষ্ণ শব্দে যে তত্ত্ববস্তু উদ্দিষ্ট হয়, সেই বাস্তব সত্যটী তত্ত্ববস্তুর গৌণ-সংজ্ঞার সহিত 'এক' নহে।

কৃষ্ণ শব্দটী রূপকত্বকে লক্ষ্য-করিয়া প্রযুক্ত হয় না। অবিদ্বদ্রূঢ়ি-বৃত্তি পারমার্থিকের ভাষিত কৃষ্ণশব্দে আশ্রয় লাভ করিতে পারে না। যে সকল শব্দ চক্ষু, নাসা, জিহ্বা, ত্বক, ও মনের দ্বারা সঙ্কীর্ণতা লাভ করিয়া ব্রহ্মেতর, পরমাত্মেতর বা ভগবদিতর বস্তুকে লক্ষ্য করে, কৃষ্ণ-শব্দে সেরূপ অভিজ্ঞান উদ্দিষ্ট হয় নাই। 'অধোক্ষজ', 'অপ্রাকৃত' ও 'অতীন্দ্রিয়'প্রভৃতি শব্দ-সমূহ 'নেতি' ধারনায় প্রচারিত হওয়ায়, মানবের মনঃকল্পিত তুলিকায় চিত্রিত ব্যাপারগুলি বাস্তব-সত্য হইতে পার্থক্য লাভ করিবার অজ্ঞতা-শক্তি সংরক্ষণ করে। ভূতাকাশের মিশ্রভাব যে-শব্দকে বিপন্ন করে, সেই শব্দ বাস্তব বস্তু হইতে পৃথক হইয়া সাপেক্ষিকতা ও সংখ্যাগত ধারণায় বস্তুসমৃদ্ধিকারী। বৃহদারণ্যক কথিত পূর্ণের 'সঙ্কলন', 'ব্যবকলন', 'গুণন', 'বিভঞ্জন' প্রভৃতি ব্যাপার-সমূহ একত্বের বিনাশক নহে।

একায়ন পন্থার বিচার-বৈশিষ্ট্য

বিষয় ও আশ্রয়ভেদে বৈচিত্র্যসমূহ অবস্থিত ।নির্বিশিষ্ট-বিচারে যে বৈশিষ্ট্য মনোধর্মদ্বারা সমাধান লাভ করে, তদ্দ্বারা জড়ত্রিপুটীর

বিনাশ-সম্ভাবনা নাই। ভগবত্তত্ত্ববস্তু অদ্বয়জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়িত্বের ব্যাঘাত করে না। রৌদ্র ও ব্রাহ্মবিচার বৈষ্ণবতা হইতে যে জড়বৈষম্য প্রকাশ করে, উহা অদ্বয়জ্ঞানের ব্যাঘাত করে। সেই সকল কথা সুষ্ঠুভাবে চিত্ত-বৈক্লব্য-রহিত হইয়া আলোচনা না করিলে ধ্যেয়, ধ্যাতা ও ধ্যানে নানাপ্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হইবে। আবার বিঘ্ন-বিনাশের জন্য তাৎকালিক সাহায্যের প্রয়োজন লাভ করিতে গিয়া আবৃত-চেতনকে আশ্রয় করাও যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ তাহা হইলে স্বরমূর্ত্তির কালচক্রে ভ্রমণ-বিচার আমাদিগের কৈবল্যজ্ঞানে বাধা দিবে। 'কৃষ্ণ' শব্দের পরিচয় ত্রিগুণ-পরিচালিত কোন ভাষায় প্রদান করা সম্ভবপর নহে। অচিন্ত্য-ভেদাভেদ বিচারে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত দুর্বলা চিন্তা নাম নামীর—বাচক-বাচ্যের অচিন্ত্য বৈচিত্র্য বুঝিতে দিবে না।

অনুসন্ধান ও অনুশীলন

'অনুসন্ধান' শব্দটী যে-কাল পর্যন্ত 'অনুশীলন' শব্দের তাৎপর্যে নির্বিঘ্ন না হয়, তৎকালাবধি অনুসন্ধানের বস্তুটীও নানাপ্রকার কল্পনা-স্রোতে ভাসিয়া যায়। কিন্তু যখন বিষয়-বোধ হয় এবং অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি আপনাকে আশ্রিত বোধ করে, তখন আর 'অনুসন্ধান' ব্যাপারটী অদ্বয়জ্ঞান বাসুদেবকে পরিত্যাগ করে না। তখন অনুসন্ধান ব্যাপারটী আর অনুশীলনের সহিত পৃথক হয় না। অনুশীলনের মধ্যে সম্বন্ধজ্ঞান পরিস্ফুট, উহাই পরে 'অভিধেয় ভক্তি' নামে প্রসিদ্ধ হয়। ভক্তিই হরিপ্রেমের অনুসন্ধান দেয়, হরির পূর্ণানুশীলন, নিত্যানুশীলন ও কৈবল্যানুশীলন প্রেমাকেই কৈবল্যরূপে প্রয়োজন নির্ণয় করে।

বিদ্বদ্রূঢ়িতে কৈবল্য

অনুসন্ধানের পথে অনুসন্ধানকারীর স্বরূপ, অনুসন্ধানের স্বরূপ ও

অনুসম্বন্ধেয়ের স্বরূপ যাহাতে বাধা প্রাপ্ত হয় সেই সকল বিঘ্ন নাশ করিতে শব্দের বিদ্বদ্‌রূঢ়ি বৃত্তিই সমর্থ। সুতরাং শব্দের অবিদ্বদ্‌রূঢ়ির নশ্বর প্রকাশ বিদ্বদ্‌রূঢ়ি-বৃত্তিতে পর্যবসিত হইয়া জীবকে অদ্বয়জ্ঞান পরমসত্য বস্তু হইতে পৃথক হইতে দেয় না এবং চেতন কৈবল্যের ব্যভিচারের প্রশ্রয় দেয় না, পরন্তু কাল্পনিক চিন্মাত্রবাদের ভ্রান্তি সমূলে উৎপাটিত করে। শ্রীচৈতন্যদেব—বিষয়াশ্রয় কৈবল্যস্বরূপ, আর কৈবল্য-প্রকাশ নিত্যানন্দ—সেই অদ্বয়জ্ঞানেরই প্রকাশ-বৈচিত্র্য। এই চন্দ্র-সূর্যই জীবের চিন্ময় চক্ষুর চিন্ময় বৃত্তির প্রকাশক। কৈবল্যদায়িনী ভক্তিই কৃষ্ণপ্রেম প্রদায়িনী। কৈবল্যদায়িনী অদ্বয়জ্ঞানানন্দিনী শক্তি-দ্বয় শ্রীচৈতন্যেই অবস্থিত।

স্ফোটবিচারোত্থ বৈকুণ্ঠ বাণীর নিয়ামকত্ব

প্রপঞ্চে আমরা বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা যে-সকল প্রতিষ্ঠান রচনা করি, তন্মধ্যে বাগিন্দ্রিয়টী শব্দ শ্রবণের জনক, কিন্তু ঐ বাগিন্দ্রিয়টী শ্রৌতপথে সর্বতোভাবে অবস্থিত না হইলে ভাগবত-শ্রুতির বিরোধ আসিয়া অপর কর্মেন্দ্রিয়চতুষ্টয়কে বিপথগামী করায়। স্ফোটবিচারোত্থ বৈকুণ্ঠবাণী জীবের কর্ণবেধ সংস্কার করাইয়া যে আধ্যক্ষিকতা নিরসন করে, তাদ্দ্বারা শ্রৌতপথ আক্রান্ত হয় না। বীজগর্ভসমুদ্ভূত দেহে যে দশ সংস্কার মননধর্ম যোগে অনুষ্ঠিত হয়, তদ্দ্বারা আধ্যক্ষিক জ্ঞানই সুষ্ঠুতা লাভ করে; কিন্তু অধোক্ষজ অদ্বয়-জ্ঞানের প্রতি ঔদাসীন্য হলে পুনরায় প্রাপঞ্চিক বুদ্ধি-ক্রমে হরি-সম্বন্ধিবস্তু ত্যাগ পূর্বক বাস্তব-বস্তুর মায়াশক্তি জীবকে বিক্ষিপ্ত করিয়া চিদ্ বিম্বের প্রতিফলিত অচিৎ আধারে প্রতিবিম্বের প্রতিই অধিক আস্থা স্থাপন করায়।

আলোচনার প্রারম্ভে আমার এই সকল কথা বলিবার প্রয়োজনীয়তা আছে জানিলেও প্রাপঞ্চিক বিচারের ধারাকে বিপন্ন করিবার উদ্দেশ্য আমার নাই; পরন্তু উহাকে সম্পুষ্ট করিবার সদুদ্দেশ্যেই এই নৈবেদ্য সমর্পণ করিলাম। আপনাদের করুণা-প্রভাব-ধারা আমার ক্ষীণা দুর্বলা উক্তির উপর চিরদিনই বর্ষিত হয় জানিয়া ইহা বলিতে সাহসী হইলাম। আপনারা আশীর্বাদ করুন, যেন আমি অমানী, মানদ, তৃণাদপি সুনীচ ও তরোরপি সহিষ্ণু হইয়া নিত্যকাল শ্রীচৈতন্য-দাস্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া নাম নামীকে অভিন্নজ্ঞানে কীর্তন করিতে পারি, কাহারও নিকট অন্য কোন আশীর্বাদ আমার প্রার্থনীয় নয়।

[পারমার্থিক সম্মিলনীতে শ্রীল প্রভুপাদের দ্বিতীয় ভাষণ]

আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রণত হই। গতকল্য আমাদের প্রারম্ভিক কতকগুলি কথা বলবার সুযোগ হয়েছিল; কিন্তু সেদিন বাস্তবিক কোন প্রস্তাবিত বিষয়ের কথা বলা হয় নি। সুতরাং আমরা একদিন পিছিয়ে পড়েছি। এই আলোচনার উদ্দেশ্য যে, আমরা কিছু ভাল কথা জানতে পারব। যাঁরা এ বিষয়ে অনুরাগবিশিষ্ট বা এ বিষয়ে নিপুণতা লাভ করেছেন, তাঁদের কাছ থেকে আমরা কিছু কথা শুনতে চেয়েছিলাম।

গুরুদেবতাত্মা সেবকের বিচার

আমরা যখন গুরুপাদপদ্মের বিক্রীত পশুবিশেষ, তখন আমরা কেন অপরের কথাগুলি শুনতে চাই, এ সম্বন্ধে কেহ কেহ প্রশ্ন করতে পারেন। এতৎসম্বন্ধে আমি গতকল্য কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করেছি। অসাত্বত শাস্ত্র হতেও সাত্বতগণ যেমন তাঁদের বাক্যের দৃঢ়তা স্থাপনের জন্য অনেক অনুকূল বিষয় উদ্ধার করেন অথবা ব্যতিরেকভাবে তার

আলোচনা করেন, তেমনি আমরাও অপরের কাছ থেকে অনেক কথা শুনে শ্রৌত বাস্তব সত্যে অধিকতর দৃঢ়তা লাভ করতে পারি। আমরা ভাগ্যদোষে আধ্যক্ষিক জ্ঞানিগণের অনেক কথা না শুনে থাকতে পারি, কিন্তু তাঁদের সে সকল কথা শুনে হয় ত আমাদের বাক্যের আরও সুদৃঢ়তা হতে পারে। তাঁদের নিকট হতে কিছু শুনে আমি অভিজ্ঞতাবাদের পণ্ডিত হয়ে যাব, এরূপ দুরাশা রাখি না। জাগতিক পাণ্ডিত্য লাভের জন্য বৃথা চেষ্টা আমার নেই। যদি প্রাপঞ্চিক কথায় পাণ্ডিত্যের আবশ্যক হয়, তা হলে সেই ব্যাপারে তাঁ'দিগের উপরই ভার দেওয়া যেতে পারে। আমরা গুরুপাদপদ্মে শুনেছি,—

'লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে।
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্যা ভক্তিমিচ্ছতা ॥'

আমরা যখন ভগবদ্ভক্তের সেবক—আমরা যখন কর্মি-জ্ঞানিগণের সেবক নই—আমরা যখন হরিজনগণের পাদুকাবহনকারী, তখন অন্যা-ভিলাষী, কর্মী, জ্ঞানি-সম্প্রদায়ের সহিত আমাদের কোন বিরোধ নেই—জয় পরাজয়েরও কোন কথা নেই। তবে আমাদের আবশ্যক পরমার্থ বিষয়ে যদি কেহ আমাদিগকে সন্ধান দেন, তাঁদের ভাবের দ্বারা, ভাষার দ্বারা যদি আমাদের কিছু আনুকূল্য করতে পারেন, তজ্জন্যই তাঁদের নিকট কতকগুলি প্রশ্ন দেওয়া হয়েছিল ; কিন্তু প্রশ্নের ভাষাগুলিও তাঁরা বুঝতে পারেন নি। আমরা কি উদ্দেশ্যে কি প্রশ্ন করেছি অধিকাংশ স্থলেই তাঁরা তা বুঝতে পারেন নি। অনেক স্থলেই তাঁদের কার্যে যে কথার আবশ্যক হয়, তা আমাদের কার্যে আসে নি। কেহ কেহ প্রশ্নের উত্তর দিতে না পেরে নানা

প্রকারে তাঁদের দুর্বলতা প্রকাশ করে ফেলেছেন। আমরা সে-সকল কথায় বাধির্য্য লাভ করেছি।

মুক্ত ও বদ্ধের অভিলাষ-তারতম্য

কতকগুলি লোক কর্মবীরত্বের জন্য যত্ন করেছিল—কতকগুলি লোক অন্যাভিলাষের জন্য যত্ন করেছিল—কতকগুলি লোক ব্রহ্মানুসন্ধানের জন্য যত্ন করেছিল—কতকগুলি লোক কৈবল্যসিদ্ধির জন্য যত্ন করেছিল; কিন্তু আমরা জানি ধর্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষের উপাসনা ছলনা মাত্র অর্থাৎ সে সকল কেবল আমার অপস্বার্থপরতার সহিত সংশ্লিষ্ট; তা মুক্ত আত্মার কথা নয়, Liberated soul এর কথা নয়, Conditioned soul (বদ্ধজীব) এর প্রলাপ মাত্র। শ্রীগৌরসুন্দর একদিন ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ করতে করতে উপদেশ করেছিলেন,—

'যা'রে দেখ, তা'রে কহ কৃষ্ণ উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ॥'

আমাদের তখন প্রশ্ন হয়েছিল, আমরা যদি নিজেরা সিদ্ধ না হই, তা হলে কিরূপে পরমার্থ আলোচনা করবো?

তখন শ্রীগৌরসুন্দর বলেছিলেন,—

'ইহাতে না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ॥'

ভগবদ্‌বস্তুর জন্য যত্ন কর, যেখানে বসে আছ, সেখান থেকেই যত্ন কর। যে যে-দেশে, যে-কালে, যে-পাত্রে থাক না কেন, ভগবদ্‌বস্তুর জন্য যত্ন কর। শ্রীচৈতন্যআজ্ঞা পালন করতে হলে শ্রীগুরুপাদপদ্ম হতে যে সকল কথা শুনেছি, সেই সকল কথা আলোচনা ছাড়া আর উপায় নেই। ভগবৎসেবকের একমাত্র কার্য হচ্ছে, যাতে ভগবৎকার্য করবার কৌশল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। কৃষ্ণে আমাদের মতি

উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হউক, ইহাই আমাদের প্রার্থনীয়। আমরা ধন, জন কিছুই চাই না—জন্মান্তর-রহিত হতে চাই না। জগতে অন্যাভিলাষের বশীভূত হয়ে ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের প্রার্থী হয়ে নানা লোকে নানা প্রকার দেবতার আরাধনা করে থাকেন। কিন্তু আমরা যখন মহাদেবের নিকট উপস্থিত হই, তখন বলি—

'ব�ৃন্দাবনাবনীপতে জয় সোম সোম-
মৌলে সনন্দন-সনাতন-নারদেড্য।
গোপেশ্বর ব্রজবিলাসিযুগাঙ্ঘ্রিপদ্মে
প্রীতিং প্রযচ্ছ নিতরাং নিরুপাধিকাং মে ॥'

যখন কাত্যায়নীর নিকট উপস্থিত হই, তখন বলি,—

'কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরুতে নমঃ ॥'

ব্যাধি নিরাময় হউক কিম্বা রোগ, রোগী উভয়েই একেবারে বিনষ্ট হয়ে মুক্তি লাভ করুক, এরূপ প্রার্থনা আমরা করি না। আমরা তাঁদের নিকট উপস্থিত হয়ে বলি,—'কৃষ্ণে মতি হউক' আপনারা এইরূপ আশীর্বাদ করুন। জগতের লোকে কৃষ্ণেতর বিষয়ে বিষয়ী হবার জন্য প্রার্থনা করে থাকেন; কিন্তু আমাদের গুরুপাদপদ্ম উপদেশ করেন,—বিষয় একমাত্র কৃষ্ণ। অনাত্ম-প্রতীতিবশে যদি আমাদের কৃষ্ণানুসন্ধানের কোন ব্যাঘাত হয়ে থাকে, তা হলে সেই ব্যাঘাতের হস্ত হতে উদ্ধার লাভের জন্য আলোচনা হউক, এজন্যই আমাদের প্রশ্ন। অপরের পকেটে হাত দেওয়া—অপরের অসুবিধা করা—এরূপ নীচ প্রবৃত্তি আমাদের নেই। যাঁরা কাম-ক্রোধের সেবায় রুচিসম্পন্ন, তাঁরা অন্যরূপ বিচার করতে পারেন; কিন্তু আমরা আমাদের পূর্ব-গুরু শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের নিকট হতে শ্রবণ করেছি—

'কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা-
স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে ॥'

আমরা ভিক্ষুক, তা বলে আমরা ইন্দ্রিয়ভোগ্য কামনার ভিক্ষুক নই। আমাদের ভিক্ষা ছিল—সকল সাধু-সম্প্রদায় চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা বিচার করুন, তা হলে পরম চমৎকৃত হবেন। আমাদের ভিক্ষা,—

'দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরা-
চ্চৈতন্যচন্দ্র-চরণে কুরুতানুরাগম্ ॥'

শ্রীচৈতন্যদেব ও সঙ্গবিচার

শ্রীচৈতন্যদেব যে বিশেষ কথা বলেছেন—মানবের বাসনা হতে মুক্ত হবার সরল পথ বলেছেন, তা আর কিছু নয়,—ভগবদ্ভক্তি আশ্রয় করা। তিনি বলেছেন,—

'নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু ॥'

বিষ খেয়ে মরে যাওয়া ভাল, তথাপি কৃষ্ণেতর বিষয়ী ও বিষয়ের সঙ্গ করা কর্তব্য নয়। হরিভজন আরম্ভ করে যে ব্যক্তি বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে, তার সর্বনাশ হয়ে গেল। ভরত—যিনি ভারতবর্ষের রাজা হয়েছিলেন, তিনি পূর্বে অনেক সাধনা, তপস্যা করেছিলেন—হরিভজনের পথে অগ্রসর হয়েছিলেন; কিন্তু তাঁরও

সামান্য একটু কৃষ্ণেতর বিষয়ের অভিলাষ—একটু সৎকর্মী হওয়ার ইচ্ছা—জীবে দয়ার পরিবর্তে জীব সেবা (?) করবার একটু সামান্য স্পৃহা উদিত হওয়ায় তাঁকে হরিণ-শিশু হয়ে জন্ম লাভ করতে হয়েছিল। তাই আমাদের গুরুপাদপদ্ম আদেশ করেন—কৃষ্ণসেবা ব্যতীত আমাদের আর কোন কর্তব্য নেই—'কৃষ্ণে মতিরস্তু'ই একমাত্র আশীর্বাদ।

ললিতপুরের দারী সন্ন্যাসী

শ্রীগৌরসুন্দর যখন অদ্বৈতাচার্য প্রভুর অদ্বৈতবাদ গ্রহণ-লীলা খণ্ডন করবার জন্য শ্রীমায়াপুর হতে নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে ললিতপুর হয়ে শান্তিপুরে যাচ্ছিলেন, তখন ললিতপুরে একজন দারী সন্ন্যাসীর সহিত তাঁদের সাক্ষাৎ হয়। লীলাময় প্রভুদ্বয় কোন এক উদ্দেশ্যে সেই দারী সন্ন্যাসীর দ্বারস্থ হলে উক্ত সন্ন্যাসী শ্রীমহাপ্রভুকে বালক বিচারে আশীর্বাদ করে বলেন,—

'ধন, বংশ, সুবিবাহ হউক বিদ্যালাভ।'

মাহাপ্রভু সন্ন্যাসীর এই আশীর্বাদ শ্রবণ করে বলেন, ইহা আশীর্বাদ নয়,—অভিশাপ। 'কৃষ্ণের প্রসাদ লাভ হউক' এইরূপ আশীর্বাদই প্রকৃত আশীর্বাদ। দারী সন্ন্যাসী এই কথা শুনে মহাপ্রভুকে বললেন—"আমি পূর্বে যা শুনেছি, আজ প্রত্যক্ষ তার নিদর্শন পেলাম। আজকাল লোককে ভাল বললে লোক তাকে ঠেঙ্গা নিয়ে মারতে যায়। এই ব্রাহ্মণ-কুমারেরও সেরূপ আচরণ দেখছি। কোথায় আমি পরম সন্তোষে একে ধনে জনে লক্ষ্মীলাভ হক বর দিলাম—এর উপকার করতে গেলাম, আর এই ব্যক্তি সেই উপকারকে অপকার ভেবে আমাকে দোষারোপ করতে উদ্যত হলো!" নিত্যানন্দ প্রভু তখন একটু প্রবীণ ও অভিভাবকের ন্যায় ভাব প্রদর্শন করে দারী সন্ন্যাসীকে বলতে লাগলেন,—"আপনার এই বালকের সঙ্গে বিচার

করা কার্য নয়, আমি আপনার মহিমা বুঝতে পেরেছি। আমার দিকে চেয়ে এর কোন দোষ নেবেন না।" নিত্যানন্দ প্রভুর কথায় সন্তুষ্ট হয়ে দারী সন্ন্যাসী নিত্যানন্দ প্রভুকে কিছু ভোজন করাতে চাইলেন। পতিতপাবন নিত্যানন্দ ও মহাপ্রভু গঙ্গায় স্নান করে সন্ন্যাসীর গৃহে ফলাহার করতে লাগলেন। এমন সময় সেই দারী সন্ন্যাসী নিত্যানন্দ প্রভুকে 'আনন্দ' গ্রহণের জন্য পুনঃপুনঃ ইঙ্গিত করতে লাগলেন। দারী সন্ন্যাসীর পত্নী ভোজনকালে অতিথিগণকে ঐরূপ বিরক্ত করতে নিষেধ করলেন। মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুকে জিজ্ঞাসা করলেন,—সন্ন্যাসী 'আনন্দ' শব্দে কি লক্ষ্য করছে? নিত্যানন্দ প্রভু সকল প্রকার ব্যক্তির আচরণই অবগত ছিলেন। তিনি গৌরসুন্দরকে জানালেন,—'আনন্দ' শব্দ দ্বারা দারী সন্ন্যাসী 'সুরা' লক্ষ্য করছে। এই কথা শুনবামাত্র বিশ্বম্ভর "বিষ্ণু বিষ্ণু" স্মরণ করে তৎক্ষণাৎ আহার পরিত্যাগ পূর্বক আচমন করলেন এবং অতি সত্বর নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত গঙ্গায় গিয়ে ঝাঁপ দিলেন। এই লীলা দ্বারা মহাপ্রভু দুঃসঙ্গ-বর্জনের শিক্ষা দিলেন এবং আরও জানালেন,—

'স্ত্রৈণ ও মদ্যপে প্রভু অনুগ্রহ করে।
নিন্দক বেদান্তী যদি, তথাপি সংহারে॥
সন্ন্যাসী হৈয়া মদ্য পিয়ে, স্ত্রী-সঙ্গ আচরে।
তথাপি ঠাকুর গেলা তাহার মন্দিরে॥
না হয় এজন্মে ভাল, হৈব আর জন্মে।
সবে নিন্দকের নাহি বাসে ভাল মর্মে॥
দেখা নাহি পায় যত অভক্ত সন্ন্যাসী।
তার সাক্ষী যতেক সন্ন্যাসী কাশীবাসী॥'

ভুক্তিকামী অপেক্ষা মুক্তিকামী নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধিৎসু অধিকতর কপট

বলে শ্রীমন্মহাপ্রভু মঙ্গলেচ্ছুকে তাদের সঙ্গ সর্বতোভাবে পরিবর্জন করবার উপদেশ দিয়েছেন। উর্বশী তার অপস্বার্থ-সিদ্ধির সময় অতিক্রান্ত দেখে যখন চন্দ্রবংশীয় পুরূরবা বা ঐলকে পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছিল, তখন ঐল উর্বশীর নিষ্ঠুরতা উপলব্ধি করে নির্বেদ লাভ করলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলেছিলেন,—

অসৎসঙ্গ বর্জনপূর্বক সাধুসঙ্গ কর্তব্য

'ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥'

সাধুগণের একমাত্র কর্তব্য—জীবের যে সকল সঞ্চিত দুষ্টবুদ্ধি আছে, তা ছেদন করে দেওয়া; ইহাই সাধুদিগের অকৃত্রিম অহৈতুকী বাঞ্ছা। দ্বিহৃদয়তা প্রকাশ করে জগতের লোক বাহিরের দিকে একরকম কথা, ভিতরের দিকে অন্য রকম কথা পোষণ করে; আর এই দ্বিহৃদয়তাকেই উদারতা বা সমন্বয়ের ধর্ম বলে প্রচার করতে চায়! যাঁরা দ্বিহৃদয়তা প্রকাশ না করে সরল হতে চান—সরলভাবে আত্মার বৃত্তি যাজন করতে চান, তাঁদিকে ঐ সকল দ্বিজিহ্ব ব্যক্তি 'সাম্প্রদায়িক', 'গোঁড়া' প্রভৃতি বলে থাকেন। যাঁরা সরল, আমরা তাঁদেরই সঙ্গ করব—অপরের সঙ্গ করব না। দুঃসঙ্গকে আমাদের সর্বতোভাবে পরিবর্জন করতে হবে যেমন শৃঙ্গীর নিকট হতে শত হস্ত পরিমাণ দূরে থাকতে হয়।

এক সময়ে ঠাকুর মহাশয়—যিনি পূর্ব পরিচয়ে উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ-কুলে আবির্ভূত হবার লীলা প্রকাশ করেছিলেন, বহু বহু ভাল লোক—আভিজাত্যসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট সত্য কথা বলেছিলেন, তাঁকেও অসদ্-ব্যক্তিগণের আক্রমণের পাত্র হতে হয়েছিল। মৎসর-প্রকৃতির

আধ্যক্ষিক কতকগুলি অবিচারক লোক বলতে লাগল, নরোত্তম ঠাকুর কায়স্থকুলে জন্মগ্রহণ করে কেন ব্রাহ্মণ-সন্তানগণকে পারমার্থিক উপদেশ দিয়ে শিষ্য করছেন? এই কথা শুনে ঠাকুর মহাশয় বল্লেন,—তা হলে আমি সম্পূর্ণ নিবৃত্ত হব। ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ও শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী বল্লেন,—তা হলে জগৎ ত রসাতলে যাবে—জগতে নাস্তিক, পাষণ্ডের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে! এই বলে তখন তাঁরা একজন সাজলেন—বারুই, আর একজন সাজলেন—কুমোর। যখন বিদ্বেষি-সম্প্রদায়ের গর্বিত পণ্ডিতমণ্ডলী ঠাকুর মহাশয়কে বিচারে পরাস্ত করবার মতলব নিয়ে খেতুরীতে এসে পৌছলেন, তখন তাঁরা তাঁদের আহারের বন্দোবস্তের জন্য বাজারে হাঁড়ী কিনতে কুমোরের দোকানে গেলেন। তখন কুমোর তাঁদের সঙ্গে সংস্কৃতে কথাবার্তা আরম্ভ করে দিলেন। তারপর তাঁরা পান কিনতে পানের দোকানে গেলেন, বারুইও পণ্ডিতের সঙ্গে সংস্কৃত ভাষায় কথা আরম্ভ করলেন। এ সকল দেখে শুনে গর্বিত পণ্ডিতগণ মনে মনে বিচার করলেন—যে দেশের কুমোর বারুই পর্যন্ত সংস্কৃতে কথা বলতে পারেন, সে-দেশের সর্বপ্রধান ব্যক্তি ঠাকুর নরোত্তম যে কত বড় পণ্ডিত, তা অনুমানও করা যেতে পারে না, সুতরাং তাঁর কাছ পর্যন্ত গিয়ে আমাদিগের সম্মান লাঘব করবার পরিবর্তে আমাদের এখান থেকেই বিদায় নেওয়া শ্রেয়। এরূপ বিচার করে তাঁরা সেখান থেকে সরে পড়লেন। যাঁরা সত্য আশ্রয় করেন, তাঁহাদিগকে চিরকালই এরূপভাবে আক্রান্ত হতে হয়।

সাধারণ বিবেকরহিত বিচার বা সাধারণ বিবেকযুক্ত বিচার ও সত্য এক নয়। অনেকে সাধারণ বুদ্ধিকে (Common senseকে) 'সত্য' মনে করেন। যেটা Common sense এর সঙ্গে খাপ খায় না,

তাকে তাঁরা সত্যের পদ হতে বিচ্যুত করতে চান। কিন্তু এরূপ সাধারণ বুদ্ধি—কাদের ? ভ্রম-প্রমাদ-করণাপাটব-বিপ্রলিপ্সা-বিনির্মুক্ত, বিমুক্ত আত্মার সহজ বুদ্ধি অথবা ভ্রম-প্রমাদাদিযুক্ত, পরিবর্তনশীল মনের অভিজ্ঞতাবাদোত্থ সাধারণ বুদ্ধি ? ভ্রম-প্রমাদযুক্ত গড্ডলিকার সাধারণ বুদ্ধি—মনোধর্ম মাত্র, তাতে আপেক্ষিক বা সাময়িক সত্যের একটা ছবি থাকতে পারে, কিন্তু উহা বাস্তব সত্য নহে। লোকের রজস্তম-তাড়িত-বুদ্ধি অবিমিশ্র সত্ত্বগুণের কথা বুঝতে পারে না। একজন পায়স খাচ্ছে, আর একজন যদি সেখানে এসে বলে যে, আমার কিছু চূণ সুরকি আছে, আপনি সেগুলি পরমান্নের মধ্যে মিশিয়ে পায়সের পূর্ণতা সম্পাদন করে নিন ; তাহলে যেমন মিষ্টান্ন খাওয়ার ফল পাওয়া যায় না, উহার আস্বাদন নষ্ট হয়ে যায়, মুখে কাঁকর চূণ প্রভৃতি লেগে গলা পুড়িয়ে দেয়, গলা বন্ধ করে দেয়, তাতে মানুষের মৃত্যু হয়, সেরূপ পরমনিরপেক্ষা স্বতন্ত্রা, বিশুদ্ধা, নির্গুণা ভক্তির সহিত গুণজাত জগতের অন্যাভিলাষ, কর্ম, জ্ঞান, যোগাদি চেষ্টাকে যদি কেহ মিশিয়ে নিতে বলেন—ভক্তির অসম্পূর্ণতা (?) সম্পূর্ণ করবার পরামর্শ দেন, তাহলে ঐরূপ ব্যক্তির পরামর্শও মিষ্টান্নে বিজাতীয় চূণ সুরকি মিশ্রিত করবার পরামর্শের ন্যায় হয়। কর্ম, জ্ঞান, যোগ—বদ্ধ জীবের চেষ্টা, উহা দেহ ও মনোধর্ম, আর ভক্তি—আত্মার বৃত্তি বা আত্মধর্ম, উহা পরম মুক্তের চেষ্টা ; সুতরাং কর্মজ্ঞানাদি প্রাপঞ্চিক বিজাতীয় অনাত্ম-চেষ্টা-সম্পন্ন বস্তুর সহিত ভক্তির মিশ্রণ হতে পারে না। তবে কর্ম-জ্ঞানাদি যখন ভক্তির অধীনতা স্বীকার করে চলে, তখন কথঞ্চিদ্‌ভাবে সেই কর্ম-মিশ্রা ও জ্ঞান মিশ্রা ভক্তি পরভক্তির পথে উপনীত হবার আনুকূল্য করতে পারে। পরা ভক্তি লাভ হলে মিশ্রভাব আর থাকে না, ইহাই এই শ্লোকে কথিত হয়েছে।

'স্বরর্থে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া।
সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা যয়া ভক্তিঃ পরা ভবেৎ ॥'

আমরা এরূপ বিচারেই মনীষী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণের নিকট কতকগুলি প্রশ্ন দিয়েছিলাম আমরা হাটে, বাজারে, যাকে তাকে প্রশ্ন দেই নি বা ক্ষীরের সঙ্গে 'রাবিস' মিশাবার অভিলাষ নিয়েও আমরা প্রশ্ন পাঠাই নি। অবিমিশ্র সত্য—অকৈতব সত্য জগতে প্রকাশিত হউক, এইরূপ অভিলাষ নিয়েই আমরা কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর চেয়েছিলাম, কিন্তু কাম, ক্রোধ, লোভের বশীভূত হয়ে কতকগুলি ব্যক্তি এরূপ শিষ্টাচার-বহির্ভূত ব্যবহার প্রদর্শন করেছেন যে, তাঁদের ব্যবহারেই তাঁরা তাঁদের স্বরূপের বিজ্ঞাপন প্রচার করে ফেলেছেন। আমরা কর্মাবলম্বীর সঙ্গ করতে প্রস্তুত হই নি, যারা বহির্জগতের অভিজ্ঞতাবাদ বা মনোধর্মকে নিয়ে অভ্যুদয়ের হিমালয়ে আরোহণ করতে চায়, আমরা তাদৃশ আরোহবাদী আধ্যক্ষিকের সঙ্গ করবার জন্য প্রস্তুত হই নি, "প্রতীপ জনেরে আসিতে না দিব, রাখিব গড়ের পারে"—ইহাই আমাদের গুরুদেবের উপদেশ। উদরোপস্থ-বেগ-সম্পন্ন ব্যক্তিকে আমরা চাই নি, তাঁরা বাস্তবিক অকৃত্রিম অনুসন্ধিৎসু নন; দ্বিজিহ্ব লোক—যাদের বাইরে এক প্রকারের জিভ, ভিতরে আর এক প্রকারের জিভ, সে শ্রেণীর লোক নিয়ে আমাদের কি প্রয়োজন হবে? নিত্য আত্মার উপলব্ধি যাঁদের হয়েছে—ভগবানের সেবক-সম্প্রদায় যাঁরা, তাঁরা যে ধর্মাবলম্বীই হউন না কেন, তাঁদের কাছ থেকে আমরা প্রশ্নের উত্তর পেতে পারবো। আমাদের গুরুপাদপদ্ম যে কথা জানিয়ে দিয়েছেন, দ্বিজিহ্ব লোক তা শুনবে না—তারা কখনও সেবোন্মুখ কর্ণ দিবে না। আমাদের প্রশ্নগুলি বাইরের লোকে বুঝতে পারেন নি—শ্রীমদ্ভাগবতের

ন্যায় ভাগবত-জীবন যাঁদের হয় নি, তাঁরা বুঝতে পারেন নি। সেই জন্য ভাগবত বলেন,—

'ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥'

আমরা যে সকল কথা সাধুকে জানতে দিই না—গোপনে যে সকল কথা রেখে দিই, প্রকৃত সাধু সে সকল কথা আমাদের অন্তর থেকে বের করে তার উপর অস্ত্র প্রয়োগ করেন। 'সাধু' মানেই হচ্ছে,—তিনি একটা খড়্গ হাতে নিয়ে যুপকাষ্ঠের নিকট দণ্ডায়মান রয়েছেন—মানুষের যে ছাগের ন্যায় বাসনা, সেই বাসনাকে বলি দিবার জন্য দণ্ডায়মান আছেন, পরুষ-ভাষারূপ তীক্ষ্ণ খড়্গের দ্বারা। সাধু যদি আমার তোষামুদে হন, তা হলে তিনি আমার অমঙ্গলকারী—আমার শত্রু। তা হলে আমরা প্রেয় পন্থা গ্রহণ করলাম, শ্রেয় চাইলাম না।

ভাগবতের শ্রীমুখে ভাগবত শ্রবণীয়

ভাগবত-জীবন যার নয়, তার কাছে ভাগবত শোনা উচিত নয়। নিজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গ করাই কর্তব্য।

'সাধুসঙ্গঃ স্বতো বরে'।

ভাগবত-জীবন কার?—

'ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥'

'কৃষ্ণে মতি হউক'—এরূপ আশীর্বাদই সাধুগণ করে থাকেন। "কৃষ্ণে মতি নষ্ট হয়ে কৃষ্ণেতর বস্তুর প্রভু হউক"—জীবের প্রতি এরূপ আশীর্বাদ সাধুর আশীর্বাদ নয়।

'কৃষ্ণ' শব্দ ব্যতীত অন্যত্র 'ভক্তি' শব্দ প্রযোজ্য হতে পারে না। কৃষ্ণই একমাত্র ভক্তির বিষয়। ব্রহ্ম—জ্ঞানের বস্তু, পরমাত্মা—সান্নিধ্যের বস্তু, কিন্তু কৃষ্ণই একমাত্র সেব্য বস্তু। আমরা পরবর্তিকালে আমাদের আলোচনার সময়ে দেখাব, কি করে কৃষ্ণই একমাত্র সেব্য হতে পারেন।

আমাদের প্রথম দিবসের আলোচনার বিষয়—চিদচিদ্‌বিশ্লেষণ-মুখে জ্ঞান লাভের আকর, চিদচিদ্‌বিশ্লেষণমুখে জ্ঞানলাভের যন্ত্র, চিদচিদ্‌-বিশ্লেষণমুখে জ্ঞানলাভের সিদ্ধান্ত, চিদচিদ্‌বিশ্লেষণমুখে জ্ঞানলাভের সঙ্গতি এবং চিদচিদ্‌বিশ্লেষণমুখে জ্ঞানলাভের ধারণা। 'চিৎ' শব্দটীর মোটামুটি অর্থ হচ্ছে—জ্ঞান। জ্ঞান—কর্তৃত্ব-ধর্মযুক্ত। শ্রীচৈতন্যদেবের ভাষায় আমরা জানতে পারি,—

'অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।'

সকল শব্দের বিদ্বদ্‌রূঢ়ি ও মুক্তপ্রগ্রহ বৃত্তিতে শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্বরূপে নির্ণীত হয়েছেন।

সম্বিৎশক্তিমদধিষ্ঠিত বিগ্রহই—কৃষ্ণচন্দ্র। এই জ্ঞানলাভের আকর তিন প্রকার,—চেতনাকর, চিদচিন্মিশ্রাকর ও অচিৎ আকর। প্রত্যক্ষ-বাদী বলেন, অচিৎ হতেই চিৎ বা জ্ঞানের উৎপত্তি, ইঁহারা অচিন্মাত্র-বাদী। এরূপ বিচারে যে বৃত্তির উদয় হয়, তার নাম—তর্ক। অচিৎ হতে যাঁরা চেতনকে জন্ম গ্রহণ করাতে চান, সেই চেতনটাকে ক্রমশঃ কিরূপে neutralise করা যায়, কিরূপে efarvise করান যায়, তা তাঁদের পরবর্তিকালের বিচার্য বিষয় হয়। তাঁরা তপস্যার দ্বারা ক্রমশঃ তাঁদের সাময়িক চেতনতাটাকে অচেতনে পরিণত করতে চান। প্রচুর পরিমাণে কর্ম করতে করতে অত্যন্ত ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়লে ঐরূপ অনুভূতিরহিত অচিৎ হবার স্পৃহা বা নির্বাণ মুক্তির জন্য লালসা

উপস্থিত হয়। 'দানশীল হওয়া ভাল—লোকের সেবা-শুশ্রূষা করা ভাল—মানুষ যখন অচিদ্ রাজ্যে নিষ্পেষিত হয়, তখন সাময়িক উপশম দিবার জন্য ঐরূপ ধারণা আমাদের প্রমাকে প্রলুব্ধ করে।

বহির্জগতের আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়ে আমরা সৎকর্মী হই, পুণ্যবান্ হই, ধার্মিক হই, নৈতিক হই, কখনও বা অসৎকর্মী, পাপী, অধার্মিক, অনৈতিক হয়ে পড়ি। বহির্জগতের আক্রমণের দ্বারা আমরা ঐরূপ-ভাবে চালিত হয়ে থাকি।

সূক্ষ্মেতে স্থূলতা নেই, কিন্তু সূক্ষ্ম স্থূল হতে জন্মগ্রহণ করেছে। বহির্জগতের স্থূল বস্তু হতে ভাব আকর্ষণ করে সূক্ষ্মতা প্রকাশিত হচ্ছে। এই সূক্ষ্মভাবের জনক—স্থূল বিষয়।

এই জগতে চেতন বৃত্তির সহিত অচেতন-বৃত্তি ন্যূনাধিক সংশ্লিষ্ট হয়েছে। অচিদ্রাজ্য হতে মন ও বুদ্ধি জ্ঞান-সংগ্রহে নিযুক্ত রয়েছে। যেখানে পরমাণুবাদী বা জড়শক্তির অচিৎ-এর কথা নেই—যেখানে কোন প্রকার অচেতনের কথা নেই, সেখানে কেবল চিৎ। কেহ কেহ বলেন, কেবল চেতনে নিঃশক্তিক অনুভূতি থাকবে। আধ্যক্ষিকজ্ঞানী জগতে যে জড়শক্তির তিক্ত অনুভূতি পেয়েছিল, তা হতে পালাবার জন্য যখন যত্ন হয়, তখনই আমাদের প্রাপ্য চেতনকে নিঃশক্তিক করবার জন্য একটা চেষ্টার উপায় হয়ে থাকে। যাকে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের ভাষায় 'বহিরঙ্গা শক্তি' বলে, সেই বহিরঙ্গা শক্তিরহিত বস্তুকে নির্ভেদজ্ঞানিগণ 'ব্রহ্ম' বলতে চান। তাঁরা Radio activity, Molecular theory হতে যে শক্তির পরিচয় পেয়েছেন—চিদচিন্মিশ্র জগৎ হতে যে শক্তির পরিচয় পেয়েছেন সেই শক্তিকে নিরাস করে ব্রহ্মের কল্পনা করেন। কিন্তু যাঁরা বৃহৎএর সমগ্রতা দেখতে পান, তাঁরা 'ব্রহ্ম' শব্দে ভগবান্‌কেই জানেন। শ্রীচৈতন্যদেবের ভাষায় বলতে গেলে,—

'ব্রহ্ম' শব্দে মুখ্য অর্থে কহে 'ভগবান্'।

সাঙ্কর্ষণ-সূত্র 'ব্রহ্ম' শব্দের দ্বারা বিষ্ণুকে লক্ষ্য করেন। ভাগবতের শেষে (ভাঃ ১২।১৩।১২) আমরা একটী শ্লোক দেখতে পাই,—

সর্ববেদান্তসারং যদ্ব্রহ্মাত্মৈকত্ব লক্ষণম্।
বস্ত্বদ্বিতীয়ং তন্নিষ্ঠং কৈবল্যৈকপ্রয়োজনম্ ॥ (১)

শব্দ মাত্রেরই দ্বিবিধ বৃত্তি—বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তি ও অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তি। যে যে শব্দের বৃত্তি কৃষ্ণ, বিষ্ণু, শ্রীচৈতন্যদেব হতে তফাৎ হয়ে অন্য কিছু উদ্দেশ করে, তা—শব্দের অবিদ্বদ্রূঢ়ি। বিদ্বদ্রূঢ়ি বৃত্তিতে সকল কথাই কৃষ্ণবাচক—কৃষ্ণোদ্দেশক। যে-সকল শব্দ আমাদের ভৃত্যগিরি করে—আমাদের ভোগের কাজ চালিয়ে দেয়, সেই সকল ভোগসাধক শব্দ ভগবদ্বস্তু হতে পৃথক্ হয়ে অবিদ্বদ্রূঢ়ি বৃত্তি প্রকাশ করে থাকে। 'কৃষ্ণ' শব্দে যে তত্ত্ববস্তু উদিষ্ট হয়—গুণজাত জগতে 'কৃষ্ণ' শব্দের যে ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয়—'কৃষ্ণ' শব্দ দ্বারা গণগড্ডলিকা যা' বুঝেন, তা কৃষ্ণ শব্দের উদ্দিষ্ট বিষয় নয়। ভাষান্তরে 'গড', 'আল্লা' প্রভৃতি শব্দ, এমন কি, সংস্কৃত ভাষায় 'ঈশ্বর' 'পরমাত্মা প্রভৃতি শব্দ কৃষ্ণ হতে মিশ্রিত একটা মহের (মহঃ অর্থাৎ তেজঃপুঞ্জের) বাচক মাত্র। তাঁরা 'কৃষ্ণ' শব্দের পূর্ণমুক্তপ্রগ্রহবৃত্তি ধারণ করতে পারেন না। কৃষ্ণ শব্দের অর্থ হচ্ছে,—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥

এই অর্থ গৌরসুন্দর দক্ষিণ দেশ হতে এনে প্রচার করেছিলেন।

---

(১) ইহাতে (শ্রীমদ্ভাগবতে) নিখিল বেদান্তের সারভাগ বর্ণিত হইয়াছে। ইহা আত্মৈকত্ব-স্বরূপ ব্রহ্মবস্তুবিষয়ক এবং কৈবল্য (কেবলা প্রেমভক্তি) রূপ একমাত্র ফলজনক।

অন্য দেশের কথা কি, এই ভারতবর্ষেও যে চিন্তাস্রোতের মধ্যে ঈশ্বর, পরমাত্মা, ব্রহ্ম প্রভৃতি শব্দ প্রকাশিত রয়েছে, তা কেবল কৃষ্ণ-শব্দের গৌণী শক্তি বা নিঃশক্তিক বিচারের ব্যঞ্জক, উহারাও কৃষ্ণ-শব্দের পূর্ণতা অভিজ্ঞাপক নয়। আমাদের ইন্দ্রিয়জজ্ঞান যে জিনিষকে দেখে, শুনে, ঘ্রাণ আস্বাদন বা স্পর্শ করে, তা প্রকৃতিপ্রসূত বস্তুবিশেষ ; এই সকল প্রকৃতি-প্রসূত বস্তুকে লক্ষ্য করে কৃষ্ণ-শব্দ প্রযুক্ত হয় নি। কৃষ্ণ-বস্তু জড়েন্দ্রিয় বা নিরিন্দ্রিয় জ্ঞানের অধিগম্য নহেন, তিনি অতীন্দ্রিয়, অপ্রাকৃত বস্তু।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজ

আজকে আমাদের বার্ষিক শ্রীগুরুপূজার বাসর। সাধারণ লোকে বলেন,—অপ্রকটের দিন; কিন্তু তাঁর অপ্রকটের দিনই প্রকটের দিন বলে আমরা জানি। আমরা তাঁরই পূজা করবার জন্য আজকে অবসর পাচ্ছি।

শ্রীভগবানের পঞ্চবিধ প্রকাশ

আপনারা জানেন, অর্চা আট প্রকারের হয়—শৈলী, দারুময়ী, ধাতুময়ী, মৃন্ময়ী, লেখ্যা বা চিত্রপটময়ী, বালুকাময়ী, সেবোন্মুখ-মনোময়ী, মণিময়ী। আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মের লেখ্যা-অর্চা এখানে সমুপস্থিত হয়েছেন। ভগবৎস্বরূপ বিচারে শাস্ত্রে পাঁচটী অবতারের কথা বর্ণিত আছে,—পরতত্ত্ব, ব্যূহ, বৈভব, অন্তর্যামী এবং অর্চা। পরস্বরূপ, ব্যূহস্বরূপ, বৈভবস্বরূপ, অন্তর্যামিস্বরূপ ও অর্চাস্বরূপ—এই প্রকাশসমূহে স্বরূপতঃ ভেদ নেই, অভেদ। সেই পরতত্ত্ব জগতে জীবের নিকট অনুভূত, অবতীর্ণ বা প্রকাশিত হন এই প্রকারে। সুতরাং কৃষ্ণ-কার্ষ্ণের শ্রীঅর্চাবিগ্রহকে অন্যরূপ বিচার করবার জন্য আমাদের উপদেশ নেই অর্থাৎ পৃথক-বুদ্ধি করবার জন্য আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্ম হতে উপদেশ পাই নি। অর্চা সর্বকালেই সকলের উপাস্য বস্তু।

ভগবদর্চা ও ভাগবত অর্চার বৈশিষ্ট্য

অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন যে, ভগবদর্চা ও মহান্তগুরুর অর্চার মধ্যে কিছু কি বৈশিষ্ট্য নেই ? হাঁ, বৈশিষ্ট্য আছে,—

"আরাধনানাং সর্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চনম্ ॥" (১)

জগতে যত প্রকার পূজ্য বস্তুর পূজা আছে, সকল পূজা অপেক্ষা ভগবানের পূজা সর্বোত্তম ; আর সেই সর্বোত্তম পূজ্যের পূজকের পূজা আরও অধিক বড়। সেই পূজককে ভগবান্ পূজা করে থাকেন। সর্বাপেক্ষা পূজ্য—ভগবান্, আর সেই ভগবানের পূজার বা প্রেমের পাত্র—প্রেমিক ভগবদ্ভক্ত, সেই ভগবদ্ভক্তের অগ্রণী—শ্রীগুরুপাদপদ্ম। ভগবান্ যাঁর পূজা করে থাকেন, তাঁর পূজা নিশ্চয়ই সব চেয়ে বড় ; তার প্রমাণ শ্লোকটী আমরা পূর্বে বলেছি।

'তদীয়' বলতে গেলে তিনি এবং তাঁর দাসবর্গ। এই যে আলেখ্য অর্চা আপনারা দর্শন করছেন, এই বস্তুকে যাঁরা 'গুরু' বলে বিচার করেন, তাঁরা সকলেই আমার গুরুবর্গ, তাঁদের চরণে আমার দণ্ডবৎ প্রণতি।

মদ্গুরু জগদ্গুরু

একগুরু বা জগদ্গুরুবাদ ও মহান্তগুরুবাদের বিচার আপনারা শুনেছেন। আমার গুরু—সমগ্র জগতের গুরু। তিনি গুরুতত্ত্ব—সমগ্র জগতের গুরুতত্ত্ব ; আমার গুরুবিদ্বেষী—জগদীশের বিদ্বেষী—জগতের সকলের বিদ্বেষী—মনুষ্যমাত্রের বিদ্বেষী। নিষ্কপটে এই বিচারটা না আসলে আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মের ভৃত্য হতে পারি না—শ্রীগুরুপাদপদ্মে

---

(১) শিব পার্বতীকে বলিতেছেন—সকল দেবতার আরাধনা অপেক্ষা বিষ্ণুর আরাধনা শ্রেষ্ঠ। হে দেবি ! তদপেক্ষা তদীয়গণের অর্থাৎ বৈষ্ণববৃন্দের আরাধনা আরও শ্রেষ্ঠ।

আত্মসমর্পণ করতে পারি না—আমার নিজের লঘুত্ব বোধ হয় না—আমি 'তৃণাদপি সুনীচ', 'অমানী', 'মানদ' হয়ে হরিকীর্তন করতে পারি না। সমগ্র জগদ্বাসী আমার মানদ বা নমস্য—এই বিচার না আসলে আমি গুরুপাদপদ্মে নমস্কার করতে পারিনা। গুরুপাদপদ্মে ঐরূপ অব্যভিচারিণী নিষ্ঠা থাকলেই সমগ্র জগৎকে মান দেওয়া যেতে পারে—নিজে অমানী হওয়া যেতে পারে—সর্বক্ষণ হরিকীর্তন করা যেতে পারে।

"সমগ্র জগৎ গুরুপাদপদ্মের প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব"

সেতার শিখাবার গুরু, পাটশালার গুরু, আধ্যক্ষিক জ্ঞানদাতা গুরু, আমার ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করাবার গুরু বা ইহজগতে যাদের নিকট হতে এই শরীর লাভ করেছি, সেই জনক-জননীগুরু—এঁরা সকলেই আংশিক গুরু। কিন্তু যিনি জন্মে জন্মে—নিত্যকাল আমার গুরু—যে গুরুর প্রতিবিম্ব জগতের প্রত্যেক লঘু বস্তু—প্রত্যেক বস্তু যাঁর সেবোপকরণ, সেই গুরুপাদপদ্মই গুরুত্বের পূর্ণত্ব ও নিত্যত্ব ধারণ করেন। সমগ্র জগৎ সেই গুরুপাদপদ্মের প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব। প্রত্যেক রেণু-পরমাণুতে গুরুর সম্বন্ধ পরিস্ফুট। তাঁদের অসম্মান বা অনাদর করা গুরুসেবকের কর্তব্য নহে।

একগুরুবাদ ও মহান্তগুরুবাদের বৈশিষ্ট্য

গুরুসেবার ন্যায় এমন মঙ্গলপ্রদ কার্য আর নেই। সকল আরাধনা অপেক্ষা ভগবানের আরাধনা বড়, ভগবানের আরাধনা অপেক্ষা গুরুপাদপদ্মের সেবা বড়, এই প্রতীতি সুদৃঢ় না হওয়া পর্যন্ত আমাদের সৎসঙ্গ বা গুরুদেবের আশ্রয়ের বিচার হয় না—আমরা আশ্রিত তিনি আমাদের পালক, এই বিচার হয় না। যখন আমরা মনে করি, অন্য প্রকার আকর হতে আমাদের মনোঽভীষ্ট পূরণ হবে, তখন আমরা মহান্ত পুরুষবিশেষে গুরুতত্ত্ব দর্শন করি না। কতকগুলি ব্যক্তি বলেন,—জগদ্গুরু একজন,

তিনি কোন এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রকট হয়েছিলেন; কিন্তু আমার যোগ্যতানুসারে, আমার লঘুত্বের পরিমাণানুসারে যদি জগদ্‌গুরুতত্ত্ব মহান্তগুরুরূপে সাক্ষাদ্ভাবে আমার নিকট প্রকাশিত হয়ে আমাকে কৃপা বিতরণ না করেন, তা হলে আমি বহুদিন পূর্ব্বের ব্যক্তির আদর্শ, আচার প্রচার ধরতে পারিনা—'সর্বস্বং গুরবে দত্যাৎ' এই শ্রৌতবাণী অনুসারে গুরুপাদপদ্মে সর্বস্ব সমর্পণ করে দ্বিতীয়াভিনিবেশের কবল হতে উদ্ধার পেতে পারি না—আমার ভয়, শোক, মোহ অপগত হয় না। শ্রীগুরু-পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করলে আমি নির্মোহ, নির্ভয় ও অশোক হতে পারি। যদি আমরা নিষ্কপটে প্রাণভরা আশীর্বাদ প্রার্থী হই তা হলে শ্রীগুরুপাদপদ্ম অমায়ায় সর্ববিধ মঙ্গল দান করেন।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্য—নিত্যজীবন দিতে সমর্থ

শ্রীগুরুদেব—মর্ত্য নহেন, তিনি—অমর বস্তু, নিত্য বস্তু। গুরুপাদ-পদ্ম—নিত্য, তাঁর সেবক নিত্য—তাঁর সেবা নিত্য, সুতরাং কত আশা-ভরসা আমাদের—মরণ বলে কোন জিনিষ আমাদের নেই।

সাধারণ গুরুগণ আমাদিগকে মরণ থেকে বাঁচাতে পারেন না—নিত্য জীবন দিতে পারেন না। এজন্য তাঁদের আংশিক গুরুত্ব। কিন্তু যিনি আমাদিগকে মরণ-ধর্ম হতে রক্ষা করেছেন—আমাদিগকে নিত্যত্বের উপলব্ধি দিয়েছেন, তিনিই পূর্ণ ও নিত্য গুরু। তিনি আমাদের সংশয়-নিবৃত্তির জন্য কৃপা করে জগতে উপনীত হয়ে আমাদের যাবতীয় সংশয়ের নিবৃত্তি করেন।

শ্রীগুরুদেব আচরণ-দ্বারা কৃষ্ণ-সেবা-প্রদাতা

আমরা—বশ্যতত্ত্ব, তিনি—ঈশ্বরতত্ত্ব। তিনি স্বয়ং ভগবান্ হয়েও ভগবানের সেবক-সূত্রে আমাদের অহংগ্রহোপাসনা-প্রবৃত্তি, উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা দুরাকাঙ্ক্ষারূপ সম্ভোগবাদ নিরাস করেন। স্বয়ং আশ্রয়-বিগ্রহ

ভগবান্ বিষয় হয়েও আশ্রয়বিগ্রহ গুরুতত্ত্বরূপে বর্তমান। শ্রীগুরুদেব ঈশ্বর হয়েও আমাদিগকে শিক্ষা দেন,—"আমার এক মাত্র পরমেশ্বর ভগবদ্‌বস্তু, আমি তাঁর সেবক। হে জীব! তুমিও তাঁরই সেবক, তুমিও আমারই মত, আমার ভাষা তুমি বুঝতে পারবে, তোমার যে সকল সন্দেহ আছে, আমি সকলই নিরাকরণ করব।" এই বলে তিনি জীবের ভগবদ্‌ভজনের যাবতীয় অনর্থ-গ্রন্থি বাক্যের দ্বারা ছেদন করে জীবকুলকে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করেন। তখন,—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে॥ (১)

মহান্তগুরুর করুণা

শ্রীগুরুপাদপদ্ম—আত্মতত্ত্ব, তিনি অনাত্মতত্ত্ব নহেন। অনাত্মতত্ত্বে নানাবিধ ভোগবাদ—ভোগ্য-বিচার আশ্রিত। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানে আমাদের অনুভবনীয় বিষয়-মাত্রই আমাদের প্রভুত্বের পরিচায়ক। দর্শক-সূত্রে, শ্রোতৃ-সূত্রে, আস্বাদক-সূত্রে, ঘ্রাণগ্রহণকারি-সূত্রে, স্পর্শকারি-সূত্রে, রূপ, শব্দ, রস, গন্ধ, স্পর্শরূপ বিষয়কে আমরা আমাদের অধীন জ্ঞান করি; সুতরাং আমাদের কর্তৃত্বাভিমান হয়। এইরূপ কর্তৃত্বাভিমান হতে মুক্ত করবার ইহজগতে আমার কে সহায়-সম্বল হবেন? অনেকে বলতে পারেন, হৃদয়ের অন্তঃস্থিত বিবেকই ত সহায়ক হতে পারে; কিন্তু আমি যে নিতান্ত দুর্বল প্রাণী, আমি যে মনোধর্মে প্রপীড়িত, হৃদ্‌রোগে জর্জরিত জীব, আমার প্রেয়কে, আমার সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক ভাল-মন্দের বিচারকে 'বিবেকের

---

(১) সর্বান্তর্যামী পরমাত্মরূপী আমার সাক্ষাৎকার লাভ হইলে জীবের হৃদয়গ্রন্থি (অহঙ্কার) বিনষ্ট, সর্ব-সংশয় ছিন্ন এবং কর্মরাশি ক্ষীণ হইয়া থাকে।

বাণী' বলে গ্রহণ করে আমার প্রতিমুহূর্তে যে বঞ্চিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে, তা হতে আমায় কে উদ্ধার করতে পারে—যদি মহান্তগুরু আমার নিকট উপস্থিত হয়ে সাক্ষাদ্ভাবে আমাকে উপদেশ না দেন। যখনই আমার কর্তৃত্বাভিমান হয়—আমি যখন মনে করি,—আমি শ্রোতা, দ্রষ্টা, ভোক্তা,—আমি যখন মনে করি, বাগানের মালী যেমন আমাকে ফুল দিয়ে যায়, আমার উপাস্য বস্তুও তেমনি আমাকে ফুল দিয়ে যাবেন, তখন আমার সেই কর্তৃত্বাভিমান হতে মহান্তগুরুদেব আমাকে রক্ষা করেন।

চৈত্ত্যগুরুর করুণায় মহান্তগুরুপাদপদ্ম লাভ

উপাস্য বস্তুকে বাগানের মালী বা আমার ইচ্ছার ইন্ধন-সরবরাহকারী বিচারে গুরুর বিচার হয় না, তাতে লঘুর বিচার হয়। এহেন পাষণ্ড আমি—পামর, অধম, নারকী আমি, আমাকে বুঝাবার জন্য যিনি মনুষ্যাকৃতিতে অবতীর্ণ হয়েছেন, তাঁকে না চিনে—সেই গুরুপাদপদ্ম দর্শন না করে যদি আমি মনে করি—'আমি গুরু দেখে' ফেলেছি, তা হলে তার মত ধৃষ্টতা আর কি আছে? যদি আমার নিষ্কপটতা থাকে, তা হলে আমার পক্ষে যে ধৃষ্টতা হচ্ছে, একথা আমার অন্তর্যামী চৈত্ত্য-গুরুরূপে আমাকে বুঝিয়ে দেন; বিবেক দেন—'শ্রীগুরুপাদপদ্মকে মর্ত্যজ্ঞান করো না। তিনি তোমার অনন্ত জীবনদাতা। তোমার ভবরোগের সদ্‌বৈদ্য, সর্বতোভাবে তোমার একমাত্র উপকারক।' চৈত্ত্যগুরুর এই উপদেশ শ্রবণ করলে আমরা মহান্তগুরু শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট উপনীত হই। আমি তখন শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট নিজ প্রাক্তন দুষ্কৃতিজাত নানাপ্রকার সন্দেহের কথা নিবেদন করে বলি,—"আপনি কৃষ্ণের আকর্ষণী শক্তি, আপনাতে আকর্ষণ-ধর্ম আছে, আমাকে আপনি আকর্ষণ করুন,

আপনার নিকট সর্বস্ব সমর্পণ করবার জন্য আমার যাবতীয় অনর্থের প্রতিবন্ধক দূরীভূত হউক।”

আমরা যদি এই প্রকার বিচার অবলম্বন না করে লোক দেখান বিচার গ্রহণ করে মনে করি,—আমরা গুরুর নিকট হতে মন্ত্র নিয়েছি মনোধর্ম হতে ত্রাণ পেয়েছি, কিন্তু যদি প্রকৃত প্রস্তাবে পূর্ণভাবে আমরা গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করবার জন্য প্রস্তুত না হই, তা হলে যে পরিমাণ কপটতা করলাম, সেই পরিমাণে ঠকে গেলাম।

লঘুবস্তু গুরু নহে ; শ্রীগুরুদেব দিব্যজ্ঞান-প্রদাতা

আমার যে সময় অবিবেচনা প্রবল ছিল, শ্রীগুরুপাদপদ্ম তখন দেখিয়েছেন, তুমি যে পণ্ডিতম্মন্যতা, পবিত্রতা, সংযম, জন্ম-ঐশ্বর্য-শ্রুত-শ্রী প্রভৃতিকে বড় মনে কর, সেই গুলিকে যে পর্যন্ত ত্যাগ না করতে পারবে, সেই পর্যন্ত তুমি আত্ম-সমর্পণ করতে পারবে না, আমাকে আশ্রয় করতে পারবে না। যদি তুমি ঐগুলি ত্যাগ করতে পার তা হলেই আমাকে আশ্রয় করতে পারবে—আমার গুরু হতে পারবে। এই বিচার যখন গুরুপাদপদ্ম হতে জানতে পেরেছিলাম, তখন তাঁকে জীববিশেষ বলে জানতে পারি নি। তখন জেনেছিলাম,—সাক্ষাৎ ভগবদবস্তু আমাকে কৃপা করবার জন্য যখন জগতে এসে উপস্থিত হন, তখন আমার সৌভাগ্য উপস্থিত হয়। **সাধরণ লঘু বস্তু যেরূপ গুরু হবার জন্য ব্যস্ত, আমার গুরুপাদপদ্মকে সেরূপ ভাবের চিত্তবৃত্তি-বিশিষ্ট মনে করতে পারি নি।** আমার চেষ্টাক্রমে—আমার ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের চাঞ্চল্যক্রমে গুরু-নির্দেশের যে পদ্ধতি আছে, তা আমার কর্তৃত্বে প্রতিষ্ঠিত—আমার ভোগবাসনায় পূর্ণ। এই জগতের ভোগবাসনা-চালিত কর্তৃত্ব হতে পরিত্রাণ করতে যিনি সমর্থ, সেই গুরুপাদপদ্ম হতে যে শিক্ষা পাওয়া যায়, সেই অতিমর্ত্য শিক্ষার নিকট, মনুষ্যজাতির নিকট

যে-সকল শিক্ষা পাওয়া যায়, যুগ-যুগান্তরের সভ্য-সমাজ ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হতে যে-সকল শিক্ষা পাওয়া যায়, সে-সকল একীভূত করলেও অতি তুচ্ছ, ক্ষুদ্র, নগণ্য, নিতান্ত ব্যর্থ। আমার নিজের আত্মম্ভরিতা ও অবিবেচনাকে সম্পূর্ণভাবে পরাভূত করতে পারে যে শক্তি, সেই (গুরুপাদপদ্ম) শক্তি যদি আমাতে সঞ্চারিত না হয়,—দুর্বল আমি, সেই বলে যদি বলীয়ান না হই, তাহলে সেই বস্তুর সহিত সাক্ষাৎ হয় না—তাঁকে গ্রহণ করতে পারি না। দিব্যজ্ঞানের প্রদাতাকে গুরু বলা যায়,—

দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ ॥ (১)

দিব্যজ্ঞানের প্রদাতা কোন মর্ত্যবস্তু নন। যিনি দিব্যজ্ঞানের কথা শুনেন, তিনিও কখনও মরে যান না। যিনি সমুপেত মৃত্যু হতে রক্ষা করতে পারেন না, তিনি গুরু নন। যিনি আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ মৃত্যুর কবল হতে রক্ষা করে থাকেন, তিনিই গুরুদেব (ভাঃ ৫।৫।১৮)

গুরুর্নস স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যাৎ
ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেত-মৃত্যুম্ ॥ (২)

---

(১) যে হেতু দিব্যজ্ঞান (সম্বন্ধজ্ঞান) প্রদান করে এবং পাপের (পাপ, পাপবীজও অবিদ্যা) সমূলে বিনাশ করিয়া থাকে, সেইজন্য ভগবৎতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ এই অনুষ্ঠানকে 'দীক্ষা' নামে অভিহিত করেন।

(২) ভক্তিপথের উপদেশ দ্বারা যিনি সমুপস্থিত মৃত্যুরূপ সংসার হইতে মোচন করিতে না পারেন, সেই গুরু 'গুরু' নহেন, সেই স্বজন 'স্বজন'-শব্দ-বাচ্য নহেন, সেই পিতা 'পিতা' নহেন অর্থাৎ তাঁহার পুত্রোৎপত্তি বিষয়ে যত্ন করা উচিত নহে, সেই জননী জননী নহেন অর্থাৎ সেই জননীর

আমরা জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গ-রাজ্যে অবস্থিত। আমরা মরে যাব সকলেই—এ অবস্থায় কেহ থাকতে পারব না। কিন্তু 'মরে যাব' এই ভীতি—এই আশঙ্কা হতে যিনি উদ্ধার করতে পারেন, তিনিই শ্রীগুরুপাদপদ্ম। আমরা যে নানাপ্রকার দুর্বুদ্ধি সঞ্চয় করেছি, সেই দুর্বুদ্ধি হতে রক্ষা করবার জন্য আমার প্রতি যিনি অনন্ত শক্তি সঞ্চার করেন, আমি সেই গুরুপাদপদ্মে **পুনঃ পুনঃ** প্রণত হই।

তর্কদ্বারা গুর্ববজ্ঞা হয়—গুরু দর্শন হয় না

মানব যে-কাল পর্যন্ত তর্কপথ গ্রহণ করে, সে-কাল পর্যন্ত গুরুর দর্শন-লাভ ঘটে না। শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী বা সত্য হতে পার্থক্য লাভ করে অন্য কোন সত্য হতে পারে না—এরূপ বাস্তব সত্যের প্রতি নিষ্ঠা পরীক্ষা করবার জন্য যে বিপরীত মত, সন্দেহ উপস্থিত হয়, তাই তর্কপথ। গুরুপাদপদ্ম ব্যতীত অন্য কথা থাকতে পারে, গুরুপাদপদ্ম যে-কথা বলেছেন, তাতে সম্পূর্ণ সত্য নেই, কিঞ্চিৎ অসত্যও মিশ্রিত থাকতে পারে, আমি সেগুলি বাজিয়ে নেবো—**এরূপ বিচারের নাম তর্ক পথ।** যাঁরা তর্কপন্থী, তাঁরা গুরুপাদপদ্মের অবজ্ঞা করেন। একমাত্র গুরুপাদপদ্মই সকল সন্দেহ ও বাদ নিরসন করতে সমর্থ। তর্কের প্রতিষ্ঠান নেই। আম্নায়-পথে—শ্রৌতপথে—বেদপথে—বিশুদ্ধপথে যে সত্য আগত হয়, তা পরিবর্তনীয় নয়। সেই অপরিবর্তনীয় সত্যের—শব্দের প্রদাতাকে আমরা 'গুরুপাদপদ্ম' বলে থাকি। গুরুদ্রোহীর তর্কনিষ্ঠ হৃদয়ে যে বিচার-প্রণালী,

---

গর্ভধারণ কর্তব্য নহে, সেই দেবতা 'দেবতা' নহেন, অর্থাৎ যে সকল দেবতা জীবের সংসার মোচনে অসমর্থ, তাঁহাদিগের মানবের নিকট পূজা গ্রহণ করা উচিত নহে, আর সেই পতি 'পতি' নহেন, অর্থাৎ তাঁহার পাণি গ্রহণ করা উচিত নহে।

তাতে গুর্ববজ্ঞা, শাস্ত্রাবজ্ঞা থাকে। সুতরাং ভগবানের ভজনে প্রবৃত্ত হবার জন্য আমাদের বিশেষভাবে বিচার্য বিষয়,—

* সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমপরাধং বিতনুতে।
যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমুসহতে তদ্বিগর্হাম্॥
শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদিসকলম্।
ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ॥
গুরোরবজ্ঞা শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দনং তথার্থবাদো হরিনাম্নি কল্পনম্।
নাম্নো বলাদ্ যস্য হি পাপবুদ্ধির্ন বিদ্যতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধিঃ॥
ধর্মব্রতত্যাগহুতাদি-সর্বশুভক্রিয়া-সাম্যমপি প্রমাদঃ।
অশ্রদ্দধানে বিমুখেঽপ্যশৃন্বতি যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ॥
শ্রুতেঽপি নামমাহাত্ম্যে যঃ প্রীতিরহিতো নরঃ।
অহং মমাদি পরমো নাম্নি সোঽপ্যপরাধকৃৎ॥

শ্রৌতবাণী-কীর্তনকারী শ্রীগুরুদেবই উদ্ধারকর্তা

শ্রুতি-শাস্ত্রের নিন্দা অর্থাৎ গুরু-কথিত বাক্য শ্রবণ করবার পর সেই শ্রৌতবাণীর নিন্দা। ঐরূপ নিন্দা-প্রবৃত্তি গুরুপাদপদ্ম হতে বিচ্ছিন্ন করিয়ে তর্কপন্থায় পাতিত করে। বাস্তবরাজ্যে ঐরূপ ধরণের বিপত্তি বা আশঙ্কা থাকতে পারে না। যেখানে নিত্যানিত্য বিবেকের পূর্ণ স্থান, সেখানে অজ্ঞান বা নিরানন্দের প্রবেশাধিকার নেই। সেই সচ্চিদানন্দ-রাজ্যে যে-সকল বাণী আছে, সেই বাণী ভূতাকাশ ভেদ করে, জীবের কর্ণবেধ করে কর্ণের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয় এবং আমাদের পূর্ব বোধ বা প্রমার দ্বারা সঞ্চিত শব্দ-রাশিকে বিপর্যস্ত করে সেখানে শুদ্ধ চেতনের রাজ্য আবিষ্কার করে। এইরূপ শ্রৌতবাণী যিনি কর্ণে প্রদান করেন, সেই শ্রুতির

---

* দশটি নামাপরাধ—
(১) সাধুবর্গের নিন্দা শ্রীনামের নিকট পরম অপরাধ বিস্তার করে;

কীর্তনকারীই আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম। তিনি নিরন্তর আমাদের কর্ণে শ্রৌতবাণীর অভিষেক করে আমাদিগকে তৃণাদপি সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, অমানী, মানদ করিয়ে দেন এবং সর্বদা আমাদের মুখে বৈকুণ্ঠ-কীর্তন প্রকাশিত হবার শক্তি সঞ্চার করেন ; এমন যে পরমা শক্তি, তিনিই গুরুপাদপদ্ম। যে বহিরঙ্গা শক্তি জগতে নানাবিধ দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করছে, সেই শক্তির কবল হতে শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদিগকে মুক্ত করে দেন।

যে সকল নামপরায়ণ সাধুগণ হইতেই জগতে কৃষ্ণনাম-মাহাত্ম্য প্রসিদ্ধ হন, শ্রীনাম সেই সকল সাধুগণের নিন্দা কি প্রকারে সহ্য করিবেন ? (২) এই সংসারে মঙ্গলময় শ্রীবিষ্ণুর নাম, রূপ, গুণ ও লীলাদিতে যে ব্যক্তি বুদ্ধি দ্বারা পরস্পর ভেদ দর্শন করে অর্থাৎ প্রাকৃত বস্তুর ন্যায় শ্রীবিষ্ণুর নাম, রূপ, গুণ ও লীলা—নামি-শ্রীবিষ্ণু হইতে ভিন্ন এইরূপ মনে করে, অথবা শিবাদি দেবতাকে বিষ্ণু হইতে স্বতন্ত্র বা সমান জ্ঞান করে, তাহার সেই হরিনাম (নামাপরাধ) নিশ্চয়ই অহিতকর ; (৩) যে ব্যক্তি নামতত্ত্ববিদ্ গুরুতে প্রাকৃত-বুদ্ধি, (৪) বেদ ও সাত্বত পুরানাদির নিন্দা, (৫) হরিনাম-মাহাত্মকে অতিস্তুতি, (৬) ভগবান্নামসকলকে কল্পিত মনে করে, সে নামাপরাধী এবং (৭) যাহার নাম-বলে পাপাচরণে প্রবৃত্তি হয়, বহু যম, নিয়ম, ধ্যান-ধারণাদি কৃত্রিম যোগপ্রক্রিয়া-দ্বারাও তাহার নিশ্চয়ই শুদ্ধি ঘটে না ; (৮) ধর্ম, ব্রত, হোমাদি—এই সকল প্রাকৃত শুভকর্মের সহিত অপ্রাকৃত নামকে সমান জ্ঞান করাও অনবধানতা ; (৯) শ্রদ্ধাহীন, নাম-শ্রবণে বিমুখ ব্যক্তিকে যে উপদেশ প্রদান—তাহাও মঙ্গলপ্রদ নামের নিকট অপরাধ বলিয়া গণ্য ; (১০) যে ব্যক্তি নাম-মাহাত্ম শ্রবণ করিয়াও 'আমি' ও 'আমার' এইরূপ দেহাত্ম-বোধযুক্ত হইয়া তাহাতে প্রীতি বা অনুরাগ প্রদর্শন করে না, সে ব্যক্তিও নামাপরাধী।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদের মূর্খতা, অসম্পূর্ণতা, অসদ্‌বিচার-প্রণালী, অস্থির সিদ্ধান্ত প্রভৃতিতে পূর্ণমাত্রায় অভিজ্ঞ। কাজেই আমার যাবতীয় রোগের অবস্থানুযায়ী তিনি ব্যবস্থা করেন। যাঁর নিকট উপস্থিত হলে অন্য কারো কথা শুনবার আবশ্যক বোধ হয় না—অন্য কারো কাছে যেতে হয় না, তিনিই সদ্‌গুরু। সকলের মঙ্গলের মঙ্গল-স্বরূপ ভগবান্ আমার জন্য সকল মঙ্গল যার করে অর্পণ করেছেন, আমি যদি তার নিকট শতকরা শত পরিমাণ আমাকে সমর্পণ করি, তা হলে তিনি সম্পূর্ণ মঙ্গল আমাকে প্রদান করেন। আর যদি কপটতা, দ্বিহৃদয়তা, লোক-দেখান মিছাভক্তি বা ভণ্ডামি করি, তা হলে তিনিও বঞ্চনা করে থাকেন। তিনি বলেন—"তুমি শিষ্য হও নি, তুমি শাসন নিবে না, তোমার হৃদয়ে পাপ আছে, কপট লোকের বিচারের কথা শোনার দরুণ বর্তমানে আমার কথা শুনবার মত কাণ তোমার প্রস্তুত হয় নি, সুতরাং তুমি বঞ্চিত হলে।" তিনি আমার জন্য অমায়ায় যে ব্যবস্থা করেন, তা নতশিরে গ্রহণ করাই আমার কর্তব্য,—এটা হচ্ছে শরণাগতের লক্ষণ।

শ্রীগুরুদেব বলেন,—সর্বক্ষণ, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টা ভগবৎসেবা কর, হরিকীর্তন কর, তা হলেই তৃণাদপি সুনীচ হতে পারবে। যদি অহঙ্কারীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ কর, তা হলে * 'প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি' শ্লোকানুসারে তোমার সর্বনাশ হবে।

অনেকে নিজের কর্তৃত্বাভিমানে সদ্‌গুরুপাদপদ্ম বাজিয়ে নিতে চান।

---

* প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ।
অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥ (গীঃ ৩।২৭)

দেহাদিতে অহং-বুদ্ধিবিশিষ্ট বিমূঢ় চিত্ত ব্যক্তি প্রকৃতির গুণসমূহ-দ্বারা সর্বপ্রকারে ক্রিয়মাণ কর্মসমূহকে আমিই করি এইরূপ মনে করে।

এ-সকল কর্তৃত্বাভিমানী ব্যক্তি সদ্‌গুরুর সন্ধান পান না। সদ্‌গুরুর পাদপদ্ম—স্বপ্রকাশ-বস্তু।

হিরন্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্। তত্ত্বং পুষন্নপাবৃণু সত্য-ধর্মায় দৃষ্টয়ে॥

পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ।
তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি॥

—যখন এরূপ বিচার উপস্থিত হয়, তখনই বাস্তব সত্য, শ্রেষ্ঠ কল্যাণের আকর গুরুপাদপদ্ম আমাদের আর্ত আত্মার নিকট এসে উপস্থিত হন, আমরা তখনই সদ্‌গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করতে পারি। বুভুক্ষা ও মুমুক্ষা—যা আমাদের নিজের কাজে লাগে, সেই অপস্বার্থপরতা যদি আমাদের অন্তরের আরাধ্য ব্যাপার হয়, তা হলে আমরা গুরুপাদপদ্মের নিকট যেতে পারব না—যিনি গুরু নন, তাঁকে গুরু মনে করে কেবল নিজের অনর্থ সংবর্ধন করবো।

মনন ধর্ম হতে ত্রাণ করতে পারে যে বস্তু, সেইরূপ মন্ত্রই গ্রহণ করতে হবে। কাণ থাকলেও যদি হরিকীর্তন শ্রবণ না হয়, যদি মেপে নেওয়ার ধর্ম প্রবল হয়, যদি আমরা চক্ষুকে নিযুক্ত করি—দৃশ্যবস্তু মেপে নেবার জন্য, কর্ণকে নিযুক্ত করি—শব্দের যাথার্থ নিরূপণের জন্য, নাসিকাকে নিযুক্ত করি—গন্ধকে ভোগ করবার জন্য, জিহ্বাকে নিযুক্ত করি—আস্বাদনীয় বস্তুর উপর প্রভুত্ব করবার জন্য, ত্বককে নিযুক্ত করি—স্পর্শের উপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য, তা হলে গুরুসেবার উপকরণে আমাদের ভোগবুদ্ধির উদয় হলো, সেব্য-বস্তুতে—গুরুতে লঘুজ্ঞান হলো, আমরা মঙ্গল পেলাম না।

আমাদের গুরুপাদপদ্ম—যাঁর আলেখ্য আপনারা দর্শন করছেন, তিনি ইহ জগতের কোন ভোগ্য বিষয়ের উপদেশক নন। আবার ইহ জগতের

সকল কথার একমাত্র অভ্রান্ত মীমাংসক তিনিই। কিন্তু আমি বঞ্চিত, পতিত; আমার দুর্বলতা-ক্রমে গুরুপাদপদ্মের সকল কথা হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয় না। গুরুপাদপদ্মের কৃপায় যে-সকল কথা কর্ণে প্রবিষ্ট হয়েছে, সে সকল কথা বলবার জন্য আমার কোটি কোটি জিহ্বা হউক—কোটি কোটি মুণ্ড হউক—কোটি কোটি বৎসর পরমায়ু হউক—আমি যেন সেই কোটি কোটি জিহ্বায়, কোটি কোটি মস্তকে, কোটি কোটি বৎসরে অনন্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে আমার গুরুপাদপদ্মের অতুলনীয়া অমন্দোদয়-দয়ার কথা কীর্তন করতে পারি; তাহলে আমার গুরুপূজা হবে—তিনি সন্তুষ্ট হবেন—প্রসন্ন হয়ে আমার প্রতি অজস্র আশীর্বাদ বর্ষণ করবেন, যাঁতে করে আমি তাঁর দয়ার কথা আরও কোটি জিহ্বায় কীর্তন করতে পারব। সেইদিন আমার সকল নশ্বর মায়ার কথা-কীর্তন হতে ছুটি হবে—জগতের সকল লৌকিক-শিক্ষা হতে ছুটি হবে।

জগতের প্রিয় কথাকে আমরা গুরু-কথা বলে গ্রহণ করি—আমরা অচৈতন্য কথায় সর্বদা প্রমত্ত; কিন্তু আমার গুরুদেব,—

> "শ্রীচৈতন্য-মনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
> স্বয়ং রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্ ॥"

শ্রীচৈতন্যদেবের হৃদগত অভিলাষ যিনি জগতে বিস্তার ও স্থাপন করেছেন, সেই রূপ-প্রভু স্বয়ং কবে আমাকে তাঁর নিজ-পাদপদ্ম দান করবেন? কবে আমি গুরুপাদপদ্মের অসামান্য, অতিমর্ত্য সৌন্দর্য দর্শন করে তাঁর চরণ একান্তভাবে আশ্রয় করব? এমন দিন আমার কবে হবে?

যাঁরা এইরূপ বিচার অবলম্বন করেন, গুরুপাদপদ্ম হতে শ্রবণ করেছি, তাঁরা রূপানুগ—তাঁরা শ্রীগৌরসুন্দরের অতিপ্রিয়। যাঁরা রূপানুগ

হবার জন্য যত্ন করেন, তাঁদের মঙ্গলের কথা ব্রহ্মা তাঁর সমগ্র জীবনে বলেও শেষ করতে পারেন না।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদিগের সকল সন্দেহ নিরাস করে ভগবানের যে নাম-ভজনের কথা বলেছেন, তাতে জানি, গুরুর অবজ্ঞা করতে নেই—শ্রৌত-বাণীর নিন্দা করতে নেই—গুরুব্রুবগণকে পূজ্য-জ্ঞানে গুরুপাদপদ্মের অবজ্ঞা করতে নেই—অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের আশ্রয় ব্যতীত জীবের অন্য মঙ্গল নেই।

আমার গুরুদেব! আমি ধৃষ্টতা করছি, 'আমার গুরুদেব' এই কথাটি বলবার মত আমার হৃদয় কোথায়? কোথায় কত উচ্চে গুরুপদনখচন্দ্র, আর কোথায় আমি নিম্নতম স্তরে স্থিত বামন! আমি গুরুপাদপদ্মের সেবা করতে পারি কই? আমি নিদ্রাকালে গুরুপাদপদ্মসেবা হতে বঞ্চিত হয়ে আত্মসুখে মগ্ন থাকি—আমি নিজের খাওয়া-দাওয়া-ব্যাপারে নিযুক্ত থাকি। গুরুপাদপদ্মসেবা-বঞ্চিত এরূপ অযোগ্য আমি, পতিত আমি, দুর্বল আমি, আমাকে প্রচুর পরিমাণে দয়া না করলে আমি তাঁর দয়ার প্রতি আরও অধিকতর আক্রমণ করতাম। আমার গুরুপাদপদ্ম—দয়ার সাগর, তাঁর দয়া-সিন্ধুর এক বিন্দু আমাকে আনন্দ-সাগরে মগ্ন করতে পারে।

তিনি কতই না দয়া করে আমাকে বলতেন—তোমার পাণ্ডিত্য, তোমার পবিত্রতা, আভিজাত্য প্রভৃতি সব পরিত্যাগ করে আমার কাছে এস, আর কোথাও যেতে হবে না; তোমার যত ঘর, বাড়ী, প্রাসাদ, সৌধ দরকার আছে—যত পাণ্ডিত্য, প্রতিভার দরকার আছে—যত সংযম, সন্ন্যাসের দরকার আছে, সব পাবে, তুমি কেবল আমার কাছে এস। ঘর হউক, দোর হউক, পাণ্ডিত্য হউক, এরূপ বুদ্ধিতে

দৌড়িও না—সাধারণ লোক যাকে 'প্রয়োজন' মনে করেছে, তাকে 'প্রয়োজন' মনে করো না।

আমরা ভয়ানক তার্কিক ছিলাম। কিন্তু সেই তর্কের দর্পকে অতি দয়ার সহিত পদাঘাত করে যিনি কৃপা করেছিলেন, তাঁর দয়ার কথার সীমা করতে আমি অনন্ত কোটি জীবনেও পারব না, বা কেহ কোন দিন পারবে না। তাঁর ভৃত্য বলে পরিচয় দিবার যোগ্যতা যদিও আমার নেই, তথাপি তিনি সেরূপ পরিচয় দিবার যে আশাবন্ধ করিয়ে দিয়েছেন, আমরা তাতে নিত্যকাল জীবিত থাকতে পারি। আমরা নিরানন্দের মধ্যে প্রবিষ্ট আছি—প্রচুর পরিমাণ অনিত্য কার্যে নিবিষ্ট আছি। আমরা দুর্বল বলে মনে হয়েছিল, গুরুদেবের অপ্রকটে বিপথগামী হয়ে যাব, তাঁর কথা শুনতে পাব না; কিন্তু আজ গুরুপাদপদ্মের বহু বহু অবতার কৃপা করে আমার সম্মুখে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁরা আমার নিকট কীর্তন করেন, ভাগবত পড়ে অর্থ জানিয়ে দেন। তাঁরা যখন আমার গুরুপাদপদ্মের অভিমত নবনবায়মান ব্যাখ্যা সমূহের দ্বারা আমার মৃত শরীরকে সঞ্জীবিত করেন, তখন আমি সংজ্ঞা লাভ করি—আমার প্রতিদিন চব্বিশ ঘণ্টাকাল হরিকথা শ্রবণ-কীর্তন করবার সৌভাগ্য হয়।

যে পরিমাণে হরিবিস্মৃতি হবে, সেই পরিমাণে এই চক্ষুর দ্বারা দেখবার চেষ্টা হবে, এই নাসা-দ্বারা জগতের গন্ধ গ্রহণ করবার স্পৃহা হবে, গ্রীষ্মকালে পাখার বাতাস খাব, শীতকালে লেপ মুড়ি দিয়ে স্পর্শসুখানুভব করবো—এরূপ লালসা হৃদয়ে স্থান পাবে।

গীতায় যখন শ্রীভগবান্,—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥"

—বাক্য বলেছিলেন, তখন অর্জুন ভগবানের সেই বাণী শুনলেন, আর বাদ বাকী লোক মনে করল সকল লোকই—স্বার্থপর, কৃষ্ণও তদ্রূপ; তিনি ত বলবেনই—'সকল ছেড়ে আমার সেবা কর'। কিন্তু যে সেবা করবে, তার দুঃখের দিকে ত তিনি আর দেখলেন না।

"My doxy is orthodoxy, yours is heterodoxy. আমি যা বুঝি, এটাই খুব ঠিক,—একথা না বললে আত্মপক্ষ সমর্থন হয় না; কৃষ্ণচন্দ্র সেই ভাবেরই উপদেশ দিয়েছিলেন।" জীবের এইরূপ কুতর্কের সমাধান করবে কে? কৃষ্ণের সেবার কথা কৃষ্ণ যখন বলেন, তখন কলিহত লোকের এরূপ তর্ক উপস্থিত হতে পারে। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র যখন সেবকমূর্তিতে বলেন,—আমার আচরণ এই, তোমার যদি এই আচরণ ভাল বোধ হয়, তা হলে এরূপ আচরণ কর। নিজে আচরণ করে যিনি অগ্রসর হন, অপরের পক্ষে তাঁর অনুসরণ করবার পরম সুযোগ হয়। যেমন একজন প্রধান গায়ক ও তাঁর অনেকগুলি দোহার। যিনি সর্বপ্রধান গায়ক, তিনি আগে গানটা গেয়ে দেন, অন্যে যদি তাঁর দোহারগিরি করেন, তবে তাঁদেরও গান গাওয়া হয়। শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু মূল গায়করূপে কৃষ্ণের গান গেয়ে দিয়েছিলেন; যাঁরা যাঁরা নিষ্কপটভাবে সেই গানের দোহারগিরি করবেন, তাঁদেরও গান গাওয়া হবে—মঙ্গল হবে।

'অমঙ্গল' আর 'মঙ্গল' যদি এক হয়ে যায়, তা হলে অনুভূতি বলে জিনিষ থাকে না। অনুভূতি-বিরহিত জিনিষ—পাথর। সুখের অনুভূতি যাঁরা পেয়েছেন, তাঁদের আর পাথর হবার ইচ্ছা হয় না। যাঁরা

অজ্ঞানের অনুসরণ করাটাকেই 'জ্ঞান' বলে মনে করেন, আনন্দ পেতে গিয়ে নিরানন্দ-সাগরে ডুবে যান, তাঁদের বুদ্ধির প্রশংসা করা যায় না।

শ্রবণ করতে হবে বটে, কিন্তু কি শ্রবণ করতে হবে? স্কুল-কলেজে ত আমরা অনেক শ্রবণ করে থাকি; কিন্তু যাঁরা আমাদের কাছে ঐসকল শ্রবণীয় বিষয় কীর্তন করেন, তাঁরা কে? তাঁদের কি ব্যারামটা ভাল হয়েছে? ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব, বিপ্রলিপ্সা—মানবের যেগুলি স্বাভাবিক দোষ আছে, সেই দোষ থাকতে তাঁরা কিরূপে স্বতঃ বা পরতঃ আলোচনা করবেন? যিনি এসকল দোষ হতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত, তাঁর আশ্রয় ব্যতীত কি প্রকারে আমরা ভ্রমাদি-নির্মুক্ত সত্যকথা শ্রবণ করতে পারি? যিনি ভগবৎপাদপদ্মের সর্বদা অনুশীলন করেন, তাঁর আনুগত্যময়ী সেবা-দ্বারা তিনি যাঁর সেবা করেন, তাঁর অনুসন্ধান পাওয়া যেতে পারে, অন্যভাবে পাওয়া যেতে পারে না,—

"জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥"

আমার ব্যক্তিগত চেষ্টার দ্বারা তর্কপথে জ্ঞানসংগ্রহের চেষ্টা বিপজ্জনক। সেইরূপ জ্ঞান-সংগ্রহের আশায় যতদিন আস্থা স্থাপন করি, ততদিন সমগ্র জ্ঞান পাই না, বিকৃতজ্ঞান—অসম্যগ্‌জ্ঞান বা কখনও কখনও আংশিক জ্ঞান লাভ করে থাকি। আংশিক জ্ঞান সংগ্রহ করতে গিয়ে খানিক জানতে জানতেই আয়ু ফুরিয়ে যাবে। নমস্কারের পন্থাই স্বীকার্য অর্থাৎ কাণটা পাতা। সাধুদিগের মুখকথিত বার্তা যিনি কাণ পেতে শ্রবণ করেন, তাঁরই মঙ্গল হয়। ভবদীয় বার্তা—কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় বা কৃষ্ণভক্ত-সম্বন্ধীয় কথা যিনি আলোচনা করেন, তিনিই সাধু। অন্য সব

কথা বায়ুরাশিতে বিলীন হয়ে যায়। উহা শত শত বৎসর ধরে উচ্চারণ করলে কি ফল হবে?

"ম্রিয়মাণঃ কালনদ্যা ক্বচিত্তরতি কশ্চন।"

কাল চলে যাচ্ছে, তাতে আয়ুহরণ হয়ে যাচ্ছে, এর মধ্যে কে সিদ্ধিলাভ করবেন? শ্রৌতপন্থীই সিদ্ধিলাভ করবেন। বাদের প্রতিবাদ আছে, তর্কের কোনদিন প্রতিষ্ঠা নেই; কিন্তু শ্রৌতপথ নিত্য সম্প্রতিষ্ঠিত। যিনি সর্বদা—২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টা সর্বেন্দ্রিয়ে হরিকীর্তন করেন, তিনিই সিদ্ধিলাভ করতে পারেন।

কীর্তনীয় বিষয়টী কি?—নাম-রূপ-গুণ-পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা। যদি বাস্তব-বস্তুর নাম কীর্তিত হয়, যদি বাস্তব-বস্তুর রূপ কীর্তিত হয়, যদি বাস্তব-বস্তুর গুণ কীর্তিত হয়, যদি বাস্তব-বস্তুর পরিকর-বৈশিষ্ট্য কীর্তিত হয়, যদি বাস্তব-বস্তুর লীলা কীর্তিত হয়, তা হলেই আমাদের সমস্ত মঙ্গল হবে—আমাদের অহঙ্কার নষ্ট হয়ে যাবে—আমাদের অসহিষ্ণুতা নষ্ট হবে। জড় প্রতিষ্ঠার আশাকে বর্জন করে সমগ্র বহির্মুখ জগতের নিকট পরম অসাধু বলে খ্যাতি লাভ করেও আমরা পরমানন্দ লাভ করতে পারব। ভাগবতের ত্রিদণ্ডীর প্রতি বহির্মুখ জগৎ হতে অনেক অত্যাচার হয়েছিল। সত্যের কীর্তনকারী—হরিকথা-কীর্তনকারীর প্রতি অত্যাচার করবার জন্য সমগ্র বহির্মুখ জগৎ, এমন কি দেবতাগণ পর্যন্ত প্রস্তুত। ত্রিদণ্ডী জগতের বহির্মুখ সমাজের কথায় কর্ণপাত না করে আপন মনে হরিকীর্তন করতে করতে ভূমণ্ডলে বিচরণ করেছিলেন,—

"এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠামধ্যাসিতাং পূর্বতমৈর্মহর্ষিভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রিনিষেবয়ৈব॥"

কৃষ্ণ যখন "সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" বল্লেন, তখন বহির্মুখ লোক কৃষ্ণচন্দ্রকে প্রকৃতি প্রসূত প্রাণিবিশেষ মনে করে বল্লেন, কৃষ্ণচন্দ্র নিজের পূজার কথা নিজে বলছেন, কৃষ্ণ কিরূপ আত্মসুখপর! সেইজন্য সেই কৃষ্ণচন্দ্রই জীবের মঙ্গলের জন্য গুরুর পোষাকে উপস্থিত হলেন। তাঁর উপদেশ ও আচরণ হলো—কৃষ্ণকে ভজন কর—কৃষ্ণের কীর্তন কর। বোকা লোকেরা মনে করল, একজন সাধক জীব এসে উপস্থিত হয়েছেন; বুদ্ধিমানেরা উপলব্ধি করলেন, কৃষ্ণ বড় চতুর, শঠ, তাই ভোল বদলেছেন, আশ্রয়জাতীয় আবরণ পরেছেন; তাঁকে তাঁরা চিনে ফেল্লেন। আর আমার মত লোক মনে করল, একজন আচার্য, একজন ধর্মপ্রচারক উপস্থিত হয়েছেন, তিনি সমাজবিপ্লব সাধন করছেন। "হিন্দুর ধর্ম ভাঙ্গিল নিমাই। কৃষ্ণের কীর্তন করে নীচ বাড় বাড়। সেই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজাড়॥"

যদি আমাদের এমন সৌভাগ্য হয় যে, আমরা ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ পাই, তাহলে সেই সুযোগ করিয়ে দেওয়ার একমাত্র মালিক—কৃষ্ণচন্দ্র। গুরুর হাত দিয়ে তিনি বরাভয়প্রদ ব্যাপারটাকে প্রদান করেন। যাঁদের কপালের জোর আছে, তাঁরা এই সুবিধাটা পান। যিনি যেরূপভাবে শরণাগত হন, তাঁর নিকট তদুপযোগী গুরুপাদপদ্ম উপস্থিত হন।

আমাদের কপাল বড় মন্দ ছিল, জাগতিক লেখাপড়া শিখে উঠতে পারি নি, জাগতিক কোন সহায় সম্বলে আস্থা স্থাপন করতে পারি নি, এমন ব্যক্তিকে ভগবান্ দয়া করেছেন—গুরুপাদপদ্মের সম্মুখীন করে দিয়েছেন।

'ভগবান্' শব্দের অর্থ আলোচনা করতে গিয়ে গল্পের মত স্কুলে পড়েছিলাম,—

"ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য বীর্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥"

'বৈরাগ্য' বলে কথাটা গল্পের মত শুনেছিলাম, 'বৈরাগ্যশতক', 'শান্তিশতক', 'মোহমুদ্গর' প্রভৃতিতে বৈরাগ্যের উপদেশ পাঠ করেছিলাম; কিন্তু যখন দয়াময় কৃষ্ণ ও দয়াময় কার্ষ্ণ—উভয়েরই দয়া হলো, তখন ভগবানের বৈরাগ্য ব্যাপার শ্রীরূপ ধারণ করে উপস্থিত হলেন। মানুষের আকারে এরূপ বৈরাগ্য হয় না। কিন্তু আমরা তা সাক্ষাদ্ভাবে দেখতে পেয়েছি, তথাপি আমি 'যে তিমিরে, সে তিমিরে'। শরীরটা বাধা দিচ্ছে, ২৪ ঘণ্টা গুরুপাদপদ্মের সেবা করতে পারছি না। যে বৈরাগ্যের আদর্শ-মূর্তি দেখেছি, তা মোহমুদ্গরের বৈরাগ্যমাত্র নয়—ফল্গুবৈরাগ্য নয়, সে বৈরাগ্য—মহাভাবময়—কৃষ্ণ-সেবার পরাকাষ্ঠাময়।

কেবল কনক-কামিনীতে বৈরাগ্য নয়, প্রতিষ্ঠাশায় পর্যন্ত যাঁর বৈরাগ্য, এরূপ পুরুষ আমার আরাধ্য হউন—একটি শিষ্যও যিনি করেন না, এমন শ্রীপাদপদ্ম আকাঙ্ক্ষা করে তাঁর নিকট গিয়ে উপস্থিত হলাম এবং তাঁর কাছে কৃপা ভিক্ষা করলাম। তিনি বল্লেন, আমি একটি শিষ্য করেছিলাম, সে প্রতারণা করে চলে গেছে, আর আমি শিষ্য করব না। আমি ব্যথিত হলাম বটে, কিন্তু দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলাম, দেখি, আমি কতবার প্রত্যাখ্যাত হতে পারি। আমি তাঁর কৃপা না নিয়ে জগতে বিচরণ করব না।

সেই গুরুপাদপদ্মের নিকট যখন উপস্থিত হলাম, তখন তাঁর কৃপায় জানতে পারলাম, আমি যাঁকে সর্বোত্তম আদর্শ বলে মনে করি—শ্রেষ্ঠ জীবন মনে করি, সেই আদর্শ তাঁর নিকট সর্বাপেক্ষা অধম। জগতের সকলের সহিত আমার আদর্শের মিল ছিল না; কিন্তু আমার শ্রীগুরু-পাদপদ্ম একটি অলৌকিক বিচার দেখিয়ে দিলেন। পূর্বে 'নেতি নেতি'

বিচারপর নির্বিশেষবাদীর অনেক গ্রন্থ আলোচনা করেছিলাম। তাঁর বাস্তব উদাহরণ পেয়ে গেলাম। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাকে জানালেন, তুমি যে আদর্শের অনুসন্ধান করছ, সেই আদর্শ তোমার নহে। আমি মনে করেছিলাম, আমার গুরুপাদপদ্মে অদ্বিতীয় বৈরাগ্য আছে বটে, কিন্তু তাঁর পাণ্ডিত্য কিছু কম আছে। তিনি পুঁথি-পত্রের বিদ্যার অহঙ্কারকে চূর্ণ করে দিয়েছিলেন—তাঁর কৃপামুদ্গরের দ্বারা। তিনি জানিয়েছিলেন, তোমার সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আদর্শ—প্রকৃতপক্ষে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। যখন তাঁর এই বাণী কর্ণে প্রবেশ করেছিল—যখন তাঁর কৃপা পেয়েছিলাম, তখন আমার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে সেই দিব্যজ্ঞান ধারণ করবার ক্ষমতা ছিল না। এতবড় কথাটা তিনিই আমার মত বোকা সবজান্তাকে শুনবার সুযোগ দিয়েছিলেন।

এক সময়ে বাঙ্গলা দেশের একজন প্রধান ভূম্যধিকারী, আমি কার আশ্রিত, অনুসন্ধান করে, আমার গুরুপাদপদ্মের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব জেনে আমার প্রভুকে ভূম্যধিকারী মহাশয়ের প্রাসাদে তাঁর ভক্তগোষ্ঠীর মধ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন। বৈষ্ণব-ভূপতির সদৈন্য কাতর প্রার্থনা শুনে আমার গুরুপাদপদ্ম উক্ত ভূপতিকে বল্লেন যে, আমি যদি আপনার প্রাসাদে গমন করি, তা হলে হয়ত সেখানে আমার থেকে যাওয়ার ইচ্ছা হবে এবং আপনার লোকজন আমাকে আপনার সম্পত্তির ভাগীদার মনে করে আমার প্রতি মামলা মোকদ্দমা জুড়ে দিবেন। আমার মামলা-মোকদ্দমা করবার সামর্থ্য নেই, সুতরাং আপনি এই শ্রীধামের গঙ্গাপুলিনে আমার নিকট বাস করে নিশ্চিন্তে হরিভজন করুন। আমি আপনার জন্য একটি গাড়ীর ছই নির্মাণ করে দিব এবং ভিক্ষা করে আপনার গ্রাসাচ্ছাদন নির্বাহ করাব। আর আপনি আপনার সমস্ত বিষয়, সম্পত্তি গোমস্তাগণের হাতে অর্পণ করে বিষয় হতে নিবৃত্ত

হলে বৈষ্ণব হতে পারবেন, তখন আমি বৈষ্ণবের প্রাঙ্গণে নিমন্ত্রিত হয়ে আবদ্ধ থাকব। যদি আমি আজ আপনার নিমন্ত্রণ স্বীকার করে এই অপ্রাকৃত গৌরধাম হতে আপনার প্রাসাদে গিয়ে বাস করি, তাহলে কিছুদিনের মধ্যেই রাজার স্বভাব লাভ করে বিপুল ভূমি ও বিষয়-সংগ্রহের জন্য আমাকে ব্যস্ত হতে হবে। তাতে ফল হবে যে, কিছু দিনের মধ্যে আমার কৃষ্ণভজনের অভিলাষ বিষয়-সংগ্রহের পিপাসায় পর্যবসিত হয়ে আমি রাজার হিংসার পাত্ররূপে পরিগণিত হব। পক্ষান্তরে, যদি আপনি আমার কুটীরের পাশে অপর কুটীর স্থাপন করে ভজন করেন, এবং মাধুকরী গ্রহণ করে জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন, তাহলে কোনদিন আমরা প্রণয়চ্যুত হয়ে হিংসায় প্রবৃত্ত হব না। যদি আপনার ন্যায় বৈষ্ণব-বন্ধু মহারাজ আমার প্রতি কোন কৃপা-প্রদর্শন করতে ইচ্ছা করেন, তাহলে আমার ন্যায় জীবন অবলম্বন করে হরিভজন করুন, তাহলেই আমাকে কৃপা করা হবে—আমার সঙ্গে আপনার আন্তরিক বন্ধুত্ব হবে।

আমার গুরুপাদপদ্মের এইরূপ পরামর্শ শ্রবণ করে বৈষ্ণব-রাজেন্দ্র স্তম্ভিত হলেন। যাদিগকে তিনি বৈষ্ণব বলে পোষণ করেন, তাদিগের চরিত্র ও এই মহাত্মার চরিত্রের মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি করলেন। রাজার আশ্রিত ব্যক্তিগণ তাঁর রুচির অনুকূল বাক্য বলে কিছু জাগতিক লাভ অর্জনে ব্যস্ত, আর আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম রাজার রুচির বিপরীত কথা বলেও ভূপতির প্রকৃত মঙ্গল বিধানে ব্যস্ত। আমার গুরুদেব সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, জগতে কাহারও নিকট কোন কৃপা-প্রার্থী নন। সকলে নিষ্কপটে হরিভজন করুন—এই তাঁর শুভেচ্ছা। কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণে নিযুক্ত করাকেই তিনি সর্বাপেক্ষা অধিক দয়ার কার্য জানেন। বিষয়ে রুচি বা কাহারও আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ-যজ্ঞে বাতাস

দেওয়াকে তিনি 'কৃপা' জানবার পরিবর্তে ভীষণ 'হিংসা' জ্ঞান করেন।

আমার শ্রীগুরুদেব নদীয়া সহরের গঙ্গার তটের বিভিন্ন স্থানে পাগলের ন্যায় পড়ে থাকতেন। তিনি পাক করে খাওয়া, কোন বিষয়ীর ভোজ্য-দ্রব্য গ্রহণ করা, বিষয়ীর ঠাকুর বাড়ীতে খাওয়া প্রভৃতিকে সর্বতোভাবে পরিহার করেছিলেন। কখনও কাঁচা চাল জলে ভিজিয়ে খেয়ে থাকতেন, কখনও পাঁক খেয়ে থাকতেন ; অধিকাংশ সময়েই নগ্ন থাকতেন, কখনও কখনও শ্মশানে সৎকারার্থ আনীত মৃতের পরিত্যক্ত বসন সংগ্রহ করে তদ্দ্বারা অঙ্গ আবৃত করতেন। তার কাছে প্রচুর খাদ্যদ্রব্য আসত ; অনেক গৃহস্থ-বৈষ্ণব ধনাঢ্য ব্যক্তি আমার প্রভুকে অনেক টাকা, মূল্যবান শাল প্রভৃতি বস্ত্র দিতেন। টাকা পেয়ে কাপড়ের দুই পাঁচটি গ্রন্থি দিয়ে নানা স্থানে রেখেও অর্থের জন্য ব্যতিব্যস্ততা দেখাতেন। মূঢ় অর্থপ্রিয় ব্যক্তিগণ মনে করতেন যে, তাঁর অর্থে প্রচুর লোভ আছে। কেহ তাঁকে মূল্যবান বস্ত্র দিলে তিনি দাতাকে বিশেষ প্রশংসা করতেন এবং সেরূপ বস্ত্রের অকিঞ্চিৎ-করতা জানিয়ে দিতেন। তিনি বলতেন, আমি ত বৈষ্ণব হতে পারলাম না। যে-সকল লোক এ-সকল জিনিষ দিয়ে গেছেন, তাঁরা বৈষ্ণবের ব্যবহারের জন্যই দিয়েছেন ; সুতরাং বৈষ্ণবেরই উহা গ্রহণ করবার যোগ্যতা—এ বলে তিনি অনেক সময় বনমালি রায় মশায়ের নিকট ঐ সকল টাকা-পয়সা পাঠিয়ে দিতেন এবং তাঁর নিকট চিঠি লিখে জানতেন, তিনি ঐ সকল জিনিষকে বৈষ্ণবের সেবায় লাগিয়েছেন কিনা ? বনমালি রায় মশায় তখন শ্রীবৃন্দাবনে বৈষ্ণব-সেবায় তৎপর ছিলেন।

আমার গুরুপাদপদ্ম জগতের কোন কথায় প্রবিষ্ট হতেন না ; কেন-

না, আমার ন্যায় অযোগ্য ব্যক্তিকেও তিনি কৃপা করবার অভিনয় করেছিলেন। তাঁর শতাংশের একাংশের বৈরাগ্যের সহিত জগতের শ্রেষ্ঠ বৈরাগ্যবানগণের বৈরাগ্যের তুলনা হতে পারে না। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর বৈরাগ্য আমার প্রভুতেই পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত ছিল। তাঁর চরিত্র যদি জগতে প্রকাশিত হয়, আমার গুরুবর্গ যদি তাঁর অতিমর্ত্য চরিত্রের কথা জগতে অতি সরল ভাষায় প্রকাশ করেন—প্রচার করেন, তাহলে সমগ্র জগৎ লাভবান হতে পারবেন। আমার গুরুপাদপদ্ম শুধু কনক-কামিনী ছেড়ে দিতে বলছেন, এমন নহে, সাধুগিরি দেখান পর্যন্ত ছেড়ে দিতে বলছেন ; তিনি ভাগবত পরমহংস ছিলেন। পারমহংসী সংহিতা ভাগবতের আশ্রয় ব্যতীত কখনও পারমহংস্যধর্ম থাকতে পারে না।

একবার একটি কৌপীনধারী আমার গুরুপাদপদ্মের নিকট এসে বল্লেন যে, আমি কুলিয়া-নবদ্বীপে পাঁচকাঠা জমি কোন এষ্টেটের কর্মচারীর নিকট হতে সংগ্রহ করেছি। তা শুনে আমার প্রভু বল্লেন, শ্রীনবদ্বীপধাম অপ্রাকৃত, প্রাকৃত ভূম্যধিকারিগণ কি প্রকারে এখানে ভূমি প্রাপ্ত হলেন যে, তা হতে সেই কৌপীনধারীকে পাঁচ কাঠা জমি দিতে সমর্থ হয়েছেন! এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত ধনরত্ন বিনিময়ে প্রদান করলেও অপ্রাকৃত নবদ্বীপের একটি বালুকণার মূল্যের তুল্য হয় না। সুতরাং উক্ত জমিদার অত মূল্য কোথায় পাবেন যে, তাঁর নবদ্বীপের ভূমি বিক্রয় করবার অধিকার আছে? আর কৌপীনধারীরই বা কত ভজন-বল—যাতে তিনি ভজনমুদ্রার বিনিময়ে অত জমি সংগ্রহ করতে পেরেছেন। শ্রীনবদ্বীপধামের ভূমিতে প্রাকৃত-বুদ্ধি করলে ধামবাস হওয়া দূরে থাক, ধামাপরাধ হয়ে থাকে। অপ্রাকৃত-তত্ত্বকে 'প্রাকৃত' জ্ঞান করলে তাত্ত্বিক লোক তাকে 'প্রাকৃত সহজিয়া' বলেন।

আর এক সময় একজন ভাগবতের কথকতায় বিশেষ নিপুণ, 'গোস্বামী' নামে পরিচিত ব্যক্তির লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার ব্যাখ্যা সাধারণের মুখে শ্রবণ করে তিনি সেই ভাগবত-কথক বহুশিষ্য-সংগ্রাহক গোস্বামী মশায়ের ভক্তি-প্রচারের সবিশেষ তথ্য অনুসন্ধান করেন। সেই গোস্বামী মশায় 'গৌর গৌর' বলান ও অসংখ্য শিষ্য-সংগ্রহের চাতুরী জানেন শুনে আমার প্রভু বল্লেন, ঐ প্রতিষ্ঠাশালী পাঠক ভাগবত ব্যাখ্যা বা 'গৌর, গৌর' বলান নাই, 'টাকা, টাকা', 'আমার টাকা' বলে চীৎকার করেছেন, উহা কখনই ভজন নহে, সত্যধর্মের আবরণ-মাত্র ; তদ্দ্বারা জগতের অনিষ্ট ব্যতীত কোন উপকার সাধিত হবে না।

আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিষ্কপটতা ও নিরপেক্ষতার আদর্শ-স্বরূপ অপার্থিব চরিত্রের সম্বন্ধে অসংখ্য কথা আমরা শুনেছি ও প্রত্যক্ষ করেছি।

সকল শব্দই বিষ্ণুকে উদ্দেশ করছে। যে শব্দ বিষ্ণু হতে পৃথক হয়ে অন্য কিছুর উদ্দেশ করে, তা শব্দের অজ্ঞরূঢ়ি ; তাতে কৃষ্ণের অদ্বিতীয় ভোক্তৃত্ব-বিচারের পরিবর্তে জীবের মায়া-ভোক্তৃত্বের বিচার আনয়ন করে। আমরা দর্শনের বড় বড় কথাগুলি—ভাগবতের প্রতি-পাদ্য বিষয়গুলি আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্মে অতি সরলভাবে আকারিত দেখতে পেয়েছি। যদি ভগবানের অনুগ্রহ হয়, তা হলে তিনি অতি সোজা কথায় মানবজাতিকে এ সকল কথা জানিয়ে দেন। তখনই তারা বুঝতে পারে, বাস্তব সত্য কি জিনিষ, আর কাল্পনিক ও আপাততঃ জগতের কাজ চালান সত্য বা আপেক্ষিক সত্য কি জিনিষ।

লোকে বলে,—আজ আমার গুরুপাদপদ্মের অপ্রকটের দিন, কিন্তু আমি মনে করি, আজ তাঁর প্রাকট্যের দিবস। তাঁর কথা সহস্রমুখে,

কোটিমুখে—সহস্র ইন্দ্রিয়ে, কোটি ইন্দ্রিয়ে কীর্তন করে নিত্যকাল যেন তাঁর পূজা করতে পারি। শ্রীচৈতন্য-মনোঽভীষ্ট-স্থাপনকারী শ্রীরূপ প্রভুর মনোঽভীষ্ট-স্থাপনে যেন আমাদের সর্বেন্দ্রিয় নিযুক্ত হয়।

আমার নিত্য প্রভুর কথা বলবার চেষ্টা দেখাতে গিয়ে আমি আপনাদের অনেক সময় গ্রহণ করলাম। আপনারা কৃপা করে আমার নিত্যপ্রভুর কথা শ্রবণ করেছেন; সুতরাং আপনাদের চরণেও গুরু-বুদ্ধিতে প্রণাম করছি।

[শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ অবতরণপূর্বক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী প্রভুর আলেখ্য শ্রীমূর্তির সম্মুখে ভূপতিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। তৎপরে সমবেতকণ্ঠে নিম্নলিখিত কীর্তনটি গীত হইল,—

যে অনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর।
হেন প্রভু কোথা গেলা গৌরকিশোর ॥
কাঁহা মোর স্বরূপ-রূপ, কাঁহা সনাতন?
কাঁহা দাস রঘুনাথ পতিতপাবন?
কাঁহা মোর ভট্টযুগ, কাঁহা কবিরাজ?
এক-কালে কোথা গেলা গোরা নটরাজ?
পাষাণে কুটিব মাথা, অনলে পশিব।
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব?
সে সব সঙ্গীর সঙ্গে যে কৈল বিলাস।
সে সঙ্গ না পাঞা কান্দে এ অধম দাস ॥]

শ্রীগুরু-তত্ত্ব ও প্রকৃত দর্শন

ব্যভিচার-বৃত্তি দ্বারা কখনও সেবা হয় না। সেবা জিনিষটা—অব্যভিচারিণী, অহৈতুকী, অপ্রতিহতা আত্মবৃত্তি। বেদান্ত-বোধই হতে পারে না—গুরুপাদপদ্মের অব্যভিচারিণী সেবা ব্যতীত। ভগবদ্ভক্ত ব্যতীত কেহ গুরুই হতে পারেন না—এটা গোঁড়ামির কথা নয়, বাস্তব-সত্য,—

মহাকুলপ্রসূতোঽপি সর্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ॥

পূর্বকালে দক্ষিণ প্রদেশে কাঞ্চিপুর নামক একটী নগর ছিল। সেখানে যাদবপ্রকাশ নামে একজন বিশেষ প্রসিদ্ধ অধ্যাপক বাস করতেন। সে সময় সে দেশে তাঁর সমকক্ষ কোন দ্বিতীয় অধ্যাপক ছিলেন না বলে জনশ্রুতি। লক্ষ্মণ দেশিক (আচার্য শ্রীরামানুজ) তাঁর নিকট বিদ্যাশিক্ষার জন্য গমন করেছিলেন এবং সেই গুরুর অন্তেবাসী হয়ে ঐকান্তিক শাস্ত্রানুশীলন ও অকৃত্রিম ব্যবহারের দ্বারা অল্প দিনের মধ্যেই যাদবপ্রকাশের স্নেহদৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন। একদিন যাদবপ্রকাশ "তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী" ছান্দোগ্য শ্রুতির শঙ্করাচার্যমতানুসারিণী ব্যাখ্যা স্থলে "আস্যতে উপবিশ্যতে অনেন ইতি আসঃ পশ্চাদ্ভাগঃ কপেঃ আসঃ কপ্যাসঃ" এইরূপ ব্যাখ্যা করে পুণ্ডরীকাক্ষ ভগবানের চক্ষুর্দ্বয় বানরের পশ্চাদ্ভাগের ন্যায় রক্তবর্ণ অর্থ করায় রামানুজ হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত প্রাপ্ত হন। রামানুজ তখন যাদবপ্রকাশের অভ্যঙ্গ-সেবায় রত ছিলেন। ভগবানের শ্রীমূর্তির নিন্দা-শ্রবণে তাঁর হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হলো। তাঁর দুই চক্ষু হতে তপ্ত অশ্রুধারা দরদর

ধারে নির্গত হয়ে যাদবপ্রকাশের পৃষ্ঠদেশে দু'এক বিন্দুরূপে পতিত হলে যাদবপ্রকাশ হঠাৎ চমকিত হয়ে রামানুজকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন; রামানুজ তখন বললেন যে, 'কপ্যাসং' শ্রুতির সুন্দর অর্থ থাকতে এরূপ জঘন্য অপরাধজনক অর্থ করবার প্রয়োজন কি? যিনি পরমারাধ্য পরমেশ্বর, তাঁর অপ্রাকৃত চক্ষের সহিত মর্কটের জঘন্য প্রদেশের তুলনা করা কি অত্যন্ত অপরাধের কার্য নয়? রামানুজের এই কথা শুনে যাদবপ্রকাশ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, কি এত বড় আস্পর্দ্ধা! সামান্য বালকের আচার্য শঙ্করের ব্যাখ্যার দোষ-দর্শন! শ্রুতির আচার্যের ব্যাখ্যা অপেক্ষা আর উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা কি হতে পারে? রামানুজ তখন বিনয়-নম্রবচনে বললেন,—হাঁ আচার্য অদৈব-প্রকৃতি ব্যক্তিগণকে বিমোহিত করবার জন্য যে ব্যাখ্যা করেছেন, তা ছাড়া শ্রুতির দিব্যসূরিগণের আনন্দবর্দ্ধিনী ব্যাখ্যা আছে। আমি বলছি, আপনি কৃপাপূর্বক শ্রবণ করুন। তখন রামানুজ 'কপ্যাসং' শ্রুতির এরূপ ব্যাখ্যা করলেন,—"কং জলং পিবতি ইতি কপিঃ নালঃ তস্মিন্ আস্তে তিষ্ঠতি ইতিক প্যাসং নালস্থিতমিত্যর্থঃ" অর্থাৎ তাঁর (পুরুষোত্তমের) চক্ষুর্দ্বয় নালস্থিত অম্লান পদ্মের ন্যায় রক্তিমাভ। যাদব-প্রকাশ এই ব্যাখ্যা শুনে অত্যন্ত বিস্মিত হলেন এবং শিষ্যের নিকট পরাজিত হয়ে গোপনে গোপনে রামানুজকে সংহার করবার জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠলেন।

নির্ভেদ-জ্ঞানিগুরু, কর্ম্মিগুরু, যোগিগুরু, ব্রতিগুরু, তপস্বিগুরু, ঐন্দ্রজালিকগুরু, কপটগুরু কখনই 'গুরু' পদবাচ্য হতে পারেন না, তাঁরা সকলেই—লঘু। তাঁরা জীবের উপকারক নন,—আত্মহিংসক ও পরহিংসক। কিন্তু একমাত্র মহাভাগবত বৈষ্ণব-গুরুই জীবে অহৈতুক দয়াময়, পরদুঃখ-দুঃখী; এজন্য আমাদের পূর্বগুরু শ্রীল রঘুনাথ দাস

গোস্বামী প্রভু সেই পরদুঃখ-দুঃখী সম্বন্ধজ্ঞানদাতা সনাতন প্রভুকে আশ্রয় করবার উপদেশ প্রদান করেছেন,—

বৈরাগ্যযুগ্ভক্তিরসং প্রযত্নৈরপায়য়ন্মামনভীপ্সুমন্ধম্।
কৃপাম্বুধির্যঃ পরদুঃখদুঃখী সনাতনং তং প্রভুমাশ্রয়ামি ॥

জ্ঞানলাভের আকর কেবল-চেতন, না মিশ্রিত-চেতন—কৈবল্যৈক-প্রয়োজনম্, না অন্য কিছু? একথাগুলি চিন্মাত্রবাদ থেকে এসেছে, না অচিন্মাত্রবাদ থেকে এসেছে, কিম্বা নিত্যানন্দময় চিদ্‌বিলাস থেকে এসেছে, সর্বাগ্রে স্থির হওয়া আবশ্যক। জড়ে একীভূত হয়ে যাওয়ার নাম—অচিন্মাত্রবাদ, চেতনে একীভূত হয়ে যাওয়ার নাম—চিন্মাত্রবাদ, আর নিত্য আনন্দময় চেতনরাজ্যে নিত্য-ভগবৎসেবা করার নাম—পরম নিরপেক্ষ হয়ে নির্বিবাদে চিদ্‌বিলাসে অবস্থান।

শ্রীমদ্ভাগবতের কথিত মুক্তি—ত্রিপুটীবিনাশমাত্র নয়, তা স্বরূপে অবস্থান। "মুক্তির্হিত্বাঽন্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।" স্বরূপে অবস্থিত হলে অচেতনতা স্পর্শ করতে পারে না, তখন চেতনের ক্রিয়া যে সেবা, তা পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়—যাঁর চেতনে যেটী নিত্যসিদ্ধসেবা, সেই অপ্রতিহতা সেবাটী তখন বিকসিতা হয়ে উঠে,—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥

ভগবান্ বলছেন, আমাকে যে-ভাবে যে পূজা করেন, আমিও তাঁকে সেই ভাবে পূজা করে থাকি। কান্তরসে সর্বাঙ্গ দিয়ে সেবা, কাজেই কৃষ্ণও সেখানে তাঁর সর্বাঙ্গকে বিলায়ে দেন—আপনাকে দিয়েও ঋণী জ্ঞান করেন। এখানে 'মাং' শব্দটী লক্ষ্য করতে হবে। 'মাং' শব্দ সাক্ষাদ্ভাবে কৃষ্ণকে লক্ষ্য করছে। কৃষ্ণ বলছেন,—আমাকে যে পাঁচ প্রকারে পূজা করে, তাঁর যে কোন প্রকারের তটস্থগত বিচারের প্রপত্তির

তারতম্যতা লক্ষিত হয়। কান্তরসে প্রপত্তির পরাকাষ্ঠা। 'আমাতে' যদি না হয়, আমার ছায়া বা বহিরঙ্গা মায়াতে হলে আমাতে প্রপত্তি হলো না। দধিকে যদি দুগ্ধ বলা যায়, তা হলে হবে না। দধির আকর দুগ্ধ বটে, বিকৃত দুগ্ধ কখনই দধি নয়। যদি কেউ বিষ্ণুর বিকৃত কল্পনা দর্শন করে সেই বিকৃত দর্শনের শরণাগত হন, তা হলে হবে না। বিষ্ণুর বিকার হয় না; কিন্তু যিনি দেখছেন, তাঁর যদি দর্শন বিকারপ্রসূত ব্যাপার হয়, তা হলে বিষ্ণু-দর্শন হলো না, জানতে হবে।

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্॥

কৃষ্ণ ব্যতীত ইতর বস্তু দর্শনই অবৈধ দর্শন। এ অবৈধ দর্শনেই আমাদের যত অমঙ্গল ও ভেদবুদ্ধি। এরূপ অবৈধ-দর্শনের অবস্থাটা কেটে গেলে সত্যসত্যই কৃষ্ণকে দেখতে পাওয়া যায়। কৃষ্ণ—অখিল-রসামৃতসিন্ধু। তিনি দ্বাদশ রসের আশ্রয়। পাঁচটা মুখ্যরস ও তৎপরি-পোষক সাতটি গৌণ রস কৃষ্ণেই পূর্ণভাবে সমন্বিত হয়েছে।

মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্তিমান্
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ॥

শ্রীশুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিৎ মহারাজকে বললেন—অখিলরস-কদম্বস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের কয়েকটী রসের পরিচয় প্রদান করছি, শ্রবণ করুন। যখন বলদেবের সহিত শ্রীকৃষ্ণ কংসের রঙ্গালয়ে উপস্থিত হলেন, তখন যাঁর যেই রস, তিনি সেই রসে কৃষ্ণকে দেখতে লাগলেন। বীর-রসপ্রিয় মল্লগণ দেখল, যেন কৃষ্ণ তাদের নিকট সাক্ষাৎ বজ্রস্বরূপে উদিত হলেন এবং মধুর-রসপ্রিয় স্ত্রীগণ তাঁকে সাক্ষাৎ মূর্তিমান মন্মথরূপে দর্শন

করলেন। নর-সমূহ জগতের একমাত্র নরপতি ও সখ্য-বাৎসল্যপ্রিয় গোপসকল তাঁকে স্বজনরূপে দেখতে লাগলেন। ভয়ার্ত অসৎ রাজগণ শাসনকর্তৃরূপে কৃষ্ণকে দর্শন করতে লাগলেন। পিতা-মাতা তাঁকে সুন্দর শিশুরূপে দর্শন করলেন। ভোজপতি কংস সাক্ষাৎ মৃত্যুরূপে, জড়বুদ্ধি ব্যক্তিগণ বিরাট্‌রূপে, শান্তরসের পরম যোগিসকল পরতত্ত্ব-রূপে এবং বৃষ্ণিবংশীয় পুরুষগণ পরদেবতারূপে তাঁকে প্রত্যক্ষ করে-ছিলেন।

অন্য কথায় ঘুরে টুরে এসে সকলেই কৃষ্ণসেবা পাবেন। কারণ কৃষ্ণই একমাত্র আকর্ষক, আর আমরা আকর্ষণীয়। সেই আকর্ষক ও আকর্ষণীয়ের মাঝখানে যে আগন্তুক আড়াল এসে পড়েছে, সেই আড়ালটা সরে গেলেই আকর্ষকের আকর্ষণের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ হবে।

অচিৎএর সহিত যে সংশ্রব, তার নামই দুঃসঙ্গ। দেহ ও মনের দ্বারা সেই দুঃসঙ্গ হয়। এই দুঃসঙ্গ ছেড়ে দিলে আমাদের আকর্ষণীয় স্বরূপ আকর্ষক কৃষ্ণের সাক্ষাৎ আকর্ষণের সহিত মিলিত হয়। কৃষ্ণ কেবল চেতনকে আকর্ষণ করেন। কেবল চেতন হতে কৈবল্যভাব গৃহীত না হলে চেতন-রাজ্যের আরদালী সকল প্রবেশ-নিষেধ বলবে। বহির্জগতের প্রমাণ থেকে সূক্ষ্ম আকারে যে সকল জিনিষ গৃহীত হয়, সেই সকল জিনিষের আকর্ষণও ঔপাধিক। কৃষ্ণজ্ঞান ব্যতীত ব্রহ্মজ্ঞান, পরমাত্মজ্ঞান বা প্রাকৃতজ্ঞান যে প্রমা কর্তৃক গৃহীত হয়, তা জ্ঞানের স্তরবিশেষ। নির্বিশেষবাদীর ধারণায় যে ব্রহ্ম, তাতে ব্রহ্মদর্শন বলে কোন জিনিষ হতে পারে না। যোগিগণের বিচারে পরমাত্ম-দর্শন বা ঈশ্বর-সাযুজ্য ব্রহ্ম-সাযুজ্য অপেক্ষাও অধিকতর অপরাধের কথা। ব্রহ্ম-সাযুজ্যে জীবের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় না, ঈশ্বর-সাযুজ্যে জীবাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে জীবাত্মাকে পরমাত্মার আসন অধিকার করাবার চেষ্টা—

আরও অধিকতর পরমেশ্বর-দ্রোহিতা। এজন্য মহাপ্রভু বলেছেন,—“ব্রহ্ম-সাযুজ্য হইতে ঈশ্বর-সাযুজ্য ধিক্কার।”

এ সকল কথা আলোচনা করতে হলে সর্বপ্রথমে আমাদের জ্ঞানের আকরের আবশ্যক। এ সকল আলোচনার আকর কি মিশ্রিত চেতন? অথবা অবিমিশ্র চেতন? ইহা কি মনুষ্য-প্রণীত আকর হতে আগত? অথবা ভগবৎপ্রণীত আকর? মনুষ্যপ্রণীত আকর হলে ভ্রম-প্রমাদাদি থাকবে।

‘আমি’ জিনিষটা কি? পিতা-মাতা হতে যে শরীরটা লাভ করেছি, সেটা কি আমি? না যে মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার দিয়ে সঙ্কল্প-বিকল্প, ভাঙ্গা-গড়া করছি, সে জিনিষগুলি আমি? এতে প্রচুর কথা আছে। আমাদের জীবনের অতি প্রারম্ভ কাল হতে এসব আলোচনা শুনবার অবসর হয়েছিল। ৫০ বৎসরকাল এসব কথাই আলোচনা করছি—প্রচুর পরিমাণে সর্বক্ষণ আলোচনা করবার সময় পেয়েছি—২৪ ঘণ্টাকাল এসকল কথা আলোচনা করেছি—ঘুমোবার সময়ও আলোচনা করেছি, জাগ্রত থাকবার সময়ও আলোচনা করেছি। আর এ জিনিষটা আলোচনা করতে করতেই আমার শরীরও পতন হয়ে যাবে।

‘আমির’ বিচারের অন্দরমহলে ঢুকবার পূর্বে দুটো ফটকে দুটো দ্বারোয়ান দাঁড়িয়ে রয়েছে, তারা ‘আমির’ কাছে যেতে দিচ্ছে না। কৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ কেন পাচ্ছি না? কৃষ্ণের পঞ্চমজুষ-মুরলী-নিনাদ কাণে আসছে না কেন? রাস্তার গোলমাল, জগতের কর্মকোলাহল কাণে ঢুকছে কেন? বর্তমান সময়ে আত্মা সুপ্ত থাকার জন্য এজেণ্ট সূত্রে ম্যানেজার-সূত্রে মাঝপথে মন ফাঁকি দিচ্ছে। মনোধর্মজীবী আমাকে—আত্মাকে ফাঁকি-দেওয়া-মন কুপরামর্শ দিয়ে প্রেয়ঃপথে নিযুক্ত করছে। মনের মনিব, দেহের মনিব—আত্মা, বাক হচ্ছে—ফোরম্যান, যেমন

জুরীর ফোরম্যান থাকে। চেতনের বাক একপ্রকার, আর অচেতনের বাক অন্য প্রকার। মনটা হচ্ছে—অনাত্মা, তার প্রমাণ—গীতা,—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥

পরা প্রকৃতি—জীব, তা তটস্থধর্মযুক্ত। জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গের সহিত তাঁর সম্বন্ধ রয়েছে। পরা প্রকৃতি—যাকে অপ্রাকৃত ব্যাপার বলা হয়, তাতেও জীবের স্থান আছে। পরাবিদ্যার অন্তর্গত—অক্ষর, অপরাবিদ্যার অন্তর্গত—ক্ষর। পরাবিদ্যার আশ্রয়—সুমতি। বেদে সুমতি বলে কথা আছে,—"ওঁ আস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবক্তন্ মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে ওঁ তৎসৎ।" আমাদিগের সুমতি লাভ হউক, আমরা যেন সেই সুমতি ভজন করবার মত সুমতি লাভ করতে পারি।

উপাস্য পর্যায়, উপাসক পর্যায় ও বাস্তব-অবাস্তব-বস্তু-বিজ্ঞান

সদোপাস্যঃ শ্রীমান্ ধৃতমনুজকায়ৈঃ প্রণয়িতাং
বহদ্ভির্গীর্বাণৈর্গিরিশপরমেষ্ঠিপ্রভৃতিভিঃ।
স্বভক্তেভ্যঃ শুদ্ধাং নিজভজনমুদ্রামুপদিশন্
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥

উপনয়ন বলে একটি কার্য আছে। মনু বলেন,—

মাতুরগ্রেঽধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনে।
তৃতীয়ং যজ্ঞদীক্ষায়াং দ্বিজস্য শ্রুতিচোদনাৎ ॥

শ্রুতির উক্তি হতে জানা যায়, মানুষের জন্ম ত্রিবিধ—শৌক্র, সাবিত্র্য ও দৈক্ষ্য। মাতৃকুক্ষি হতে প্রথম জন্মই শৌক্র-জন্ম, পরে সাবিত্র্য সংস্কার-লাভে দ্বিতীয় জন্ম, তৎপরে যজ্ঞদীক্ষা লাভে তৃতীয় জন্ম। সর্বাগ্রে আমরা পিতার ঔরসে মাতৃকুক্ষি হতে শরীর লাভ করি, এটা একপ্রকার শরীর; দ্বিতীয় প্রকার শরীর—যে সময় আচার্য-পিতা ও গায়ত্রী-মাতার সংযোগে মৌঞ্জিবন্ধনকালে লাভ হয়। "ত্বাং অহং বেদ-সমীপে নেষ্যে" প্রভৃতি মন্ত্রে যখন আচার্য পিতা বেদ অধ্যয়ন করাবার জন্য মৌঞ্জিবন্ধন করেন, তখন আমাদের আচার্যের গৃহে যে জন্ম হয়, সেটি দ্বিতীয় জন্ম। কেবল শরীরটা রক্ষা হউক, এমন নহে, বেদ অর্থাৎ জ্ঞান সংগ্রহ হউক—এই উপলক্ষ করে মৌঞ্জিবন্ধন। তৃতীয় জন্ম হয় আমাদের যজ্ঞদীক্ষাকালে, এর নাম—দৈক্ষ্য-জন্ম। দৈক্ষ্য-জন্মের কার্য—যজ্ঞ—উপাসনা। 'উপাসনা' অর্থে—সমীপে বাস। 'উপ পূর্বক আস্ ধাতু ভাবে অনট্।' ইহা দীক্ষা গ্রহণের পরিবর্তিকালের আনুষ্ঠানিক কার্য। বাস্তববেদমূর্তির সম্মুখে উপস্থিত হয়ে আমরা যে কার্য করি, তারই নাম—উপাসনা। যাঁর

নিকট উপনীত হয়ে বাস করি, তাঁকে উপাস্য বলে ; তিনি বেদপুরুষ যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু। যে জন্য বাস করি, সেটা উপাসনা, সেটাই হচ্ছে—যজ্ঞ।

যজ্ঞের বিধি ভিন্ন যুগে ভিন্ন রকমের,—

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাৎ॥

১। ধ্যান-যজ্ঞ—সত্যযুগে, যখন চারপাদ ধর্ম ; ২। মখ-যজ্ঞ—ত্রেতাযুগে, যখন তিনপাদ ধর্ম ; ৩। পরিচর্যা-যজ্ঞ—দ্বাপরযুগে, যখন দুইপাদ ধর্ম ; ৪। কীর্তন-যজ্ঞ—কলিযুগে, যখন তিনপাদ ধর্ম বিনষ্ট হয়েছে, এক পাদে ধর্ম কোনরূপে অবস্থান করছেন।

বেদ-শাস্ত্র শ্রুতি বা কীর্তনমুখে এখানে এসেছে। এখন কলিকাল—বিবাদযুগ ; যে কোন কথা বলি না কেন, সঙ্গে-সঙ্গে তর্ক, প্রতিবাদ হয়ে থাকে। হরিকীর্তনই একমাত্র শ্রৌতপথ। ঐকান্তিক শ্রৌতগুরু শ্রীমৎ পূর্ণপ্রজ্ঞ মধ্বাচার্য মুণ্ডকোপনিষদ ভাষ্যে নারায়ণ সংহিতার বাক্য উদ্ধার করে বলছেন :—

দ্বাপরীয়ৈর্জনৈর্বিষ্ণুঃ পঞ্চরাত্রৈস্তু কেবলৈঃ।
কলৌ তু নামমাত্রেণ পূজ্যতে ভগবান্ হরিঃ।

উপাস্য-বস্তু-বিষয়ের আলোচনা করা দরকার। যদি অচেতন পদার্থের নিকট বসে থাকি বা উপনীত হই, তা হলে অচেতন পদার্থকে কাজে লাগিয়ে দিতে ইচ্ছা হয়—আমাদের সেবা করিয়ে নিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু সে জিনিষটা চেতন, তা স্বতন্ত্র, তার ঘাড়ে যদি উঠতে চেষ্টা করি, তা হলে সে বাধা দেয়। পূর্ণ চেতন, পূর্ণ স্বতন্ত্রকে মোটেই আমাদের কাজে লাগাতে পারি না, আমরা তাঁর কাজে লেগে যেতে বাধ্য হই। আজকালকার 'ইউটিলিটেরিয়ান থিওরি' (Utilitarian

theory) নদীর জল, বায়ু, নায়েগ্রা-প্রপাত সকলকেই কাজে লাগিয়ে দিচ্ছে ; কিন্তু আমরা চেতন বস্তুকে—পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তুকে সেরূপভাবে কাজে লাগিয়ে দিতে পারি না—তিনি আমাদের অধীনে আসেন না।

পৃথিবীতে থাকা কালে আমাদের বিচার প্রবল হয়েছে, অন্য বস্তু আমাদের সেবা করুক—আমরা উপাস্য হই। আমরা উপাসকের সজ্জায় অন্য বস্তুকে যে পূজা করবার অভিনয় দেখাই, এই উপাসনা কি মিশ্রভাবযুক্ত, না অমিশ্র? ঋষিবংশ যজ্ঞাদি করতেন, ধ্যানাদি করতেন, তাঁরা অপরের সেব্য—এ বুদ্ধি করতেন না ; তাঁরা দেবতাগণের সেবা করতেন। উপাসনাকাণ্ডে দেখি, তাঁরা,—

অগ্নে (গ্রে) নয় সুপথা রায়ে অস্মান্,
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো, ভূয়িষ্ঠাং তে
নম-উক্তিং বিধেম ॥

—প্রভৃতি মন্ত্রে দেবগণের স্তব করছেন—স্তবগুলিকে উপাসনার অঙ্গ জ্ঞান করছেন। এ সকল কথার প্রমাণ অতি প্রাচীনতম বৈদিক ইতিহাসে সুস্পষ্ট রয়েছে। তাঁরা নিজদিগকে উপাস্য বস্তু মনে করেন নি, দেবতার উপাসনা করেছেন। সুতরাং 'উপাসনা' বলে যে জিনিষ, তা নূতন তৈরী হয়েছে, এরূপ কথা কেবলজ্ঞানাবলম্বী বা কেবলাদ্বৈতবাদী যেরূপ স্থির করেছেন,—ব্রহ্মের সহিত একীভূত হয়ে যাওয়াই পুরুষার্থ, এরূপ বিচার জন্মগ্রহণ করবার বহু পূর্বে জীবের সহজ সরল বৃত্তিতে, সেবা করব, উপাসনা করব,—এরূপ বিচারই ছিল। আজকাল কলিকালের বিচার হয়েছে,—উপাসনা পরবর্তিকালে তৈরী হয়েছে? কিন্তু উহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। যেখানে চেতন ধর্ম সেখানেই উপাসনার কথা প্রচলিত ছিল।

সর্বাগ্রে ব্রহ্মার হৃদয়ে ব্রহ্ম বা বেদ-বস্তু স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হয়েছিল—বাস্তব-সত্য ব্রহ্মার হৃদয়ে স্ফূর্তি হয়েছিল।

ব্রহ্মার সন্তানগণই ঋষি ও দেবতা। দেবতাগণ অশেষ দীপ্তিসম্পন্ন। এজন্য ঋষিগণ যত্নপূর্বক দেবতাদের সেবা করতেন। এই সেব্য-সেবক ভাব দেবতা ও ঋষিগণের মধ্যে চিরকালই ছিল।

আমাদের চেতনের আদি বিকাশে লক্ষ্য করি—সভ্যতা বা বুদ্ধিমত্তার আলোচনার প্রাক্কালেও লক্ষ্য করি যে, সেবা বা উপাসনা আমাদের স্বাভাবিকী বৃত্তি। পরবর্তী সময়ে যত ধর্ম-প্রণালী লক্ষ্য করি, প্রাগ ইতিহাস-সমূহেও দেখি, আমাদের সেবা করবার বৃত্তিটী স্বাভাবিক।

কলিকালে এত বিবাদ এসে উপস্থিত হয়েছে, যেহেতু আমরা প্রভুত্ব করবার জন্য ব্যস্ত হয়েছি। ইউটিলিটেরিয়ান থিওরি প্রচুর পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত হয়েছে—যত বস্তু আমাদের কাজে লাগিয়ে দিতে পারা যায়। প্রত্যেক ব্যক্তি উপাস্য হবার জন্য কতই না উপাসনা করে। সভ্যতার প্রাক্কালে 'বিনিময়' বলে একটা ব্যাপার উদ্ভূত হয়েছিল। আমি যদি কারো সেবা করে দেই, তখন তিনি আমাকে কিছু মূল্য দেন। মনুষ্য-জাতি সেব্য-সেবকভাবে পরস্পরের মধ্যে অবস্থিত আছে। ইহজগতে সেবা করার যন্ত্র আমাদের এগারটি—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, বাক, পাণি, পায়ু, পাদ, উপস্থ ও মন। ঐ সকল করণের দ্বারা আমরা পরস্পরের মধ্যে বৃত্তির পরিবর্তন করে থাকি। একজন শ্রেষ্ঠ হয়ে থাকেন, আর একজন অধীন হয়ে থাকেন। একজনের নিম্ন ভূমিকা, আর একজনের উচ্চ ভূমিকা। একজন আর একজনের সেবা করছে।

মানবমাত্রেই—প্রাণীমাত্রেই—চিদচিৎ বস্তুমাত্রেই উপাসক, উপাসনা ও উপাস্য—এই তিনপ্রকার সম্বন্ধে অবস্থিত—সেব্য-সেবকভাবে একবস্তু অপর বস্তুর সহিত অবস্থিত। যেখানে একের অধিক 'অনেক' বলে

বস্তু উপস্থিত হয়েছে, সেখানে একটি অপরকে সেবা করছে। চিদচিৎ জগতে আমরা এই উপাসনা বলে ব্যাপার লক্ষ্য করছি অথচ আমরা বুদ্ধিমান ও যুক্তিপরায়ণ অভিমান করে নির্বিশেষবাদকে স্থাপন করতে চাই। নির্বিশেষ জ্ঞান যদি আমার উপাস্য হয়, তা হলে সেরূপ উপাস্যের উপাসনা করবার জন্য আমি যে চেষ্টা করি, তাই আমার উপাসনা-চেষ্টা মাত্র।

নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধিৎসু বলেন,—জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান—তিন রকম ধরণের বিচার যেখানে একীভূত হয়েছে, সেখানে বুদ্ধিমত্তার শেষ সীমা। বিচিত্রতা লোপ হউক—একজন দেখছে আর একজন দেখাচ্ছে—এদের উভয়ের বৃত্তি রহিত হয়ে যাক—এই ব্যাপারটীর নাম—জাড্য। আলোকের দ্রষ্টা, আলোক এবং আলোক-দর্শন-কার্য নষ্ট হয়ে গেল, উপাসনার হাত থেকে—ত্রিতত্ত্বের হাত থেকে এড়িয়ে যেতে পারলাম মনে করি। আমরা কোন একটা কার্যের মধ্যে আছি—কর্ম করতে বসেছি, তা নষ্ট হয়ে গেলে কর্ম নষ্ট হয়ে যায়, আমাদের এবিচার উপস্থিত হয়েছে।

অনশ্বর বৈকুণ্ঠ ও নশ্বর জগতের মধ্যে আমাদের তটস্থ অবস্থান। এখানকার প্রাকৃত সকল ধরণের কথা শেষ হবে—যদি আমরা তটভূমিতে গিয়ে পৌঁছি। অচিৎএর অনুসন্ধান যে-কাল পর্যন্ত করছি, সেকাল পর্যন্ত মনে হচ্ছে, জ্ঞেয়, জ্ঞান ও জ্ঞাতা বিনষ্ট হলে আমরা অমঙ্গলের হাত হতে উদ্ধার পাব। এরূপ প্রস্তাব যে স্থানে গিয়ে পৌঁছায়, সে-স্থানের দুই দিক নেই—ব্রহ্মাণ্ড নেই, বৈকুণ্ঠ নেই। তটস্থশক্তি থেকে পরিণত হচ্ছে জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান। এটা হচ্ছে, সত্যবস্তুর একটা নশ্বর বিভাগ। এখানে যে উপাসক, উপাস্য, উপাসনা প্রভৃতির অভিমান ও আচরণ করে থাকি, তা এক নহে,—বহু। কথায় বলে

একজন সেবক বহু বস্তুর সেবা করতে পারে না। এখানকার বস্তুর যখন সেবা করতে যাই, তখন কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য প্রভৃতির সেবা হয়ে যায়। উপাস্য, উপাসক ও উপাসনা একীভূত হয়ে গেলে মহা হিংসা এসে উপস্থিত হয়।

বুদ্ধিমান লোকগণ বলেন যে, ইতিহাসে চিরদিন ভক্তির কথা রয়েছে—ভক্তির বৃত্তিতে প্রত্যেক বস্তু সেব্য-সেবক-ভাবে আবদ্ধ রয়েছে। তার মধ্যে সেব্য হয়ে যাওয়াটাই অভদ্র।

উপাস্য হব, না উপাসক হব? এক প্রকার সম্প্রদায় আছে, তাদের বলা হয়—বাউল। বাউল বলে,—"আমি ভোক্তা, এই গৃহ আমার ভোগ্য, গৃহ আমার সেবা করবে।" বাউল দুই প্রকারের—গৃহী বাউল ও ত্যাগী বাউল। কতকগুলি ত্যাগী বাউল আছে, তারা ভোগই করবে মতলব করে কৃষ্ণসজ্জায় সজ্জিত হয়—কৃষ্ণ হয়ে যাওয়াটাই ভাল মনে করে। 'আমার অধীন অন্যান্য লোক থাকুক', তাদের এরূপ বিচার!

শ্রীগৌরসুন্দর এই মতবাদ স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, বেদান্ত বা বেদের তাৎপর্য কেবলাদ্বৈতবাদ হতে পারে না। তিনি বলেন, বেদে তিন প্রকার কথা আছে,— সম্বন্ধ, অভিধেয় এবং প্রয়োজন। ইহারা বিপর্যস্ত হতে পারে না। মহাপ্রভু শক্তি-পরিণামবাদের কথা বলেন, বিবর্তবাদের কথা বলেন না।

বৃদ্ধবৈষ্ণব মধ্বাচার্যপাদ বলেন,—বিষ্ণুই পুরুষোত্তম বস্তু, তিনি পরতত্ত্ব। নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধিৎসু বলেন, পরতত্ত্ব—নির্বিশেষ ব্রহ্ম; কিন্তু এটা বদ্ধাবস্থার কথা। মুক্ত অবস্থায় তার বিচার নিরস্ত হয়েছে। সকলের মূল বস্তু হচ্ছেন বিষ্ণু; বিষ্ণুতেই পরতমতা আছে তাঁতেই সব সৌন্দর্য আছে। আমাদের নিত্য আচমনীয় মন্ত্রেও আমরা দেখতেপাই,—

অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্বাবস্থাং গতোঽপি বা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরে শুচিঃ॥

সদাচার যাঁর যত বেশী আছে, তিনি সেই পরিমাণে শ্রেষ্ঠ। বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ সর্বশ্রেষ্ঠ, যেহেতু আচার্যের নিকট তিনি আচার শিক্ষা করেছেন। ক্ষত্রিয় পৃথিবীর রক্ষাকর্তা, তাঁরা রাজনীতি নিয়ে থাকেন। আর যাঁরা ব্রহ্মজ্ঞানাদি বা ভগবৎসেবায় অত্যন্ত ব্যস্ত, তাঁদের অন্যান্য কার্য করবার সময় বড় কম।

ব্রাহ্মণের জীবন—ভিক্ষুকের জীবন। ব্রহ্মজ্ঞানই যাঁদের বৃত্তি, সমাজের কর্তব্য—তাঁদের সেবা করা—সাহায্য করা। ব্রাহ্মণ তাঁদের যা প্রয়োজন, ভিক্ষা-বৃত্তি দ্বারা গ্রহণ করবেন, বেশী হলে বিতরণ করে দিবেন—রক্ষা করবেন না; রক্ষা করা ক্ষত্রিয়ের কার্য।

অনেকস্থলে যেমন আদমসুমারির মধ্যে যেখানে যত অভাবগ্রস্ত ভিক্ষুক, তাঁদের সঙ্গে সাধুকে সমান মনে করে ফেলা হয়েছে। সাধারণ অভাবগ্রস্ত ভিক্ষুককে ভাগবতীয় ত্রিদণ্ডী বা সাধু-ভিক্ষুকের সহিত একাকার করে ফেললে জিনিষটা উল্টে গেল।

Vagrancy Act নিষ্কপট পরিব্রাজক ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর উপর প্রযুক্ত নহে; যদি ব্রহ্মানুসন্ধিৎসুর গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহে অধিক সময় সংগ্রহ করতে হয়, তা হলে তার ব্রহ্মজ্ঞান সংগ্রহের সময় কম হয়ে যাবে। এজন্য মনু বলেছেন, সমগ্র পৃথিবী ব্রাহ্মণের। ঠিক কথা; যাঁরা ভগবানের উপাসনা করেন, তাঁদের যখন যা দরকার হবে, তাঁরা যাবন্নির্বাহ প্রতিগ্রহ-বৃত্তিতে গ্রহণ করবেন, তাঁদের সে জিনিষের জন্য ব্যস্ততা নেই। তাঁদের ব্রহ্মজ্ঞানালোচনার জন্য যতটুকু দরকার, ততটুকু সমাজ দিতে বাধ্য। যে সমাজ ব্রাহ্মণাধীন নয়, সে সমাজ অসুবিধার অতল গর্তে চলে যাবে।

শূদ্রের উপাস্য বস্তু—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য। ইহজগতে যদি কেহ শ্রেষ্ঠতার অভিমান করেন, তাহলে এরূপ ক্রমে যাবেন। যিনি ব্রাহ্মণের মৃগ্য—সেব্য ব্রহ্মের অনুসন্ধান করেন না, তাঁর এই জড় জগতের অন্যান্য কথায় এসে উপস্থিত হতে হয়,—

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥

পুরুষের যেমন মুখ শ্রেষ্ঠ, বাহু তদপেক্ষা কনিষ্ঠ, তদপেক্ষা ঊরু কনিষ্ঠ, তদপেক্ষা পদ কনিষ্ঠ অর্থাৎ উত্তমাঙ্গ হতে ক্রমে অধমাঙ্গে অবতরণ, তদ্রূপ ব্রাহ্মণ উত্তম, ক্ষত্রিয় তদপেক্ষা কনিষ্ঠ, বৈশ্য তদপেক্ষা কনিষ্ঠ, শূদ্র সর্বাপেক্ষা কনিষ্ঠ। মুখমণ্ডল—সর্বোত্তমাঙ্গ, তাতে মস্তিষ্ক বা বুদ্ধির স্থান, আর মুখ বা কীর্তনের স্থানের সন্নিবেশ আছে। যে ব্রাহ্মণ সর্বদা তাঁর আকর পুরুষোত্তম বিষ্ণুর কীর্তন করেন, সেই ব্রাহ্মণের নামই—বৈষ্ণব। বিচার-বিবেচনাটা মাথা করে দিচ্ছে। সমাজের বাহু, সমাজের উরু যে-কার্য করছে, সমাজের মস্তিষ্কস্বরূপ ব্রাহ্মণ তা নিয়মিত করছেন। সমাজের পা এরূপভাবে চলা উচিত কি না, সেটা মাথা বলে দিচ্ছেন অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বলে দিচ্ছেন,—এখানে বিচরণ করা যায়, এখানে বিচরণ করা যায় না। ব্রাহ্মণ বলে দিচ্ছেন, কৃষ্ণ-ভূমিতে—নিত্যদেশে বিচরণ কর।

গৃহস্থস্যাপ্যতৌ গন্তুঃ সর্বেষাং মদুপাসনম্। (ভাঃ ১১।১৮।৪৩)

যদি বাউল সম্প্রদায় বলে,—"আমি কৃষ্ণ সেজে ভোগ করব" বা গৃহী বাউল যদি মনে করে,—'আমি গৃহ ভোগ করব' তা হলে

বহির্জগতের সেবক হয়ে কয়দিন সেবা করতে পারা যাবে? ব্রাহ্মণ যদি আত্মপ্রভব পরমেশ্বরকে সেবা না করেন—তিনি যার নিত্যসেবক, তাঁর সেবা যদি না করেন, তা হলে তিনি ক্রমে ক্রমে পতিত হতে হতে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, অন্ত্যজ, ম্লেচ্ছ হয়ে যান।

এক শ্রেণীর অর্বাচীন ব্যক্তি বলে থাকেন,—এজগতে দাসের বৃত্তি অত্যন্ত খারাপ; সুতরাং পর জগতে আর দাসের বৃত্তি করব না, প্রভু হয়ে যাব—উপাস্য হয়ে যাব!—যেন পরজগৎ এই জগতের ন্যায়ই অসুবিধা-মিশ্রিত, ত্রিগুণ-তাড়িত জগৎ! 'বৈকুণ্ঠ' কথাটী না জানা থাকলেই এরূপ বিচার এসে উপস্থিত হয়—অবিকৃত বিম্বে বিকৃত প্রতিবিম্বের হেয়তা অনুমান ও আরোপ করা হয়। যেখানে কুণ্ঠাধর্ম নেই—অমঙ্গলের কোন কথা নেই—যেখানে কেবল 'শ'-মঙ্গল, সেখানে অমঙ্গলের জিনিষ এখান থেকে নিয়ে যাওয়া উচিত নয়। সূর্য স্বপ্রকাশ বস্তু, সেখানে আলো নিয়ে যেতে হয় না। একটা গল্প আছে। একজন মাঝি মনে করল যে, গুণ টানতে তার বড় কষ্ট হয়, অত্যন্ত অসমান স্থান, কাঁটা-খোঁচা প্রভৃতির উপর দিয়ে তাকে যেতে হয়, তাতে অনেক সময় তার পদ ক্ষত হয়ে থাকে। অতএব যদি সে কোন প্রকারে বড় লোক হতে পারে, তা হলে নদীর পারগুলিতে লেপ, তোষক, গদি, প্রভৃতি বিছিয়ে নিয়ে তার উপর দিয়ে অনায়াসে গুণ টানতে পারবে। ঐ মাঝি এমন নির্বোধ ছিল যে, সে তার দরিদ্রাবস্থার অসুবিধাগুলি তার ধনলাভের অবস্থার মধ্যে নিয়ে ফেলতে চেয়েছিল। তার এটা মাথায় ঢুকছিল না, যদি টাকাই পাওয়া যায়, তাহলে আর তাকে গুণ টানতে হবে কেন? যারা ইহজগতের কুসংস্কার, ইহজগতের বিচার-প্রণালী নিয়ে সেখানে যাচ্ছে—যারা আধ্যক্ষিক-বিচার অধোক্ষজরাজ্যে চালান দিতে চাচ্ছে; মনে করছে,—এখানকার ন্যায় দাস-মনোভাব সেখানেও

আছে, এখানকার ন্যায় অসুবিধাপূর্ণ দাস্য সেখানেও থাকবে, তারা এই মাঝির ন্যায়ই অজ্ঞ। সেখানে যে দাস্য---মুক্তাবস্থায় যে দাস্য, তাই জীবের স্বভাব বা চরম স্বাধীনতা। সেরূপ দাস্যের দ্বারা অজিত ভগবান্‌ও জিত হন—সকল প্রভুর প্রভুও বিক্রীত হয়ে থাকেন।

উপনিষদে একটা আখ্যায়িকা আছে। একবার দেবতাগণের পক্ষ হতে ইন্দ্র ও অসুরগণের পক্ষ হতে বিরোচন ব্রহ্মার নিকট আত্মতত্ত্ব শিক্ষা করবার জন্য গমন করলেন। বিরোচন তাঁর বাহ্য-স্থূল দেহের প্রতিবিম্ব দর্শন করে তাঁকেই আত্মা মনে করলেন, ইন্দ্র বিরোচনের ন্যায় তাড়াতাড়ি না করে ব্রহ্মার বাক্যের যথার্থ তাৎপর্য উপলব্ধি করবার জন্য সহিষ্ণু হয়ে আত্মতত্ত্ব অনুসন্ধান করতে লাগলেন এবং দেহ ও মনের অতিরিক্ত নিত্যবস্তুকে আত্মা বলে বুঝতে পারলেন। বাইরের দিকে বিচারক-সম্প্রদায়ের যে বাউলগিরি করবার জন্য বুদ্ধি, সেটা হচ্ছে—অসুরবুদ্ধি। দেবাসুর-সংগ্রাম সকল সময়ই চলছে। এই যে উপাসনার পদ্ধতি—ভক্তির পদ্ধতি, যদ্দারা সূরিগণ বিষ্ণুকেই সর্বোত্তম বলে দেখছিলেন, তাঁকে যখন আক্রমণ করবার দুর্বুদ্ধি উপস্থিত হলো, তখন অদৈব-বিচার জীবের চেতন-বৃত্তিকে গ্রাস করে ফেলল। মানুষ যখন অত্যন্ত অপস্বার্থপর হয়, তখনই বিষ্ণু উপাসনাকে আক্রমণ করে। তখন তারা দেবতাগণের পদবী হতেও পতিত হয়ে যায়। দেবতারাও বাধা দেন; মনে করেন, তাঁরা বিষ্ণু হবার জন্য চেষ্টা করছে, আর একজন প্রতিযোগী এসে উপস্থিত হয়েছে—এই বিচারে। সত্য, মহঃ, জন ও তপোলোকের পুরুষগণ স্বর্গলোকের ভোগী দেবতাগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কেন-না, পূর্বোক্ত লোকের ব্যক্তিগণ—ত্যাগি-সম্প্রদায়।

সাধারণ লোকের বিচারে বিষ্ণু একটি দেবতাবিশেষ, অন্যান্য দেবতা

বিষ্ণু কর্তৃক শক্তি-প্রাপ্ত দেবতা নন! বিষ্ণু দেবতাবিশেষ হলে বহুদেবতাবাদ এসে যায়। সব দেবতাকে ভেঙ্গে দিয়ে ব্রহ্মের সহিত নির্ভিন্ন হয়ে যাব—ইহাই বহুদেবতাবাদ, পঞ্চোপাসনা বা তথাকথিত সমন্বয়বাদের প্রতিজ্ঞা। তাঁরা আগেই ঠিক দিয়ে রেখেছেন, উপাস্যবস্তু নির্বিশেষ, তাঁর উপাসনা করার দরকার নেই। কেবল কপটতা বা ছলনা করে সাময়িক উপাসনা এবং সেই সাময়িক উপাস্যের অনিত্য নাম, অনিত্য গুণ, অনিত্য ক্রিয়া স্বীকার করা যাক। জগতের তিক্ত অভিজ্ঞতা হতে পার হওয়ার জন্য তাঁরা এরূপ বিচার করে থাকেন। তা হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য শ্রীমদ্ভাগবত একটি শ্লোক বলেন,—

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষীণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চবিজ্ঞান-বিরাগ-যুক্তম্ ॥

কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ মদ-মাৎসর্যযুক্ত হওয়াই অভদ্রগ্রস্ত হওয়া—কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-বিরোধী হওয়াই অভদ্রগ্রস্ত হওয়া; কৃষ্ণপাদপদ্মের নিত্য স্মরণ হলে এই অভদ্র হতে মুক্ত হওয়া যায়। যদি একবার অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের ন্যায় স্মৃতিপথে কৃষ্ণস্মৃতি এসে যায় অর্থাৎ আমি যে নিত্য-কৃষ্ণদাস,—এই অনুভূতি উদ্বুদ্ধ হয়, তাহলে সমস্ত অভদ্রে আগুন লেগে যায়—অভদ্রগুলির মূল পর্যন্ত পুড়ে ছারখার হয়ে যায়,—

'কৃষ্ণ, তোমার হঙ' যদি বলে একবার।
মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তারে করে পার ॥

সর্বতোভাবে কেহ যদি হরিকীর্তন করেন, তবেই তাঁর হরিস্মরণ হয়, তাহলেই তিনি অমানী-মানদ-তৃণাদপি-সুনীচ হতে পারেন। "তৃণাদপি"- শ্লোকে 'সদা'-শব্দের অর্থ—কাম-ক্রোধাদির অবসর না দিয়ে

অবিক্ষেপে হরিকীর্তন। কাম-ক্রোধাদিযুক্ত ব্যক্তির তৃণাদপি সুনীচত্ব নাই—জড়সম্ভোগবাদে রুচিসম্পন্ন ব্যক্তির তৃণাদপি সুনীচত্ব নাই। নিরন্তর কৃষ্ণানুসন্ধান বা বিপ্রলম্ভরসে আসক্ত ব্যক্তিরই তৃণাদপি সুনীচত্ব।

শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্।
নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি ॥

জাগতিক সত্যের একটা আপেক্ষিকতা আছে। আপেক্ষিকধর্মে যে সত্যের উদয় হয়, তা সত্যের শুদ্ধি নহে। পরমাত্ম-সেবা—জড়ের সেবা নয়। কৃষ্ণই হচ্ছেন পরমোপাস্য—সদুপাস্য। সর্বদা কৃষ্ণের কীর্তন কর—কৃষ্ণের নাম, কৃষ্ণের গুণ, কৃষ্ণের পরিকর-বৈশিষ্ট্য, কৃষ্ণের লীলা কীর্তন কর, যিনি অনুক্ষণ বলেন, তাঁর পাদপদ্মই সর্বদা উপাস্য অর্থাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মই সর্বতোভাবে নিত্য উপাস্য; তিনি নিত্য ভগবৎপার্ষদ, তাঁর সেবক বৈষ্ণবগণ—উপাস্য।

অনেকে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' প্রভৃতির একদেশদর্শী বিচার বলেন; শ্রুতি-মন্ত্রের সর্বতোমুখী বিচার গ্রহণ করবার সহিষ্ণুতা স্বীকার করেন না। ভক্তিকে আশ্রয় করলেই মায়ার দুস্পারা জলধি আমরা অনায়াসে উত্তীর্ণ হয়ে যেতে পারি। পূর্বতন মহাজনগণের বর্ত্মানুবর্তনই আমাদের ধ্রুবতারা। পূর্বমহাজনগণ সত্ত্বশুদ্ধি লাভ করে জ্ঞান-বিজ্ঞান-বৈরাগ্য-যুক্ত হয়েছেন। বিশুদ্ধ সত্ত্বোজ্জ্বল হৃদয়ের নামই—বাসুদেব। সেই হৃদয়েই জ্ঞান অর্থাৎ সম্বিদ্‌বিগ্রহ বাসুদেব, বিজ্ঞান অর্থাৎ প্রেমা, বৈরাগ্য অর্থাৎ অভিধেয়ভক্তি উদিত হয়। আমরা এরূপ বিচার অবলম্বন করে অযৌক্তিক রাজ্য হতে পার পেতে পারি। 'তমঃ' অর্থে— মায়াবাদ, কর্মবাদের ভোগ-প্রবৃত্তি। ত্রিদণ্ডিগণ এই বিচার অবলম্বন করে সেইদিকে অগ্রসর হবেন। মানবজাতি সকলেই ত্রিদণ্ড গ্রহণ করে অগ্রসর হবেন,—

এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠামুপাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্ম্মহদ্ভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রিনিষেবয়ৈব ॥

কৃষ্ণই মূল উপাস্য বস্তু। যেখানে যত অধিষ্ঠান হতে পারে বা হবে, সকলেরই উপাস্য বস্তু। এই শুষ্ক বংশদণ্ডের, এই টেবিলের (নিকটস্থ বস্তুগুলিকে হাতদ্বারা দেখাইয়া প্রভুপাদ বলিলেন) কৃষ্ণই একমাত্র উপাস্য বস্তু। তিনি সেবকের সেবা করবার জন্য সেবককে আকর্ষণ করেন। পরম সেবকের সেবা ব্যতীত যদি অন্য বস্তুতে চিত্তবৃত্তি যায়, তাহলে আর আমাদের ন্যায় বোকা খুঁজে পাওয়া যাবে না। যিনি সেবা করতে চান, তাঁর যিনি সেবা করেন, তিনিই অনন্ত পরতম-পরতম-পরতম-তত্ত্ব—তিনিই সর্বকারণ-কারণ-কারণ-তত্ত্ব। পরতত্ত্ব কৃষ্ণকে স্বয়ংরূপ বলা হয়েছে—যাঁর রূপের খানিক অংশ পেয়ে তাঁর ভৃত্যসমূহ মহারূপবান হয়েছেন। তাঁর ভৃত্য-সম্প্রদায় ভগবান্‌কে সেবা করবার জন্য রূপকে সেবোপকরণ মনে করেন—উপাদান মনে করেন। কৃষ্ণের রূপের কোটী অংশের এক অংশের সহিত কোন রূপের তুলনা হয় না। যখন আমরা কৃষ্ণের সেবা করতে যাই, তখন আমাদের রূপবান হতে হয়, আমরা তখন নিজেদের সাজাতে চাই, তখন অভিসার বলে একটা কার্য হয়—"শুক্লাভিসার", আর 'কৃষ্ণাভিসার' চাঁদ উঠলে গোপীগণ কৃষ্ণের জন্য যেরূপভাবে দৌড়োয়, আর চাঁদ না উঠলে যেরূপ-ভাবে দৌড়োয়। রূপাভিসার, গুণাভিসার, পরিকরাভিসার, লীলাভিসার। (এ সকল কথা বলিতে বলিতে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখমণ্ডল অন্যরূপ ধারণ করিল, তিনি সাধারণের সভায় এসকল কথা বলা যুক্তিযুক্ত মনে না করিয়া ভাব সংকোচ ও বাক্যের আবেগ সম্বরণ পূর্বক বলিতে লাগিলেন) আমি এসকল কথা এ ভাষাতে বলতে চাই না—দুর্বলা জিহ্বা বলে ফেলছে; কিন্তু আমি এখানে ক্ষান্ত হলাম।

স্বয়ংরূপ—কৃষ্ণ, আর স্বয়ং প্রকাশতত্ত্ব—শ্রীবলদেব প্রভু।

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো ন চ প্রমাদাৎ তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ।
এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বানংস্তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম॥

নিতাই-পদ-কমল কোটিচন্দ্র সুশীতল,
যে ছায়ায় জগৎ জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি ধর নিতাইর পায়॥

নিতাই—স্বয়ংপ্রকাশতত্ত্ব, স্বয়ংরূপ নন। অন্য একটা বস্তুর সাহায্যে সর্বশক্তিমান তিনি—বলবান তিনি। তাঁর সর্বশক্তিমত্তাকে সরিয়ে নেওয়া যায় না, তিনি নিঃশক্তিক নন। বলশক্তি—বলদেবশক্তিমত্তত্ত্বের শক্তিবিশেষ। যদিও তাঁতে শক্তিমত্তত্ত্বের বিচার প্রবল রয়েছে, তথাপি তিনি শক্তিজাতীয়। উপাস্য-পর্যায়ে কৃষ্ণের পরবর্তী সময়ে বলদেব। তিনি মহাবৈকুণ্ঠে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধরূপে বিরাজিত। এসকল ত্রিগুণের অন্তর্গত হ্রস্ব, দীর্ঘ ও পরিমণ্ডলকে পরাভূত করে চতুর্থ আয়তনের কথা। পঞ্চম স্তরের কথা আরও উপরের। পঞ্চম রাগ—কৃষ্ণের মুরলীর কথা—

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃ-খেলন্মধুর**মুরলীপঞ্চমজুষে**
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি।

বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্ন-অনিরুদ্ধ ব্যূহচতুষ্টয়ে একীভূত যে নারায়ণ বস্তু, সেই জিনিষটি বলদেব প্রভুর দ্বারা প্রকাশিত হয়ে মহাবৈকুণ্ঠে অবস্থিত। তাঁর নিকট 'ব্যূহ' বলে একটা ব্যাপার আছে। উপাস্যতত্ত্বের পঞ্চ প্রকার স্বরূপ। যাঁরা অর্থপঞ্চক আলোচনা করেছেন, তাঁরা এসকল

কথা জানেন। অর্থপঞ্চকবিদ ব্যতীত আমরা অপরের নিকট জ্ঞান লাভ করতে পারি না। অর্থপঞ্চকের জ্ঞান না থাকলে গুরুর কার্য হয় না।

অর্চাবতার—আট প্রকার। অর্চাবতার আমাদের ন্যায় ভাগ্যহীন জীবকে—অত্যন্ত স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন জীবকে কৃপা করবার জন্য জগতে অবতীর্ণ। কোথায় সেই দ্বাপরান্তকালে কৃষ্ণ প্রকটলীলা করেছিলেন, আমাদের ন্যায় ভাগ্যহীন জীব সেইকালে জগতে আসতে পারে নি—আমরা কৃষ্ণের দর্শন লাভ করতে পারি নি—কৃষ্ণের কথা কিছুই জানি না; কিন্তু কৃষ্ণের অর্চা আমাদের কত মঙ্গল করছেন। এই অর্চা—সার্বকালিক। আমরা বহু পরে জন্মগ্রহণ করেও কৃষ্ণের দেখা পাচ্ছি। অর্চারূপে অবতীর্ণ হয়ে তিনি আমাদের আত্মার সেবা-বৃত্তিকে উদ্বোধন করছেন।

অন্তর্যামী—প্রত্যেক গুণমায়া ও জীবমায়া-রচিত বস্তুতে ভগবান্ অন্তর্যামিরূপে বিরাজিত আছেন এবং আমাদিগকে নিয়মিত করছেন।

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥

বৈভব—নৈমিত্তিক অবতারসমূহকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে।

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥

—প্রভৃতি শ্লোকে নৈমিত্তিক যুগাবতারকে লক্ষ্য করছেন।

ব্যূহ—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ব্যূহ একটাই জিনিষ। একপাদ দর্শনে সর্বদর্শন হয়। ইহজগতে যে একপাদের বিচার, গণিতশাস্ত্রে তার কতকটা বুঝতে পারি—সেবকের কতটা প্রাচুর্য, সেব্যের কি ভাব, আমরা তা বুঝতে পারি।

পরতত্ত্ব—বাসুদেব, পরাৎপরতত্ত্ব—বলদেব, পরতম পরাৎপর-

তত্ত্ব—কৃষ্ণ। বিষ্ণু—মূল আকরতত্ত্ব; যেমন দুগ্ধ অম্লের যোগে দধি। দুগ্ধ বিকার হয়েছে যেখানে, সেখানে দধিরূপ রুদ্রতা। বিষ্ণুর বস্তুতঃ বিকার নেই, কিন্তু আমার ধারণায় যে বিকৃতভাব, সেইটি রুদ্রত্ব। বিষ্ণুতে বিকারের আরোপ করা গেলে মূল আকর বস্তুর ধারণা অবিকৃত বা যথাযথ (intact) না রেখে তাঁর পরিবর্তন করেছি যে জায়গায় অর্থাৎ mutilated, distorted form এ যে আমাদের দেখা, তা রুদ্রত্ব।

ব্রহ্মা—বিভিন্ন স্ফটিক আধারে সূর্যের প্রতিফলিত প্রতিবিম্বের ন্যায়,—

ভাস্বান্ যথাশ্মসকলেষু নিজেষু তেজঃ।
স্বীয়ং কীয়ৎ প্রকটয়ত্যপি তদ্বদত্র॥
ব্রহ্মা য এষ জগদণ্ডবিধানকর্তা।
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

সূর্য—কালচক্রে অবস্থিত ১২টী রাশিতে ঘুরে ঘুরে বেড়ান। তিনি স্বরমূর্তি—দেবমূর্তি। কালটা তাঁর বাইরের প্রকাশ।

অচিন্ত্যাব্যক্তরূপায় নির্গুণায় গুণাত্মনে।
সমস্তজগদাধারমূর্তয়ে ব্রহ্মণে নমঃ॥ (সূর্যসিদ্ধান্ত ১।১)

গণেশ—বিঘ্নবিনাশকারী। 'ললিতবিস্তর' পাঠে জানা যায়, এক সময়ে ভারতবর্ষে এই গণনায়কত্ব বা গণাধিপত্য কিরূপ প্রবল ছিল। গণেশ জাগতিক কর্মরাজ্যের সিদ্ধিদাতা, বৈশ্যগণের আরাধ্য। বৈশ্য-জগতে গণ-ধর্ম, গণ-মত, গণগড্ডলিকার বিচারেরই প্রাবল্য।

বিষ্ণু—অবিকারী; তিনি সর্বব্যাপী; তিনি মায়াধীশ; তিনি জীবের ভোগবৃত্তিদ্বারা সেবিত হন না। অন্যান্য আধিকারিক দেবতাগণ জীবের ভোগপর চিন্তাস্রোতের দ্বারা সেব্য। কিন্তু বিষ্ণুর সেবাকাঙ্ক্ষিগণের বিচার এইরূপ,—

কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা-
স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে॥

পারমার্থিক-আলোচনা-সম্মিলনী হতে যে ১২৫টী প্রশ্ন করা হয়েছে, সেই সকল প্রশ্নের এক একটী করে আলোচনা ৯ দিবসে অসম্ভব। আমরা কেবল ৯ দিবসে ৯টী মূল বিষয়ের প্রারম্ভিক আলোচনা করব এবং ঐ ১২৫টী প্রশ্নের উত্তর ১২৫টী প্রবন্ধে কাগজে দিবার যত্ন করব। অন্যান্য লোকেরা যে সকল উত্তর দিয়েছেন, তা অনেক স্থলে অসম্যক, অনেক স্থলে বিকৃত উত্তর হয়েছে। আমরা কি কথা বলতে বসেছি, তাও তাঁরা সুষ্ঠুভাবে ধরতে পারেন নি। আমাদের এই ৯ দিনের আলোচনা—থালার মধ্যে হাতী পোরার মত ব্যপার হয়েছে। ৯ দিন ধরে মানুষ দুই ঘণ্টা করে সময় দিবে, এত সৌভাগ্য হবে, তাও জানি-না। আমাদের এ আলোচনায় আমাদের বক্তব্য বিষয়ের একটা সূচী বা উপোদ্ঘাত মাত্র দেওয়া হচ্ছে, তাতে অনেক কথা বাকী থেকে যাচ্ছে, মানবজাতির অনেক তর্ক রয়ে যাচ্ছে। অনেক সময় আবার যদি বিস্তৃত করে আলোচনা করা যায়, তা হলে অনেকে বলে থাকেন, অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাচ্ছে। অনেকেরই এসব বিষয়ে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা নেই। যাক আমরা যতটা জগতে শ্রৌতসিদ্ধান্ত প্রকাশ করতে পারি, ততটাই আমাদের সকলের মঙ্গল। আমাদের নির্দিষ্ট সময় অতিক্রম হয়ে যাচ্ছে সুতরাং আমাকে এই স্থানেই ক্ষান্ত হওয়া দরকার। আমি সকলকে দণ্ডবৎ করছি।

—*—

শ্রীগুরু-তত্ত্ব ও সেবা

স্থান—শ্রীচৈতন্যমঠের সারস্বত নাট্যমন্দির।

সময়—২৪শে মাঘ, শনিবার, ১৩৩৭ সন, রাত্রি ৯ ঘটিকা। ।৭২।

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

আজ আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম পূজা করবার অবসর দিবস। বিগত বর্ষেও আমার সৌভাগ্য হয়েছিল—শ্রীগুরুদেবের পূজা করবার; আজও সে সুযোগ উপস্থিত হয়েছে। ভগবৎকৃপায় শ্রীগুরু-সেবা করবার সুযোগ আমরা একবৎসর কাল পেয়েছি। যদি শ্রীগুরুপাদপদ্ম তাঁর সেবা হতে আমাদিগকে বঞ্চিত করবার অভিলাষ করতেন, তাহলে বর্ষব্যাপী জীবন লাভ করতাম না। এই বর্ষব্যাপী যে জীবন লাভ করেছি, তদনুরূপ শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা করতে পেরেছি কিনা, সে বিষয় আলোচনা করবার সময় এসেছে। শ্রীগুরুপাদপদ্ম বলেছেন যে, আমরা সকলে মিলে ভগবানের সেবা করবো। 'আমরা' এই শব্দে তিনি একজনকে লক্ষ্য করে বলেন নি। অনেকে স্বার্থপর হয়ে বলেন,—আমিই সেবা করবো, বা আমারই একা কার্য পড়েছে, অন্যের তাতে অধিকার নেই। কিন্তু শ্রীগুরুদেবের দয়ার্দ্র চিত্ত বলেন,—এসো, হিংসা পরিত্যাগ করে সকলে মিলে ভগবানের পূজা করি। এটা সকলের চেয়েও বড় জিনিষ। সকলের চেয়ে বড় জিনিষ বলে সেটা অপরে করতে পারবে না বা অপরকে করতে দেবো না, সেরূপ হিংসা আমার গুরুপাদপদ্মের নেই। সকলে মিলে যে কীর্তন করা যায়, তা সঙ্কীর্তন। "বহুভির্মিলিত্বা যৎ কীর্তনং তদেব সংকীর্তনম্"। সঙ্কীর্তনের অন্তর্গত বন্দনা—স্তুতি।

বাহিরের দিকে দেখতে গেলে স্তাবকের স্থান—নিম্নে, স্তবনীয়ের স্থান উচ্চে; কথাটি তৃতীয়পক্ষ শ্রবণ করে বেশ বুঝতে পারেন, স্তাবকের

মহিমা স্তবনীয় বস্তু অপেক্ষা স্তবকার্যে কতদূর অধিক অগ্রসর হয়েছে ও অধিক আছে।

শ্রীগৌরসুন্দরের বাণী এই যে, ভগবান্‌কে ডাকতে হলে 'তৃণাদপি সুনীচ' হতে হবে। একজন নিজের ক্ষুদ্রতা উপলব্ধি না করলে অপরকে ডাকেন না। যখন আমরা অন্যের সাহায্যপ্রার্থী হই, তখন নিজেকে অসহায় মনে করি—আমার দ্বারা কোন কার্য সম্পন্ন হচ্ছে না, অতএব অন্যের সাহায্য গ্রহণ করা ছাড়া উপায় নেই। পাঁচজন মিলে যে কার্যটি করতে হবে, তা কেবল নিজের দ্বারা সম্ভবপর নয়। গৌরসুন্দর ভগবান্‌কে ডাকতে বলেছেন, একথা গুরুপাদপদ্মের নিকট হতে পাই। ভগবান্‌কে ডাকতে বলেছেন মানে ভগবানের সাহায্য গ্রহণ করতে বলেছেন; কিন্তু যখন ভগবানকে ডাকি তখন যদি তাঁকে ভৃত্যত্বে (?) পরিণত বা নিজের কোন কার্য উদ্ধার করিয়ে নেওয়ার জন্য তাঁর সাহায্য গ্রহণ করতে চাই, তাহলে 'তৃণাদপি সুনীচতা' থাকে না। বাহ্য দৈন্য 'তৃণাদপি সুনীচতা' নয়, সেটা কপটতা। যে ভাবে ডাকলে তাঁবেদার সকল উত্তর দেয়, সেভাবে ডাকা ভগবানের নিকট পৌঁছে না। কারণ তিনি পরম স্বতন্ত্র পূর্ণ চেতন বস্তু, কারও বশ্য নন। নিজের অস্মিতাকে নিষ্কপট দৈন্যে প্রতিষ্ঠিত না করলে পূর্ণ-স্বতন্ত্রের নিকট আবেদন পৌঁছে না।

আর একটি কথা হচ্ছে, 'তৃণাদপি সুনীচ' হয়ে ডাকার সঙ্গে যদি সহ্যগুণসম্পন্ন না হই, তা হলেও ডাকা হয় না। আমরা যদি কোন বস্তুর প্রতি লোভী হয়ে অসহিষ্ণুতা দেখাই, তবে 'তৃণাদপি সুনীচ' ভাবের বিরুদ্ধ ভাবাবলম্বন করতে হয়। অমরা যদি সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত হই,—ভগবান্ পূর্ণ বস্তু, তাঁকে ডাকলে কিছু অভাব হবে না, তা হলে সে সময় সহনশীলতার অভাব হয় না। আর যদি আমরা লোভী হয়ে—

অসহিষ্ণু হয়ে চঞ্চলতা প্রকাশ করি—আমার নিজের কিছু কৃতিত্ব-সামর্থ্য অবলম্বন করে কার্যোদ্ধার করব, এরূপ মতলব এঁটে রাখি, তা হলে ভগবান্‌কে ডাকা হয় না—আত্মম্ভরিতা অধিক থাকলেও ভগবান্‌কে ডাকা হয় না—আত্মম্ভরিতা বিনাশ করবার চেষ্টায় নিযুক্ত থাকলেও ডাকা হয় না। আমরা অনেক সময় মনে করি যে, আমরা অনুগ্রহ করে স্তবাদি করি—ভগবান্‌কে না ডেকেও অন্য কার্যে নিযুক্ত হতে পারি, এরূপ বুদ্ধিও সহনশীলতার অভাবের পরিচায়ক। এই সকল মনোভাব হতে আমাদিগকে রক্ষা করবার জন্য—আমরা নিষ্কপট 'তৃণাদপি সুনীচ' ভাব হতে যেটুকু বঞ্চিত হয়ে থাকি, তা হতে রক্ষা করবার জন্য রক্ষকের আবশ্যক—সেরূপ দুষ্প্রবৃত্তি হতে রক্ষা করবার জন্য আশ্রয়ের প্রয়োজন। ঠাকুর নরোত্তম বলেছেন,—

আশ্রয় লইয়া ভজে, তাঁরে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে,
আর সব মরে অকারণ।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। জগতে কর্ম, জ্ঞান বা অন্যাভিলাষ লাভ করতে হলেও গুরুর আবশ্যক হয়; কিন্তু সেই সকল গুরুর প্রদত্ত বিদ্যা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফল প্রসব করে। পারমার্থিক শ্রীগুরু-পাদপদ্ম সেইরূপ ক্ষুদ্র ফল-প্রদাতা নন। শ্রীগুরু-পাদপদ্ম বাস্তব-মঙ্গল-বিধাতা। আশ্রয়-জাতীয় ভগবানের অনুগ্রহ যে মুহূর্তে রহিত হয়ে যাবে, সেই মুহূর্তে জগতে নানা অভিলাষ উপস্থিত হবে। বর্ত্ম প্রদর্শক গুরুদেব যদি আমাদিগকে উপদেশ না দেন,—কিভাবে গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করতে হবে,—কিভাবে গুরুপাদপদ্মের সহিত ব্যবহার করতে হবে—এ সকল শিক্ষা যদি না দেন, তবে প্রাপ্ত রত্নও হারিয়ে ফেলতে হয়।

নামভজনই একমাত্র ভজন-প্রণালী। শ্রীগুরুদেব এই ভজন-প্রণালী প্রদান করেন; সুতরাং আমাদের বর্ষারম্ভে গুরুপাদপদ্মের পূজাই কর্তব্য।

শ্রীরূপ প্রভু ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বলেছেন,—"আদৌ গুরুপাদাশ্রয়-স্তস্মাৎ কৃষ্ণদীক্ষাদিশিক্ষণম্। বিশ্রম্ভেণ গুরোঃ সেবা সাধুবর্ত্মানুবর্ত্মনম্।'

নিজের শত শত পারদর্শিতার দ্বারা অজ্ঞেয় রাজ্যে, দুর্জ্ঞেয় রাজ্যে অগ্রসর হওয়া যায় না—যে সকল ভবিষ্যৎ জগৎ দেখতে দেওয়া হচ্ছে না—ভবিষ্যৎকাল বলে যে জিনিষটা, তাতে নিজের চেষ্টায় অগ্রসর হওয়া যায় না। অতি-লোকবিচার যেখানে, সেখানে ইহলোকের বিচার আমাদিগকে পৌছিয়ে দিতে পারে না। যে-সকল কাল গত হয়েছে তাতে ইন্দ্রিয়জজ্ঞান লাভ করেছি; কিন্তু আগামী কাল—যা, জানি না—যে চক্ষু দুই এক মাইল মাত্র দেখতে পারে—যে কর্ণ কিছু দূরের শব্দ মাত্র শুনতে পারে, সে প্রকার ইন্দ্রিয়ের গম্যজ্ঞানে অতীন্দ্রিয় রাজ্যের কথা—পূর্ণ রাজ্যের কথা জানতে পারি না। সেইরূপ রাজ্যে কেবল নিজের পারদর্শিতার দ্বারা অগ্রসর হতে চেষ্টা করলে কখনই আমরা শেষ পর্যন্ত অগ্রসর হতে পারি না; রাবণের স্বর্গের সিঁড়ি বাঁধবার চেষ্টার ন্যায় সিঁড়ি কিছুদূর উঠতে না উঠতেই আশ্রয়ের অভাবে—নিরালম্বভাবে শূন্যে বেশীক্ষণ থাকতে পারে না, চুরমার হয়ে নিচে পড়ে যায়। কেবল নিজের পারদর্শিতার পুঁজি নিয়ে অজ্ঞেয় রাজ্যে উঠতে চাইলেও আমরা অধঃপাতিত হয়ে পড়ি, আর লঘুকে 'গুরু' করলেও আমরা অধঃপতিত হই।

কে গুরু, কে লঘু, আমরা তা বিচার করবো। যিনি সকল গুরুর একমাত্র আরাধ্য বস্তু, সেই পূর্ণ বস্তুর সেবা যিনি করেন, তিনিই গুরু। সেতার শেখানর গুরু বা কসরত শেখানর গুরুর কথা বলছি না, তারা মৃত্যু হতে রক্ষা করতে পারে না। ভাগবতের একটা শ্লোকেও পাই,—সে গুরু, গুরু নয়; সে পিতা, পিতা নয়; সে মাতা, মাতা নয়; সে দেবতা, দেবতা নয়; সে স্বজন, স্বজন নয়—যিনি আমাদিগকে মৃত্যুর

মুখ হতে রক্ষা করতে না পারেন—আমাদিগের নিত্য জীবন দিতে না পারেন—এই জড়জগতের অভিনিবেশরূপ অজ্ঞানমৃত্যু হতে রক্ষা করতে না পারেন।

অজ্ঞতা হতেই মৃত্যুমুখে পতিত হই, বিজ্ঞতা হতে মৃত্যুমুখে পতিত হই না। এখানে যে বিদ্যা অর্জন করি, পাগল হয়ে গেলে, পক্ষাঘাত-গ্রস্ত হলে, বা মরণের পরে আর সে বিদ্যার মূল্য থাকে না। বাস্তব-সত্যের যদি অনুসন্ধান না করি, তা হলে আমরা অচেতন হয়ে যাই। যিনি মৃত্যুর মুখ হতে উদ্ধার করতে না পারেন, তিনি খানকতক দিনের জন্য ভোগা দেওয়ার লোক। যিনি বাক, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের প্রেরণায় আমাদিগকে লুব্ধ করে থাকেন, তিনি বঞ্চক। কিন্তু যে শ্রীগুরুপাদপদ্ম এ সকল বঞ্চনা হতে রক্ষা করতে পারেন, প্রত্যেক বর্ষ-প্রারম্ভে, প্রত্যেক মাস-প্রারম্ভে, প্রত্যেক দিবস-প্রারম্ভে, প্রত্যেক মুহূর্তের প্রারম্ভে সেই গুরুপাদপদ্মের পূজাই কর্তব্য।

ভিন্ন ভিন্ন মূর্তিতে আমার গুরুদেব বিরাজমান, তিনি যদি ভিন্ন ভিন্ন মূর্তিতে বিরাজ না করেন, তবে কে আমাকে রক্ষা করবেন? আমার গুরুদেব যাঁদিগকে নিজের করে নিয়েছেন, তাঁরা আমার উদ্ধারকারী; কিন্তু আমার গুরুপাদপদ্মের নিন্দাকারী বা ঐরূপ নিন্দাকারীর কোনরূপে প্রশ্রয় দেন যিনি, সেরূপ অমঙ্গলকারী পাষণ্ডীর মুখ যেন আমার দর্শন-পথে না আসে।

যিনি প্রতি মুহূর্তে আমাকে স্বীয় পাদপদ্মে আকর্ষণ করে রাখেন, আমি সে গুরুপাদপদ্ম হতে যে মুহূর্তে ভ্রষ্ট হই—সে গুরুপাদপদ্ম বিস্মৃত হই, সে মুহূর্তে আমি নিশ্চয়ই সত্য হতে বিচ্যুত হয়েছি। গুরুপাদপদ্ম হতে বিচ্যুত হলে অসংখ্য অভাবরাশি আমাকে অভিনিবিষ্ট করে। আমি তাড়াতাড়ি স্নান করতে দৌড়াই, শীত নিবারণের জন্য ব্যস্ত হয়ে

পড়ি, গুরুপাদপদ্মের সেবা ছাড়া অন্য কার্যে ধাবিত হই। যে গুরুপাদপদ্ম আমাকে এই সকল দ্বিতীয় অভিনিবেশ হতে অনুক্ষণ রক্ষা করেন, বর্ষ-প্রবৃত্তি, মাস-প্রবৃত্তি, দিন-প্রবৃত্তি, মুহূর্ত-প্রবৃত্তির প্রারম্ভে যদি সেই গুরুপাদপদ্মের স্মরণ না করি, তবে আমি নিশ্চয়ই আরও অসুবিধায় পতিত হব। **আমি তখন নিজে গুরু সাজতে চাব—আমাকে অপরে গুরু বলে পূজা করুক, আমার এ দুর্বুদ্ধি এসে উপস্থিত হবে**—ইহাই দ্বিতীয় অভিনিবেশ। আজ যে একদিনের জন্য 'গুরুপূজা' করতে এসেছি তা নয়, নিত্য প্রতি মুহূর্তে আমাদের গুরুপূজা।

গৌরসুন্দর সাক্ষাৎ কৃষ্ণবস্তু, তিনি জগদ্গুরুরূপে এখানে এসেছেন। তিনি যে 'শিক্ষাষ্টক' বলেছেন, সেই শিক্ষায় মহান্তগুরু এবং মহান্তগুরু-পাদপদ্মে প্রণত মহান্ত বৈষ্ণবসকল সর্বতোভাবে আমাকে শিক্ষিত করেন। মহান্তগুরুর পাদপদ্মে প্রণত মহান্ত বৈষ্ণব সকল আমাকে বিপদ হতে উদ্ধার করেন।

আশ্রয়জাতীয় গুরুবর্গ বিভিন্ন আকারে—বিভিন্ন মূর্তিতে আমাকে দয়া করবার জন্য উপস্থিত। ইঁহারা দিব্য জ্ঞানদাতা গুরুপাদপদ্মেরই প্রকাশ-বিশেষ। বিভিন্ন আদর্শের জগদ্গুরুর বিম্ব প্রতিবিম্বিত হয়েছে। প্রত্যেক বস্তুতে আমার গুরুপাদপদ্ম প্রতিফলিত। বিষয়-জাতীয় কৃষ্ণ অর্ধেকটা, আর আশ্রয় জাতীয় অর্ধেকটা। এতদুভয় বিলাসবৈচিত্র্যই পূর্ণতা। বিষয়-জাতীয় পূর্ণ প্রতীতি—কৃষ্ণ, আর আশ্রয়-জাতীয় পূর্ণ প্রতীতি—আমার গুরুপাদপদ্ম। চেতনের ভূমিকাসমূহে যে আশ্রয়-জাতীয় অপ্রাকৃত-প্রতিবিম্ব পড়েছেন, তাহাই ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে আমার গুরুদেব। জীবন-ব্যাপী ভগবানের সেবা করতে হবে সর্বক্ষণ দেখাচ্ছেন যিনি, তিনিই গুরু-পাদপদ্ম। সেই গুরুপাদপদ্ম প্রতি জীব-হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হয়েছেন, আশ্রয় জাতীয়-রূপে প্রতিবস্তুতে তাঁর অবস্থান। তিনি প্রতিবস্তুতেই বিরাজমান।

চূত-পিয়াল-পনসাসন-কোবিদার-
জম্বর্ক-বিল্ব-বকুলাম্র-কদম্ব-নীপাঃ।
যেঽন্যে পরার্থভবকা যমুনোপকূলাঃ
শংসন্তু কৃষ্ণপদবীং রহিতাত্মনাং নঃ ॥

[হে চূত, হে পিয়াল, পনস, আসন, কোবিদার, জম্বু, অর্ক, বিল্ব, বকুল, আম্র, কদম্ব, নীপ এবং অন্যান্য পরহিতকর যামুনতটবাসী তরুগণ, তোমরা আমাদের নিকট শ্রীকৃষ্ণ কোন পথ দিয়া গিয়াছেন বলিয়া দেও, কৃষ্ণবিরহে আমাদের চিত্ত শূন্য বোধ হইতেছে।]

রাসস্থলী হতে কৃষ্ণ যখন চলে গেছেন, মুক্তপুরুষ গোপীগণ সকল বস্তুর কাছে গিয়ে গিয়ে কৃষ্ণ অন্বেষণ করছেন, গোপীগণের আধ্যক্ষিকতা কি তখন প্রবল? ইন্দ্রিয়জজ্ঞান কি তখন প্রবল? এই সকল কথা আমাদের গুরুপাদপদ্ম হতে শুনবার অবসর হয়। নন্দ-গোবিন্দ, যশোদা-গোবিন্দ, শ্রীদাম-সুদাম-গোবিন্দ, চিত্রক-পত্রক-গোবিন্দ, বংশী-গোবিন্দ, গো-গোবিন্দ, কদম্ব-গোবিন্দ প্রভৃতি চিদ্বিলাস-বৈচিত্র্য রসময় শ্রীরাধাগোবিন্দের বিলাস-ব্যাপার। যদি চিত্তে শ্রীগুরুপাদপদ্মের ভ্রমণ—পর্যটন দেখতে পাওয়া যায়, হৃদয়ে যদি গুরুপাদপদ্মের দর্শন হয়, তবেই এই সকল কথা স্ফূর্তি লাভ করে। যিনি প্রত্যেক ব্যপারে আমাদিগকে ভগবৎসেবা করবার জন্য প্রবুদ্ধ করেন, তাঁর পূজা ব্যতীত পূর্ণ বস্তুর সেবা লাভ করবার আর উপায় নেই।

আমরা আজও যে অনেক কথা শুনবার অবসর পেলাম, কেমন নিষ্ঠার কথা পেলাম—যদিও ইংরাজী ভাষায় * অনেক কথা বলা হয়েছে, তাতে আমাদের শুনবার অনেক বিষয় ছিল। আমরা যেন গুরু-

---

* অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নারায়ণ দাস ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসুধাকর এম্-এ মহাশয়ের পঠিত ইংরাজী ভাষায় লিখিত অভিনন্দন।

পাদপদ্মে এরূপ নিষ্ঠা প্রদর্শন করতে পারি। বিভিন্ন আধারে প্রতিফলিত শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিম্ব আমাদের শিক্ষার জন্য নিয়তই অনেক নূতন নূতন কথা প্রকাশ করে থাকেন। আমি দাম্ভিকতাপূর্ণ ক্ষুদ্র জীব, আমার এই সকল শুনবার অধিকার কেন হয়? শ্রীগুরু-পাদপদ্ম আমাকে এইসকল নিষ্ঠাপূর্ণ বাক্য শুনবার অবসর দিয়ে প্রতি-মুহূর্তে জানাচ্ছেন, "ওহে ক্ষুদ্র জীব, তুমি গুরুপাদপদ্মে এরূপ নিষ্ঠা প্রদর্শন কর।" বিভিন্ন আধারে আমার গুরুপাদপদ্মের প্রকটিত মূর্তির ভগবৎসেবা প্রবৃত্তি দেখলে মনে হয়, আমার ইঁহাদের সঙ্গে হরিসেবা করবার জন্য কোটি কোটি জন্ম লাভ হউক—ইঁহাদের সঙ্গে আমার কোটি কোটি জন্মের ভগবৎসেবাবিমুখতা নষ্ট হয়ে যাক।

যখন আমি দক্ষিণদেশে মঙ্গলগিরিতে মহাপ্রভুর পাদপীঠ প্রতিষ্ঠার জন্য গিয়েছিলাম, তখন সেখানে আমাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ প্রশ্ন করেছিলেন,—'আমরা যখন প্রথম মুখে মঠে এসেছিলাম, তখন আপনার বন্ধু-বান্ধবের চরিত্র ও ভগবৎসেবানুরাগ দর্শন করে আমাদের কত উৎসাহ ও আশা বৃদ্ধি হচ্ছিল, আজকাল আমাদের দৃষ্টি ক্রমশঃ খর্ব হয়ে যাচ্ছে, আমরা রকম রকম বিচার করতে বসেছি। কতিপয় ব্রহ্মচারী সমাবর্তন করে গৃহে প্রবেশ করেছেন। 'আমি তদুত্তরে বল্লাম, গৃহে প্রবেশ করলেই যে হরিভজন ছেড়ে দিতে হয়, একথা আমি বলতে পারি না। আমি ত দেখছি আশ্চর্য বৈষ্ণবসকল! আমি দেখছি তাদের বৈষ্ণবতা—হরিভক্তি আরও কত বেড়েছে! আমি কতটা পাষণ্ড ছিলাম, তাঁদের সঙ্গে আমার সেই পাষণ্ডতা কত কমে গেছে! আমি দেখছি আমি বিমুখ হলেও সকলেই হরিভজন করছেন। শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভুর পাদপদ্মের কৃপায় আমি জানতে পেরেছি—

"বৈষ্ণবের নিন্দাকর্ম না পাড়ে কানে।
সবে কৃষ্ণ ভজে তিঁহ এই মাত্র জানে॥"

আমি ত দেখছি সকলে উন্নতির পথে অগ্রসর হয়ে হরিভজন করছেন—ভগবানের সংসার সর্বতোভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে—কেবল আমার মঙ্গল হলো না—সকলেরই মঙ্গল হলো। আপনারা অল্পাভাবে চঞ্চল হয়ে পড়েছেন, আপনাদের ভগবৎসেবায় উৎকণ্ঠা অধিক ; তাই বলছেন, তাঁরা আরও অধিকতরভাবে হরিভজন করুন, তাঁদিগকে হরিভজন করতে দেখেও আপনাদের তৃপ্তি হচ্ছে না, আপনারা চান যে আপনাদের প্রাণপ্রভুর সেবা তাঁরা আরও কোটিগুণ অধিকতরভাবে করেন ; কিন্তু আমার ক্ষুদ্র হৃদয়—আমার ক্ষুদ্র আধার, তাঁদের বিপুল হরিভজন আমার ক্ষুদ্র ভাজনে আমি ধরতে পারছিনা, আমার ক্ষুদ্র পাত্র থেকে তাঁদের হরিভজনের চেষ্টা উপছে পড়ছে, ইঁহাদের হরিভজনের কথা আমি আমার ক্ষুদ্র আধারে রাখতে পারছি না। ইঁহারা কেমন আশ্চর্য আশ্চর্য আদর্শ জীবন দেখিয়ে চলে যাচ্ছেন। আমিই কেবল হরিভজন করতে পারলাম না ; আমি কেবল পরছিদ্র দর্শনে ব্যস্ত, কোথায় আমি ভজনের পথে অগ্রসর হব, না আমি বৈষ্ণবের ছিদ্র অন্বেষণে ব্যস্ত হয়ে পড়ছি !

বৈষ্ণবের ছিদ্র কারা অন্বেষণ করে ?—আধ্যক্ষিক সম্প্রদায়—যাদের বাহ্যবিষয়প্রতারিত চক্ষু, কর্ণ, নাসা প্রভৃতি সম্বল—যারা হরিভজনবিমুখ। আমাকে যখন কেহ বলেন যে, কোন ব্যক্তি হরিনাম ছেড়ে দিয়েছেন, তখন আমার মনে হয়, নিশ্চয়ই তাঁর হরিভজনটা খুব বেশী হয়েছে, তাঁর হৃদয় খুব উন্নত হয়েছে, তাই একমাত্র মঙ্গলের পথ যে হরিভজন, তা ছেড়ে দিয়ে তিনি অন্য কাজে ব্যস্ত হয়েছেন। যিনি ধনী হয়েছেন, তিনি তৃপ্তি লাভ করেছেন বলেই আর ধনার্জনের ক্লেশ করতে চান না।

গীতায় ভগবান্ বলেছেন যে, ভগবানের ভক্তসকলের কখনও অমঙ্গল হয় না—তাঁদের কখন ও বিনাশ নেই—"ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।"

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥ (গীঃ ৯।৩০-৩১)

যাঁরা অনন্যভজন করেছিলেন, তাঁরা কখনও কি অধঃপতিত হতে পারেন? নিশ্চয়ই তাঁরা মঙ্গল লাভ করেছেন। আমার দৃষ্টিটা খারাপ; তাই নিজের মঙ্গল নিজে লাভ করতে পারছি না।

পরস্বভাবকর্মাণি ন প্রশংসেন্ন গর্হয়েৎ।
বিশ্বমেকাত্মকং পশ্যন্ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ॥ (ভাঃ ১১।২৮।১)

[আশ্রয় প্রকৃতি ও বিষয় পুরুষের মিলনে বিশ্বকে একস্বরূপ দেখিয়া পরের স্বভাব ও কর্ম কখনও প্রশংসা বা গর্হণ করিবে না।]

আমি আধাক্ষিক হয়ে পড়লে অধোক্ষজ সেবা-বঞ্চিত হব—গুরু-পাদপদ্মসেবা হতে বঞ্চিত হয়ে যাব। আমার নিজের অমঙ্গল হওয়ার দরুণই পরের অমঙ্গলের কথা আমার মনে পড়ে। আমি নিজে ছিদ্রযুক্ত বলেই অপরের ছিদ্রানুসন্ধানে আকৃষ্ট হই। আমার নিজের মঙ্গল ক'রে নিতে পারলে আর অপরের অমঙ্গল—অপরের ছিদ্র দেখবার সময় হয় না।

কৃষ্ণেতি যস্য গিরি তং মনসাদ্রিয়েত
দীক্ষাস্তি চেৎ প্রণতিভিশ্চ ভজন্তমীশম্।
শুশ্রূষয়া ভজনবিজ্ঞমনন্যমন্য-
নিন্দাদিশূন্যহৃদমীপ্সিতসঙ্গলব্ধ্যা॥

[যদি কেহ সদ্গুরুপাদপদ্মে দীক্ষিত হইয়া কৃষ্ণনাম গান করেন, তাঁহাকে হৃদয়ে আদর এবং হরিভজনে প্রবৃত্ত হইয়া নাম ভজন করিতে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রণামাদির দ্বারা সংবর্দ্ধনা করিতে হইবে। আর একান্ত কৃষ্ণাশ্রিত, কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য প্রতীতিরহিত হওয়ায় নিন্দা-বন্দনাদি ভেদভাবশূন্যহৃদয় ভজনবিজ্ঞ মহাভাগবতকে স্বজাতীয়াশয় স্নিগ্ধগণের মধ্যে সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উত্তম সঙ্গ জানিয়া মধ্যম অধিকারী প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবার দ্বারা আদর করিবেন।]

জীবন অল্পকালস্থায়ী। আমরা পূর্ববৎসর এখানে শ্রীগুরুপাদপদ্মের পূজা করতে মিলিত হয়েছিলাম, ভগবান্ যাদের কৃপা করলেন, তাঁরা চলে গেলেন, আর আমরা পরছিদ্রানুসন্ধান করবার জন্য—'তৃণাদপি সুনীচতা'র অভাবের আদর্শ দেখাবার জন্য এই দেবীধামে বিষয় ভোগে ব্যস্ত আছি।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম পরের ছিদ্র দর্শন হতে নিবৃত্ত থাকেন ; অথচ আমার অমঙ্গল, আমার শত-সহস্র ছিদ্র সর্বদা দেখিয়ে দেওয়া ছাড়া গুরুপাদ-পদ্মের কৃত্য নেই। শ্রীগুরু-পাদপদ্মের আদর্শ হতে আমরা যেন বঞ্চিত না হই। আজ থেকে আবার যদি এক বৎসর জীবিত থাকি, তবে প্রতি মুহূর্তে গুরুসেবা করব—পরচর্চাটা ছেড়ে দিব। 'আমি বড় বাহাদুর, আমি খুব পণ্ডিত, বুদ্ধিমান বক্তা, আর একজন মূর্খ, নির্বোধ, কিছু বলতে পারে না'—এইরূপ পরচর্চা কমিয়ে দিয়ে যদি হরিচর্চা করি, তা হলে মনে হয় আমাদের মঙ্গল হবে। তা বলে ভগবদ্বৈমুখ্যকে কখনই আদর করবো না।

অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের আশ্রয়াংশই শ্রীগুরুপাদপদ্ম, সেই বিষয়-বিগ্রহ দর্শনে কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং, গুরুপাদপদ্মাশ্রিত আমিও তদন্তর্গত আশ্রিত।

আশাভরৈরমৃতসিন্ধুময়ৈঃ কথঞ্চিৎ
কালো ময়াতিগমিতঃ কিল সাম্প্রতং হি।
ত্বঞ্চেৎ কৃপাং ময়ি বিধাস্যসি নৈব কিং মে
প্রাণৈর্ব্রজেন চ বরোরু বকারিণাপি॥

আমাকে কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করেন, আমরা সকলকে সিদ্ধ-প্রণালী দিয়ে ফেলি না কেন? আমি কিন্তু সাধক ও সিদ্ধের অবস্থা কিরূপে এক হয়, বুঝতে পারি না। অনর্থময় সাধনকালে অনর্থমুক্ত সাধন ও সিদ্ধির কথা কি করে অনুশীলন করা যায়, ইহা আমাদের বিচারে আসে না। কেহ যদি সিদ্ধ হয়ে থাকেন, তা হলে তিনি দয়া করে আমাকে বলে দিলেই ত জানতে পারি, তাঁর কোনটি সিদ্ধস্বরূপ।

শ্রীগুরুদেব মধুররসে বার্ষভানবী। নিজের উদ্বুদ্ধ চেতন-ভাবের বিচারানুসারে যিনি যেভাবে তাঁকে দর্শন করেন, গুরুদেব সেই বাস্তব বস্তু। বৎসলরসে তিনি—নন্দ-যশোদা, সখ্যরসে শ্রীদাম-সুদাম, দাসরসে গুরুপাদপদ্ম—চিত্রক-পত্রক। এই সকল বিষয়াশ্রয়ের আলোচনা গুরু-সেবা করতে করতে হৃদয়ে উপস্থিত হবে। এ সকল কথা কৃত্রিমভাবে হৃদয়ে উদিত হয় না; সেবা-প্রবৃত্তি উদিত হলে আপনা থেকে ভাগ্যবান জনে উদিত হয়ে থাকেন। আমাদের গুরুসেবা ব্যতীত অন্য কৃত্যই নেই। জড়জগতের মিশ্রভাব নিয়ে শেষ-শিব-ব্রহ্মাদির অগম্যা নিত্যলীলার কথা আলোচনা হয় না। আমি আপনাদের চরণে দণ্ডবৎ করছি—আমার গুরুবর্গকে দণ্ডবৎ করছি।

—:*:—

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

তৃতীয় প্রবাহ

"বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তনম্"

শ্রীচৈতন্যমঠে কোথায় কি লেখা থাকিবে

শ্রীল প্রভুপাদ ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের ১৯শে ফাল্গুন শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসবের অধিবাস-বাসরে অপরাহ্নে ভক্তবৃন্দকে উপদেশ প্রদান-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—"গৌরজন্মস্থলী শ্রীধাম মায়াপুরের শ্রীচৈতন্যমঠের প্রথম সীমায় 'ভক্তির্বিজয়তে' এই বাণীটী লিখিত থাকিবে। মধ্যে অবিদ্যাহরণ সারস্বত নাট্যমন্দিরের নিকট 'সঙ্কীর্তনং বিজয়তেতরাম্' বাণী লিখিত থাকিবে, আর সেইস্থানে প্রতিপদে 'চেতোদর্পণমার্জন', প্রতিপদে 'ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপণ', প্রতিপদে 'শ্রেয়ঃ-কৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণ', প্রতিপদে 'বিদ্যাবধূজীবন', প্রতিপদে 'আনন্দাম্বুধি-বর্ধন', প্রতিপদে 'পূর্ণামৃতাস্বাদন', প্রতিপদে 'সর্বাত্মস্নপন'—এই সপ্তজিহ্বাযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্তনাগ্নির একটী কুণ্ড নিরন্তর প্রজ্বলিত থাকিবে, যেন শ্রীচৈতন্যমঠে মহাপ্রলয়েও সেই শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তনাগ্নি নির্বাপিত না হয়, নিরন্তর যেন শ্রীচৈতন্যমঠ সঙ্কীর্তনাগ্নিতে প্রদীপ্ত থাকে, আর সেই কৃষ্ণ-সঙ্কীর্তনাগ্নি-কুণ্ড হইতে কৃষ্ণ-নাম-মন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তিগণের সংস্কার এবং বৈষ্ণব গৃহস্থগণের যাবতীয় সংস্কার সাধিত হইতে পারে, তাহা হইলেই প্রকৃত ব্রাহ্মণতা এবং গৃহমেধার পরিবর্তে মঠমেধা বা সঙ্কীর্তনমেধা সঞ্জীবিত থাকিবে।

শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীরাধাকুণ্ডের নিকট লিখিত থাকিবে,—'প্রেমা বিজয়তেস্তমাম্'। এখানে কাম বা আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছার কোন গন্ধ থাকিবে না। শ্রীরাধাগোবিন্দের পরিপূর্ণ ইন্দ্রিয়তর্পণই এখানে সর্বোপরি বিজয় লাভ করিবে। সঙ্কীর্তনাগ্নির চেতোদর্পণমার্জনময়ী শিখা প্রজ্বলিতা না থাকিলে আমাদের পরস্পর মনোমালিন্য, ছিদ্রান্বেষণ, মৎসরতা, কপটতা, বিদ্বেষ প্রভৃতি 'অনর্থ'- ধূলি-কঙ্করসমূহ নির্মল-দর্পণসদৃশ চিত্তকে আবরণ করিয়া রাখিবে এবং নানাপ্রকার উপশাখা প্রভৃতি বিস্তারে যে 'অনর্থ'-অরণ্যানী সৃষ্ট হইবে, তন্মধ্যে কেবল ভবমহাদাবাগ্নিই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। এইজন্য শ্রীপুরুষোত্তম ভট্টাচার্য—যিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বিতীয়স্বরূপ-রূপে শ্রীস্বরূপ-দামোদর সেই শ্রীস্বরূপপ্রভু সংকীর্তনপ্রবর্তক শ্রীচৈতন্যদয়ানিধির অমন্দোদয়-দয়াদ্বারা হেলায় জীবকুলের চেতোদর্পণের অনর্থধূলি কঙ্কর নীরজীকরণের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন।

সঙ্কীর্তনাগ্নির সপ্তজিহ্বা

যেরূপ শাস্ত্রে করালী, ধূম্রিনী, শ্বেতা, লোহিতা, নীললোহিতা, সুবর্ণা ও পদ্মরাগা—এই সপ্তজিহ্বাযুক্ত অগ্নির কথা রহিয়াছে, তদ্রূপ শ্রীগৌরসুন্দর, চেতোদর্পণমার্জনাদি সপ্তজিহ্বাশালী সংকীর্তনাগ্নির কথা কীর্তন করিয়াছেন। সংকীর্তনাগ্নি প্রজ্বলিত না হইলে কখনও ভবের মূলোৎপাটন এবং অপুনর্ভবের চরমফল প্রেমা উদিত হইতে পারে না। শ্রীগৌরসুন্দর এই সংকীর্তনাগ্নির সপ্তজিহ্বাকে সাতটী উপমাদ্বারা উপমিত করিয়াছেন। চিত্তকে দর্পণের সহিত, ভবকে মহাদাবাগ্নির সহিত, শ্রেয়ঃকে কুমুদের জ্যোৎস্না বা শুভ্রত্বের সহিত, বিদ্যাকে বধূর সহিত, আনন্দকে সাগরের সহিত, প্রেমকে অমৃতের সহিত, কৃষ্ণসেবা-

প্রাপ্তিকে অবগাহন স্নানের সহিত তুলনা করিয়াছেন। 'প্রতিপদং' ক্রিয়াবিশেষণটী এই সাতটী বিশেষণের প্রত্যেকটীর পূর্বেই ব্যবহৃত হইবে। এই কৃষ্ণ-সঙ্কীর্তনাগ্নি জগতের যাবতীয় অন্যাভিলাষ, কর্ম, জ্ঞান, যোগ, ব্রত ও তপঃ—সমুদয়কে ভস্মসাৎ ও আত্মস্মাৎ করিয়া সর্বোপরি বিজয়লাভ করিবে এবং বিশ্বের যেখানে যত সুমেধা হইয়াছেন ও হইবেন, সকলেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সংকীর্তনের সর্বোপরি বিজয় উপলব্ধি করিতে পারিবেন। কুমেধাগণই অন্যসাধন ও সাধ্যের স্বীকার করেন; কিন্তু সুমেধাগণ সঙ্কীর্তনযজ্ঞে অকৃষ্ণবরণ পুরটসুন্দরদ্যুতি রুক্মবর্ণ মহাপুরুষের আরাধনা করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবত 'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাহ-কৃষ্ণম্', 'ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহম্', 'ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজসুরেপ্সিত-রাজ্যলক্ষ্মীম্' প্রভৃতি শ্লোকে প্রচ্ছন্নাবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের বন্দনা করিয়াছেন। সুমেধাগণের সপ্তজিহ্বাযুক্ত সঙ্কীর্তন-যজ্ঞাগ্নি শ্রীচৈতন্যমঠে নিরন্তর প্রজ্বলিত থাকুক। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসঙ্কীর্তন হইলেই সত্যযুগের মহাধ্যান, ত্রেতার মহাযজ্ঞ, দ্বাপরের মহার্চন যুগপৎ সাধিত হইবে। সত্যযুগে চারিপাদ ধর্ম পূর্ণভাবে থাকিলেও ধ্যানমাত্র হইত, ত্রেতায় ত্রিপাদধর্মে যজ্ঞমাত্র হইত, দ্বাপরে দ্বিপাদধর্মে অর্চনমাত্র হইত; কিন্তু কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবে সঙ্কীর্তন আবিষ্কৃত হইলে যুগপৎ মহাধ্যান, মহাযজ্ঞ ও মহার্চন সাধিত হইবার সুযোগ প্রদত্ত হইয়াছে। সঙ্কীর্তনব্যতীত শ্রীরাধাগোবিন্দমিলিততনুর সেবা হয় না; অর্চনের দ্বারা শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা হয় না; মহার্চন সঙ্কীর্তন আবশ্যক। যোগিগণের সাধন—ধ্যানে গোপিকাগণ তৃপ্ত হইতে পারেন না। দূরের জিনিষ—অপ্রাপ্ত জিনিষ—আবৃত জিনিষ ধ্যানের যোগ্য। আপনার হইতে আপনার জিনিষ, সহজ সর্বস্ব জিনিষ, নিত্য-আলিঙ্গিত বস্তু দূরের বস্তুর ন্যায় ধ্যানের যোগ্য নহে—

"চিত্ত কাড়ি' তোমা হৈতে, বিষয়ে চাহি লাগাইতে,
যত্ন করি, নারি কাড়িবারে।
তারে **ধ্যান** শিক্ষা করাহ, লোক হাসাঞা মার,
স্থানাস্থান না কর বিচারে॥
নহে গোপী যোগেশ্বর, পদকমল তোমার,
ধ্যান করি' পাইবে সন্তোষ।"

আচার্য শ্রীরামানুজ ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার বৈশিষ্ট্য

ধ্যানৈশ্বর্য, যজ্ঞৈশ্বর্য, অর্চনৈশ্বর্যের আভাসেও গোপীর বিরাগ। আচার্য শ্রীরামানুজ অর্চনৈশ্বর্যের কথা জগতে প্রচার করিয়া বহু অর্চন বিমুখ অনর্থ-পীড়িত ব্যক্তির মঙ্গল সাধন করিয়াছেন। যে আচার্য রামানুজ মায়াবাদমত্তহস্তীকে প্রবলবেগে দলিত করিয়া জগতে মহাবরণীয় বৈষ্ণবাচার্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, এরূপ মহা বৈষ্ণবও সঙ্কীর্তনৈক-লভ্য কৃষ্ণপ্রেমের মধুরিমা বুঝিতে পারেন নাই। এই শ্রীধাম মায়াপুরে সেনবংশীয় রাজগণের সভা-কবি জয়দেব একদিন ইঙ্গিতে খানিকটা গৌরাবির্ভাবের গৌরচন্দ্রিকা গান করিয়া গীতগোবিন্দের মঙ্গলাচরণ করিয়াছিলেন।

"মেঘৈর্মেদুরমম্বরং"-শ্লোকের গূঢ় তাৎপর্য

শ্রীজয়দেব-সরস্বতী গৌরাবির্ভাবের আগমনী এইরূপভাবে গান করিয়াছেন,—

"মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈ-
র্নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়।
ইত্থং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃ-কেলয়ঃ॥"

"হে রাধে, নভোমণ্ডল নিবিড় ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল, বনভূমিও তমালতরুনিকরে কৃষ্ণবর্ণ, নিশাভাগে শ্রীকৃষ্ণ ভীরু, একাকী গমনে সমর্থ হইবে না; সুতরাং তুমি শ্রীকৃষ্ণকে নিজ সমভিব্যাহারে লইয়া গৃহে যাও!—নন্দের এইরূপ আদেশে বৃষভানুনন্দিনী হরির সহিত মিলিত হইয়া পথপ্রান্তবর্ত্তী কুঞ্জতরুর অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এই রাধামাধবমিলিতযুগলের যমুনাকূলে বিরলকেলি জয়যুক্ত হউন।"

পূজারী গোস্বামী উক্ত শ্লোকের যে টীকা করিয়াছেন, তাহার দ্বারা সকল কথা সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয় নাই। মহানুভব বৈষ্ণবগণের হৃদয়ে শ্রীজয়দেব সরস্বতী এই গৌরচন্দ্রিকা যে-ভাবে প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তাহাতে শ্রীধাম মায়াপুরের মহাযোগপীঠের এক প্রকোষ্ঠে শ্রীরাধামাধব ও স্বতন্ত্ররূপে রাধামাধবমিলিততনু গৌরশশধরের প্রকট লক্ষিত হয়। পারমার্থিক আকাশ নানামতবাদরূপ নিবিড় ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছে, বৃন্দা-বিপিনের তরুনিকরের মাধুর্যময়ী সুষমা নানাপ্রকার আবরণে লোকলোচনে অন্ধকারময় প্রতিভাত হইয়াছে, দ্বাপরের নিশাভাগে অর্থাৎ দ্বাপরের শেষে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়া "মামেকং শরণং ব্রজ", "অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ" প্রভৃতি যে সকল সাক্ষাদ্‌বাণী নিজোদ্দেশে বলিয়াছিলেন, নাস্তিকতার নিশা ও নেশা প্রবল হইলে জীবকুল স্বরাট্ পুরুষোত্তমের সেই সকল বাণীকে আসুর-বুদ্ধিতে দম্ভময়ী বিচার করিয়া মঙ্গলের পথ হইতে বিচ্যুত হইতেছে; সুতরাং এ সময় শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে গমন করিলে কেহ তাঁহার কথা গ্রহণ করিবে না। লোকলোচনে শ্রীকৃষ্ণের এই ভীরুতার প্রতীতিকে প্রশমিত করিবার জন্য বৃষভানুনন্দিনীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলিত হইয়া আবির্ভাব আবশ্যক। সুতরাং 'গৃহং প্রাপয়' অর্থাৎ 'গৌরগৃহং মহাযোগপীঠং প্রাপয়', গৌরগৃহ মহাযোগপীঠে রাধামাধব-

মিলিততনু হইয়া গমন কর—নন্দগৃহ বা পুরন্দর জগন্নাথমিশ্রগৃহ যোগপীঠে গমন কর।

নন্দের অপর এক নাম—বাসুদেব। যদিও আমরা চতুর্থ স্কন্ধে 'সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতম্' শ্লোকে খানিকটা ঐশ্বর্যমার্গের বিচার দেখিতে পাই, তথাপি বিশুদ্ধসত্ত্বেই বাসুদেবের আবির্ভাব। রাধামাধব-মিলিততনুর আবির্ভাবের অধিবাসোৎসব সঙ্কীর্তনমুখে সাধিত হউক, অন্য সমস্ত চিন্তাস্রোত সঙ্কীর্তনাগ্নিতে দগ্ধীভূত হইয়া যাউক, কৃষ্ণ-কামাগ্নি, কৃষ্ণনামাগ্নি, কৃষ্ণধামাগ্নিতে বিশ্বের নিখিল চেতন ইন্ধন হউক। অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন আবির্ভূত হওয়ায় শ্রীযমুনার সহিত অভিন্নতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন যে গঙ্গাদেবী, তৎকূলে রাধামাধবমিলিত যুগলের রহঃকেলি যে সঙ্কীর্তনরাস, তাহা জয়যুক্ত হউক।

শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভা

[শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীগৌরাবির্ভাবালয় শ্রীযোগপীঠে ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের ২১শে ফাল্গুন বৃহস্পতিবার রাত্রি ৯ ঘটিকায় শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার সপ্তত্রিংশদ্ বার্ষিক অধিবেশনে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা]

সভার প্রাকট্য ও উদ্দেশ্য

আজ শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার বার্ষিক অধিবেশন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পরে ৪৪৫ বৎসর বিগত হয়েছে। এখন প্রবর্তমান বর্ষ ৪৪৫ এর পরবর্তী বর্ষ। শ্রীধাম-প্রচারিণী সভা শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকট বর্ষের

৪০৭ বৎসর পরে অর্থাৎ ৪০৭ চৈতন্যাব্দে এখানে প্রকটিত হয়েছিলেন, সুতরাং সভার এই অধিবেশনটী সপ্তত্রিংশদ্ বার্ষিক অধিবেশন। এই ধামপ্রচারিণী সভার উদ্দেশ্য ছিল,—যেস্থানে শ্রীগৌরসুন্দর আবির্ভূত হয়েছেন, যেখানে জগতের জীবগণ এই প্রপঞ্চে প্রপঞ্চাতীত-ধাম-দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন, সেই স্থানের স্বতঃসিদ্ধ-শোভা পুনঃ প্রকটন ও প্রচারমুখে প্রদর্শন করা। বিগত কয়েক বর্ষ এই সভা তাঁর প্রচার-কার্য করেছেন। এই সভার কার্য বহুদিন থেকে নানাপ্রকারে বহু জনের দ্বারা সম্পাদিত হচ্ছিল ও হচ্ছে। শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব স্থলী যে শ্রীধাম, তাঁর সম্পর্কিত নানা কথা এবং সেই ধামের প্রচার-কার্যের সহিত সংশ্লিষ্ট অনেক বিষয় শ্রীধাম-প্রচারিণী সভা জগতে প্রচার করেছেন ও করছেন।

'ধাম'-শব্দের অর্থ আশ্রয়, আলোক, কিরণ প্রভৃতি। শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভা শ্রীগৌরসুন্দরের পদনখ এবং তাঁর পদরেণুবর্গের অর্থাৎ দাসবর্গের কিরণ-প্রচারিণী সভা। 'শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভা' বললে অনেকে স্থূল বিচারাবলম্বন করে মনে করেন,—শ্রীগৌরসুন্দর জগতে প্রকটিত হয়ে যেস্থানে ভ্রমণাদি করেছিলেন, সেই স্থান মাত্র। ইহাকে ইংরেজী ভাষায় বলতে হলে exoteric representation বলা যায়। শ্রীধামপ্রচারিণী সভা এই প্রকার বিচারপরায়ণ ব্যক্তিদিগের নিকটে সেই সকল স্মৃতি ও ভগবৎকথার উদ্দীপন করে তাঁদের স্থূল বিচারকে ক্রমে আন্তর বিচারে প্রতিষ্ঠিত করেন। বহিঃপ্রজ্ঞাচালিত বিচারকগণের চিত্রপটে যাহা ধাম বলে প্রতিভাত হয়, শ্রীধামপ্রচারিণী সভা যে তাঁরই মাত্র প্রচার করেন, তা নয়; শ্রীধামপ্রচারিণী সভার প্রকৃত উদ্দেশ্য exoteric representation এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

শ্রীব্রহ্মসংহিতাদি গ্রন্থ আমরা শ্বেতদ্বীপ, সিতদ্বীপ, গোলকে বৈকুণ্ঠের বর্ণন দেখতে পাই। শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীরূপ-সনাতন শিক্ষার মধ্যে ভগবানের শ্রীধামসমূহের বিস্তৃতি ও বিভিন্ন বৈভবের কথা শব্দমুখে প্রকটিত রয়েছে। আমাদের কর্ণেন্দ্রিয় আছে, যখন মহানুভবগণের দ্বারা শব্দ উদ্‌গীত হন, তখন কর্ণ সেবোন্মুখতা প্রাপ্ত হলে কর্ণদ্বারা শব্দ প্রবিষ্ট হয়ে চেতনময় রাজ্যে স্থায়ী-ভাবের উদ্দীপনা করায়। বাহ্য-বিষয় ও ইন্দ্রিয়সমূহ যে সকল বাধা উপস্থিত করে, বৈকুণ্ঠশব্দ সেই সকল বাধাকে অতিক্রম করিয়ে বৈকুণ্ঠ-গোলকের চিন্ময়-ভাব-স্রোত প্রবল-বেগে উচ্ছলিত করে দেয়। যাঁরা মনোময় ভূমিকায় অবস্থিত আছেন, বহিঃপ্রজ্ঞার বিচার অবলম্বন করেছেন, তাঁরা ব্রহ্মগায়ত্রীর প্রতিপাদ্য বিষয় 'ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ' বুঝতে পারেন না। যে 'ধী' বা 'বুদ্ধি'র কথা বলতে গিয়ে শ্রীমদ্ভাগবত বলেছেন,—

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্‌গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা **বুদ্ধি**স্তদাশ্রয়া॥ *

(ভাঃ ১।১১।৩৮)

ব্রহ্মা যে গানের দ্বারা জড়জগতের আধ্যক্ষিকতা হতে উৎক্রান্ত হবার আদর্শ প্রদর্শন করেছেন, সেই ত্রাণকারী গানের বা গায়ত্রী প্রতিপাদ্য ভূমিকায় আমরা যে বুদ্ধির কথা পাই, তা স্থিরা বুদ্ধি, অচঞ্চলা মতি, ভগবানের সেবাময়ী বৃত্তি ; সেটী ব্রহ্মবৃত্তি, ক্ষুদ্রবৃত্তি নয়, সকল শক্তি-সমন্বিতা পালনীশক্তির প্রচারিকা বৃত্তিবিশেষ। জীব-হৃদয়ের মলিনতা বিদূরিত হলে আমরা সেই বৃত্তি জানতে পারি। প্রকৃত

---

* প্রকৃতিস্থ হইয়া তাহার গুণের বশীভূত না হওয়াই ঈশ্বরের ঈশিতা। মায়াবদ্ধ জীবের যখন ঈশাশ্রয়া হয়, তখন তাহা মায়াসন্নিকর্ষেও মায়াগুণে সংযুক্ত হয় না।

প্রস্তাবে অবিমিশ্র চেতনাবস্থায় নীত হলে সেরূপ বৃত্তি আমাদের চেতনে উদ্ভাসিত হয়।

শ্রীধামপ্রচারিণী সভার উদ্দেশ্য

কেবলমাত্র স্থূলবুদ্ধিজনগণের ধামের যেরূপ নির্দেশ বা বিচার, সেরূপ ভোগময়ী ভূমিকা শ্রীধাম নহেন। একথা আমরা শ্রীধামাপরাধ বিচারকালেও দেখতে পেয়েছিলাম। শ্রীনামাপরাধের ন্যায় শ্রীধামা-পরাধও দশটী। শ্রীধামবাসের ছলনা করে ইন্দ্রিয়তর্পণ 'ধাম-সেবা' নহে। শ্রীগৌরসুন্দর প্রয়াগের দশাশ্বমেধঘাটে শ্রীরূপ-শিক্ষার মধ্যে প্রকৃতি-সম্ভূত জগতের অতিক্রান্ত অবস্থায় যে ধামের কথা বলেছিলেন, সেই ধামশিক্ষার কথা শ্রীধামপ্রচারিণী সভার ধামশিক্ষার সহিত অভিন্ন ব্যাপার। যাঁদের শুদ্ধ অদ্বয়জ্ঞানের উদয় না হয়েছে, তাঁরাই এতে ভেদ করে থাকেন। তাঁরা সর্বভূতে ভগবদ্ভাব-দর্শন—ধামের স্বরূপ-দর্শনের অভাব-হেতু প্রাকৃত জগতের জীববিশেষে পরিণত হয়ে যান। জড়কাম পরিপূরণের জন্য ধামসেবার ছলনা করে যে সকল বিপনি সৃষ্ট হয়েছে, শ্রীধামপ্রচারিণী-সভার উদ্দেশ্য সেরূপ বিপনির উন্মোচন নহে। শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার উদ্দেশ্য,--যারা বহিঃপ্রজ্ঞা হতে অন্তঃপ্রজ্ঞায় উদ্বুদ্ধ, তাদিগকে সহায়তা করা। সঙ্কল্প-বিকল্পাতীতা স্থিরা বা বৃহতী বৃত্তিতে স্থাপিত হবার জন্য বাহ্যে যে স্থূলা চেষ্টার অভিনয়, তার উদ্দেশ্য স্থূল-সম্বর্ধনামাত্র নহে, সূক্ষ্ম ও অতি সূক্ষ্ম আবরণ ভেদ করে চেতনরাজ্যের পূর্ণ-বিস্তার বা চেতন রাজ্যের সোপান নির্মাণ করে দেওয়া। সেখানে বৈকুণ্ঠ-শব্দের সম্বর্ধনাই উদ্দেশ্য। অপরা বিদ্যা প্রবর্ধনাদি ধামপ্রচারিণী সভার গৌণ বা অবান্তর উদ্দেশ্য মাত্র, মুখ্য উদ্দেশ্য—ভগবানের প্রকট চিন্ময়ভূমি অবিমিশ্র চেতন বৃত্তিতে উদ্ভাসিত করবার বিচার-প্রণালীতেই

অধিষ্ঠিত। যে সকল কথা আধ্যক্ষিক বিচার অবলম্বন করে নিজে বুঝি বা বুঝাতে চেষ্টা করি, তা ক্ষুদ্র বিষয়ের অভিজ্ঞান বৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। তা হতে অতিক্রান্ত হয়ে মানবজীবনের সফলতা যে বৈকুণ্ঠনাম-গ্রহণ এবং বৈকুণ্ঠনাম-কীর্তন, তাই শ্রীধামপ্রচারিণী সভার উদ্দেশ্য ছিল ও আছে। বর্তমান সময় শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সভ্যগণ শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার সহিত সংযুক্ত হয়ে সেই উদ্দেশ্যেরই আরতি করছেন। শ্রীধামপ্রচারিণী সভার মূল পুরুষ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কৃপাসিক্তজনগণ যে ধামের উপলব্ধি করেছেন, সেই ধামের সেবা করবার জন্য প্রযোজ্যকর্তৃত্ব লাভ করে যাঁরা চিন্ময় ধাম-সেবার সুপ্তবৃত্তিকে জাগরিত করছেন, তাঁদের গুণাবলী শ্রবণ করলাম। তাঁদের গুণাবলী শ্রবণ করা আমাদের আজ একমাত্র কৃত্য ছিল। সম্বৎসরের এই দিবসে গৌরজন্মস্থলীতে গৌর-প্রিয়কার্যানুষ্ঠাতৃগণের গুণানুবাদ শ্রবণ করে সম্বৎসরকাল গৌরপ্রিয়সেবায় সঞ্জীবিত এবং উত্তোরোত্তর উদ্বুদ্ধ হওয়ার জন্যই শ্রীধামপ্রচারিণী সভা এই অনুষ্ঠানটি প্রবর্তন করেছেন।

কঃ উত্তমঃশ্লোক গুণানুবাদাৎ
পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ। *

ভগবানের ধাম, নাম ও কামসেবার কথা আত্মঘাতী না বুঝে জড়জগতের ভোগময়ী ভূমিকাকেই 'ধাম' বলে ক্ষুদ্র জড় চেষ্টায় বাক, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থাদি ইন্দ্রিয়বর্গের পরিচালনা করে যে কাম চরিতার্থ করবার বাসনা পোষণ করে, সেই অনর্থ হতে নির্মুক্ত হওয়ার জন্য ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এই চতুর্বর্ণ এবং সঙ্কর বর্ণসমূহকে শ্রীধামপ্রচারিণী সভা ধামসেবায় নিযুক্ত

* একমাত্র পশুঘাতী ব্যাধ ব্যতীত আর কোন ব্যক্তি উত্তমঃশ্লোক শ্রীভগবানের ও তদীয় ভক্তগণের গুণকীর্তন হইতে বিরত হয়?

করবার চেষ্টা করছেন। শ্রীধামপ্রচারণী সভার সভ্যগণ এই সকল সেবা চেষ্টার মধ্য দিয়া গন্তব্যস্থানে গমন করলে জানতে পারবেন, ভগবদ্ধামসেবা, ভগবন্নামসেবা ও ভগবৎকামসেবাই একমাত্র প্রয়োজনীয় বিষয়।

শ্রীধামপ্রচারিণী সভার মূল প্রাণস্বরূপ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় বহু লোকের নিকট এ সকল কথা বলেছেন; কিন্তু ভাগ্যের অভাব-হেতু আমাদের মত লোক তাঁতে কর্ণপাত করতে পারে নি বা নিজের যোগ্যতার অভাব-হেতু তা ধরতে পারে নি, সেজন্য আমরা বিশেষ দুঃখিত।

ভক্তসেবার মাহাত্ম্য

গৌরপ্রিয় কার্যানুষ্ঠাতৃগণের যে গুণকীর্তন, উত্তমঃশ্লোকের যে গুণকীর্তন, তা শুনবার অধিকার যাঁরা দেন, এমন যে কীর্তনকারী গুরুবর্গ—গুরুপদাশ্রিত গুরুবর্গ, আমাদের প্রাক্তন কর্মবশে তাঁদের কথা শুনবার অধিকার হয় না। আমরা প্রাক্তন কর্মের দ্বারা "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে॥" —এই গীতার শ্লোকানুসারে 'আমি কর্তা'—এই দম্ভে হত হই। যদি অহঙ্কার দৃপ্ত হই, তবে গুর্ববজ্ঞারূপ একটা মহদপরাধ এসে উপস্থিত হয়! কিন্তু আমরা যে গুরুপাদপদ্মের অনুগত, সেই গুরুপাদপদ্ম এরূপ শিক্ষা দেন নি। মহাপ্রভুর প্রিয়কার্যের অনুষ্ঠান যাঁরা করেন, তাঁরা পূজ্য—সেব্য। **ভগবান্ যেরূপ সেব্য, তদপেক্ষাও অধিকতর সেব্য ভগবানের সেবক-সম্প্রদায়।** গৌরসুন্দর এবং প্রকৃত গৌরভক্তগণ আমাদিগকে জানিয়েছেন,—

অর্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চয়েৎ তু যঃ।
ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ॥

যাঁরা কায়মনোবাক্যে ভগবানের সেবা করেন, তাঁরা বিষয় ও আশ্রয়-বিগ্রহের যুগপৎ সেবা করে থাকেন। কার্ষ্ণসেবার সহিত আত্ম-প্রতীতির সর্বতোভাবে সংযোগ আছে। যাঁদের তা নেই, তাঁরা গুরু-পাদপদ্মসেবা বুঝতে পারেন না। শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা করবার পূর্বে গুরুসেবা. সেই গুরুসেবা সপার্ষদ গুরুদেবের সেবা। সপার্ষদ গুরুসেবা না হলে আত্ম-প্রতীতি উদ্বুদ্ধ হয় না। আত্ম-প্রতীতির অভাবে, নিষ্কপট সপার্ষদ গুরুপাদপদ্ম-পূজার অভাবে তোতাপাখী যেরূপ কথা শিখে, বুলি আওড়ায়, আমরাও সেরূপ শব্দ উচ্চারণ করি মাত্র। আমরা বড় বড় লম্বা লম্বা কথা বলি, কিন্তু গীতার "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি"—গীতার চরমশ্লোকে "মামেকং শরণং ব্রজ" একবারও স্মরণ করি না। আমরা নিজেরা আমাদিগকে খুব বড় মনে করি—প্রকৃতির অতীত রাজ্যের অপ্রাকৃত ভাব লাভ করেছি, কল্পনা করি। অপ্রাকৃত ভাব লাভ না করলে কোন মঙ্গল লাভ হবে না; কিন্তু প্রাকৃত অবস্থা থেকে যদি অপ্রাকৃত ভাব লাভ করেছি মনে করি, তাহলে সেরূপ মনে করা অবৈষ্ণবতা। এই **অবৈষ্ণবতা উপলব্ধির নামই—দৈন্য।** আর সেই **অবৈষ্ণবত উপলব্ধি না করার নাম—দম্ভ।**

কর্মী ও ভক্তের বিচারের পার্থক্য

গৌরসুন্দরের শিক্ষা-বিস্তারের অভাবে জড়জগতে প্রভুত্বের বিচার এসে উপস্থিত হয়েছে। তাঁর ধাম-সেবক, নাম-সেবক, কাম-সেবক যখন এই জগতে আসেন, তখন তাঁরা ধামপ্রচারিণী সভাপ্রকটে উদ্‌যোগী হন। তাঁদেরই শাখা, প্রশাখা, পল্লব, পুষ্প প্রভৃতি তদ্রূপবৈভব চিন্ময় ধামের প্রচার সংরক্ষণের জন্য যত্ন করে থাকেন। সেই যত্ন যেখানে যেখানে দেখা যাবে, সেখানে সেখানে কার্ষ্ণ-দাস্য ও কৃষ্ণ-দাস্য উদিত

হয়েছে। কিন্তু তা হতে বিচ্যুত হয়ে যদি আগাছাকে আশ্রয় করি, আগাছার শাখা-প্রশাখা-পল্লব-পুষ্পরূপে বিস্তারিত হই, তা হলে বৈষ্ণবের ছিদ্রান্বেষণ ছাড়া আর কিছু করব না, সেটাই কর্মকাণ্ড। কর্মকাণ্ডের বিচারকগণ মনে করেন,—আমরা যোষিৎপতি হব, সকলের উপর প্রভুত্ব করব, বৈশ্যনীতির অবলম্বন করব ইত্যাদি। 'আমি বড় বাহাদুর'—ইহা কর্মকাণ্ডিয়গণের বিচার। আমার কৃতিত্বের অভাব হইলেই আমি বৈষ্ণব হয়ে যাই; এজন্য অত্রি ঋষি আমাদিগকে জানিয়েছেন,—

বেদৈর্বিহীনাশ্চ পঠন্তি শাস্ত্রং শাস্ত্রেণ হীনাশ্চ পুরাণপাঠাঃ।
পুরাণহীনাঃ কৃষিণো ভবন্তি নষ্টা কৃষের্ভাগবতা ভবন্তি ॥ *
(অত্রিসংহিতা, ৩৭৫ শ্লোক)

বলের অভাব হলেই আমরা বৈষ্ণব হতে চাই। কিন্তু বাস্তবিক বলবতী আত্মশক্তিই বৈষ্ণব। সেই বল পাশবিক বল বা শারীর বল নয়, তা বৈষ্ণবের পদধৌত জল, বৈষ্ণবের পদরেণু ও বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট। বলদেব-নিত্যানন্দ-গুরুপাদপদ্মসেবক বৈষ্ণবের পদধূলিতে যাঁরা বলবন্ত হন, তাঁরাই প্রকৃত বলবন্ত। বৈষ্ণব পরম নির্মল বস্তু, তাঁর পাদপদ্মে কোন ধূলো-কাদা বা মলিনতা নেই; কিন্তু তিনি কৃপা করে যে পাদপরাগ রেণু রেখে যান, সেই পদধূলি যদি আমরা আমাদের মাথার

---

* বেদশাস্ত্রে পরিশ্রম করিয়া ফল উৎপন্ন করিতে অসমর্থ হইলে ব্রাহ্মণ ধর্মশাস্ত্র পাঠ আরম্ভ করেন। ধর্মশাস্ত্রে বিশেষ কৃতীত্ব লাভের অভাব হইলে, তিনি পুরাণবক্তা হন এবং পুরাণবাক্যের তাৎপর্যগ্রহণে অসমর্থ হইলে কৃষক হইয়া পড়েন, তাহাতেও তাহার ভোগের ব্যাঘাত ঘটিলে, উহা ছাড়িয়া দিয়া ভাগবত-পাঠক বা ভণ্ড-ভাগবত হইয়া পড়েন।

মুকুট করে রাখতে পারি, তবেই সাম্রাজ্য বা স্বারাজ্য লাভ করতে পারব। আমরা যেন কার্ষ্ণসেবা হতে কখনও বঞ্চিত না হই।

আধ্যক্ষিকগণের বিচার বহুমাননীয় নহে

বিগতবর্ষে একটা নূতন কথা ও নূতন দৃশ্য দেখবার অবসর পেয়েছি। এতদিন শুনেছিলাম, কেবল মূর্খ-সম্প্রদায়ই শ্রীগৌড়ীয়মঠের কথা বুঝতে না পেরে নানাপ্রকার বিরুদ্ধ ও অবৈধ আনু-করণিক প্রতিযোগিতা বা মর্কট-মুখভঙ্গী করতে যায়; কিন্তু শিক্ষিতম্মন্য সম্প্রদায়ও নির্মল পারমার্থিক শিক্ষার প্রতিষ্ঠানকে আক্রমণ করবার চেষ্টা করছেন, ইহাও প্রত্যক্ষীভূত হয়েছিল, এটা বড়ই শুভ জ্ঞাপক। যদি প্রচার-কার্যের ফলটা আরম্ভ হয়েছে দেখতে পাই, তার চেয়ে শুভ আর কি আছে? যেমন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় Aggravation (রোগবৃদ্ধি) বলে একটা কথা আছে; ব্যারামটা যখন বেড়ে যাচ্ছে, তখন চিকিৎসিত-রোগীর মধ্যে ঔষধের কাজ হয়েছে বুঝা যাচ্ছে; কিন্তু চিকিৎসিত গণের বিষ উদ্গীর্ণ হয়ে চিকিৎসকম্মন্যদিগকে—আমাদের ধাম-সেবকাভিমানিগণকে আচ্ছন্ন না করে ফেলে, তাঁরা কর্মকাণ্ডীয় বিচারে আচ্ছন্ন হয়ে না যান, এটুকুই আমার প্রার্থনা, তাঁরা জ্ঞানকাণ্ডী হয়ে নির্বিশেষবাদী না হয়ে পড়েন, অন্যাভিলাষী হয়ে চৈতন্যবাণী-কীর্তন বন্ধ না করে ফেলেন! সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মিকা মনোবৃত্তি দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে আমরা সৎ ও অসতে আসক্ত হই। কিন্তু ভাগবতে কৃষ্ণের যে বর্ণিত সংজ্ঞা পেয়েছি, তাতে জানতে পারি, তিনি,—

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যৎ যৎ সদসৎপরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্॥ *
(ভাঃ ২।৯।৩২)

---

* এই জগৎ সৃষ্টির পূর্বে কেবল আমি ছিলাম। সৎ, অসৎ এবং

কেবল প্রতিষ্ঠাকামী হয়ে ভক্তিকে কর্মমাত্রে পর্যবসিত করলে জাগতিক সুবিধা হতে পারে ; কিন্তু তদ্দ্বারা কোন পারমার্থিক মঙ্গল লাভ হবে না। বহির্দর্শন হতে পৃথক থেকে অন্তর্দর্শন, আবার অন্তর্দর্শনকে অতিক্রম করে যে বাস্তবদর্শন তাতে প্রবিষ্ট হলে এ সকল কথা জানতে পারা যায়। এই শ্রীধামের সেবা করবার জন্য আমরা 'মায়ার ব্রহ্মাণ্ডে' (আমার গুরুদেব কলিকাতাকে 'মায়ার ব্রহ্মাণ্ড' বলতেন) যাই। শ্রীধামপ্রচারিণী সভার সেবা যাতে পূর্ণভাবে ফলবতী হয়, সেজন্য আমরা কলিকাতায় যাই, মাদ্রাজে যাই, শিলং যাই, মুসৌরিতে যাই, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, ঢাকায় যাই, এমন কি গ্রামের অতীব গ্রাম্য কথায় প্রবেশ করি। আকুমারিকা হিমাচল ভবঘুরের ন্যায় ঘুরে বেড়াবার জন্য আমদের আবশ্যকতা কি ? কিন্তু যে গৌরসুন্দর সর্বত্র বিচরণ করেছেন, সেই গৌরসুন্দরের মনোঽভীষ্ট—

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

—সত্য সত্য সর্বত্র প্রচারিত হউক, সর্বত্র চৈতন্যসংকীর্তনাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হউক, এই জন্যই ভবঘুরের বৃত্তি অবলম্বন করা। যেস্থানে ভগবানের নাম প্রচারিত হয়, তাহাই ধাম—যে নামে ভগবানের কাম পূর্ণ হয়, তাহাই ভগবন্নাম—যে-কামে ভগবানের নাম প্রচারিত হয়, তাহাই প্রকৃত ভগবৎকাম।

"যদ্যপ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্তব্যা তদা কীর্তনাখ্যা ভক্তিসংযোগেনৈব।" কীর্তনাখ্যা ভক্তি শব্দাশ্রিতা। বৈকুণ্ঠ-শব্দ ভূতাকাশের আবর্জনাকে

অনির্বচনীয় নির্বিশেষ ব্রহ্ম পর্যন্ত অন্য কিছুই আমা হতে পৃথকরূপে ছিল না। সৃষ্টি হইলে পর এ সমুদয়-স্বরূপে আমিই আছি এবং সৃষ্টি লয় হইলে একমাত্র আমিই অবশিষ্ট থাকিব।

সরিয়ে দিয়ে আকাশে পরব্যোম প্রকট করিয়ে দেয়। অনেকে বলেন, সত্য, মহঃ, জন, তপোলোক আমাদের কাম্য ; ভূঃ, ভুবঃ, স্বর্লোক কাম্য নহে। . ভূঃ, ভুবঃ, স্বর্লোক গৃহস্থ লোকের কাম্য। সত্য, মহঃ, জন, তপোলোকে গৃহস্থগণ কখনই গমন করতে পারেন না। যাঁরা সমাবর্তন করেছেন, তাঁরা যত শ্রেষ্ঠ গৃহস্থই হউন না কেন, তাদের সত্য, মহঃ, জন, তপোলোকে অধিকার নেই ; শান্ত ও নির্মল সন্ন্যাসিগণের সেখানে যাওয়ার একমাত্র অধিকার। কিন্তু যে-সকল গৃহস্থ অনুক্ষণ হরিকথায় গুরুপাদপদ্মসেবাগত চিত্ত হয়ে বৈকুণ্ঠ-গোলকে বাস করেন, সে সকল গৃহস্থের গৃহ সাধারণ গৃহ নহে—সপ্তব্যাহৃতির অন্তর্গত স্থান মাত্র নহে। এরূপ গৃহস্থ যেখানেই থাকুন, তাহাই ধাম। তাঁর কামই ভগবৎকাম। তাঁর যে বাহ্য দুরাচার তা, তার অনন্যভজনের জন্য আত্মগোপন মাত্র। যাঁরা ছিদ্র দর্শন করেন না, তাঁরাই মহাভাগবত। ভগবদ্ধামের, ভগবন্নামের ও ভগবৎকামের কথায় যিনি প্রচুর পরিমাণে দান করেছেন সেই অহৈতুক দয়ার্দ্রচিত্ত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গুণানুবাদ পূর্ণমাত্রায় তখনই হয়—যখন তদাশ্রিত নিষ্কপট ব্যক্তিগণের গুণানুকীর্তন হয়ে থাকে। কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়তম অভিন্ন-বস্তুর গুণানুবাদ কীর্তন যাঁরা শুনতে চায় না, তাঁরাই মৎসর ; তাদের প্রতিই ক্রোধ প্রদর্শিত হওয়া আবশ্যক, উহাই ভক্তি। যে-সকল ভক্তি-বিনোদ অনুগাভিমানীর ধাম-পরিক্রমাদি কার্যে পদদেশ জড়তা লাভ করেছে, তাদের প্রতি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিশাপ আছে। তারা ঐরূপ আচরণ করে নরকে চলে যাক, আমাদের গুরুপাদপদ্ম এই কথা তারস্বরে বলেছেন।

আমরা গতবর্ষে হিমালয়ের শৃঙ্গে আবার কিছুদিন পূর্বে সুদূর দক্ষিণ প্রান্তে কুমারিকায় ভ্রমণ করতে গিয়েছিলাম। কুমারিকায় দুর্গাদেবীর

বিগ্রহ মহাপ্রভুর মূর্তির ন্যায়। গৌড়ীয়মঠের গৌরমূর্তিসদৃশ—মূর্তি সেখানে গিয়ে দেখলাম। কেহ কেহ বলেন,—শিবের সঙ্গে বিবাহ হবে বলে কুমারীরূপে দুর্গাদেবী সেখানে বাস করেছেন। বৈষ্ণবগণ বলেন,—রত্নাকরদুহিতা লক্ষ্মীদেবী সেখানে সেই মূর্তিতে বাস করেছেন। 'আসমুদ্রাৎ বৈ পূর্বাৎ আসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ' গৌরসুন্দর স্বীয়দর্শন-দানলীলা প্রকট করেছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা সে সময় জন্মলাভ করতে না পারায় সেই একমাত্র দর্শনীয় বস্তু দর্শন করতে পারি নি। কিন্তু—

অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥

বাধাতেই প্রচারের ঔজ্জ্বল্য

আমরা সম্বৎসরে একদিন গৌরপ্রিয় কার্যানুষ্ঠাতৃগণের যে গুণ কীর্তন করি, তাতেই সম্বৎসরকাল গৌরবিরোধিগণকে মৎসরানল প্রপীড়িত করে। ইহাতে আমরাও প্রতিকূলভাবে লাভবন্ত হই। আমাদের দম্ভ উপস্থিত হবার যে অবকাশ থাকে, তা নষ্ট করে দেয়—বিরোধিগণের ঐরূপ ব্যতিরেক যত্নের দ্বারা। আশা করি, আগামী বর্ষে আমরা সত্যকথা প্রচারে আরও শতগুণ বাধা প্রাপ্ত হব, আমরাও তাতে সহস্রগুণ বল লাভ করে বাধা অতিক্রম করব এবং কোটিগুণ সেবোৎসাহ লাভ করব আর বাধাপ্রদানকারিগণেরও মঙ্গল বাঞ্ছা করব।

"ভক্তির্বিজয়তে"

ভক্তির জয় হউক, অভক্তির ক্ষয় হউক,—আত্মা এই কথা সর্বক্ষণ চীৎকার করে বলুক। শতকরা ৯৯ বা ততোধিক লোক দুষ্কর্ম ও সুকর্মে নিযুক্ত রয়েছে। এই পাপ-পুণ্য কর্মদ্বয় নৈষ্কর্ম্য লাভ করুক, কর্মকাণ্ডের পিণ্ড হয়ে যাক, গদাধরের পাদপদ্মে কর্মাসুর চাপা পড়ুক, কর্মনাশা নদী

পার হয়ে বারাণসীতে গিয়ে জ্ঞানকাণ্ডে জীবের বৃত্তি প্রমত্ত না হউক, বৃন্দাবনে শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবায় সফলতা লাভ করুক।

এখন রাত্রি হয়ে যাচ্ছে। আপনাদের চিন্তাস্রোতে বাধা দিয়ে মর্যাদা লঙ্ঘন করলাম, আপনারা তা মার্জনা করবেন। এত কম সময়ে ভগবৎসেবকগণের গুণানুবাদ হয় না। একটী মাত্র মুখ কেন, আমার অনন্তমুখ হউক, আমি অনন্তমুখে অনন্তকাল পরমায়ু লাভ করে কার্ষ্ণগণের অনন্তগুণ গান করি। যে কালে ভাগবত-সেবায় পূর্ণমাত্রায় অভিষিক্ত হতে পারব, সে-কালে এই চোখ, কান, নাকের দ্বারা কৃষ্ণেতর বাহ্য বিষয়ের বিচার বন্ধ হয়ে যাবে—এর ছিদ্র, তার ছিদ্র দর্শন; এর নিন্দা, তার প্রশংসা করতে ধাবিত হব না—

পরস্বভাবকর্মাণি ন প্রশংসেন্নগর্হয়েৎ।

এই অবস্থা লাভ হলে প্রকৃত গৌরদাসগণের সেবা, প্রকৃত গৌর-সেবা, প্রকৃত রাধাগোবিন্দের সেবা করতে পারব। যে-সকল ভাষা ও চিত্তবৃত্তির দ্বারা ভগবদ্ভক্তের গুণ বর্ণনা করার শক্তি লাভ হয়, সেই সকল ভাষা ও চিত্তবৃত্তি সকলের লাভ হউক।

অদ্বৈতসরণী

অবসরপ্রাপ্ত সব্‌জজ শ্রীযুক্ত অদ্বৈতপ্রসাদ দে এম্-এ, বি-এল মহাশয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থলী হতে শ্রীচৈতন্যমঠ পর্যন্ত একটী সরণী করে দিবেন স্বীকার করেছেন অর্থাৎ অদ্বয়জ্ঞানের সরণী প্রকাশিত হবে। তাতে লোক চৈতন্যশিক্ষাস্থলীতে স্বচ্ছন্দে যেতে পারবেন। "বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী"। এই **যোগপীঠ—মথুরা, শ্রীবাস-অঙ্গন—রাসস্থলী, শ্রীচৈতন্যমঠ—গোবর্ধন ও ব্রজপত্তন—শ্রীরাধাকুণ্ড।** বাহিরের দৃষ্টি নিরস্ত করে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করলে, সেই

সরণী অদ্বয়জ্ঞানের সরণী বা একায়ন অর্থাৎ শ্রীরাধাকুণ্ডে যাবার সরণী বলে উপলব্ধি হবে।

সভার অনুষ্ঠিতব্য কার্যত্রয়

বর্তমান সাধারণের জন্য শ্রীধামপ্রচারিণী সভার তিনটী কার্যের আবশ্যক হয়ে পড়েছে। (১) শ্রীধামে রাস্তা নির্মাণ, (২) ভজনবপু সুস্থ রাখবার জন্য চিকিৎসালয় স্থাপন, (৩) ভজনোদ্দেশের সাহায্যকল্পে শিক্ষা মন্দির উদ্বোধন। ঈশ্বরবিমুখ লোকও এ সকল কথার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারেন। সম্প্রতি শ্রীধামে 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্' বলে একটী প্রাথমিক শিক্ষার আগার প্রস্তুত হওয়ার প্রয়োজন। ধাম-সেবকগণের জন্য এসকল সেবা করলে অনর্থ হ্রাস হবে, ধাম-সেবা করলে সিদ্ধি লাভ হবে।

—*—

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্ প্রতিষ্ঠা-বাসরে

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

[স্থান—শ্রীধাম-মায়াপুর, ইন্দ্রনারায়ণ ধর্মশালা; কাল—২০শে চৈত্র, ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ, ৩রা এপ্রিল ১৯৩১ খৃষ্টাব্দ।]

আমরা যে কার্যের জন্য অদ্য এখানে সমবেত হয়েছি, সে কার্যটি হচ্ছে—একটি প্রারম্ভিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান উন্মোচন। শিক্ষা—দুই প্রকার—এক প্রকার শিক্ষাদ্বারা জগতের কার্য সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হবার সুযোগ উপস্থিত হয়; অপর পক্ষে প্রকৃত শিক্ষা বা পরাশিক্ষা—যা কেবলমাত্র জগতের কার্যে আবদ্ধ নয়, তদ্দ্বারা ভগবদ্বস্তুকে জানা যায়। মুণ্ডকোপনিষদ বলেন,— বিদ্যা দুই প্রকার; এক প্রকার—ঋক্, সাম, যজুঃ, অথর্ব, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ ইত্যাদি। যে-সকল বিদ্যার দ্বারা বহিঃ-প্রজ্ঞাচালিত হয়ে কার্য করবার সুষ্ঠুতা জন্মে, আধ্যক্ষিক সম্প্রদায় ইহাকেই "বিদ্যা" নামে অভিহিত করে থাকেন। কিন্তু শ্রুতির বাণীতে দেখতে পাওয়া যায়,—"অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে"।

অপরা বিদ্যা কিছু সময়ের জন্য কাজে লাগে; কিন্তু তাতে স্থায়িভাবে কার্যের সম্ভাবনা নেই। মরণের পরে দূরে থাকুক, এই জীবিতকালেই ইন্দ্রিয়ের অভিঘাত অর্থাৎ অকর্মণ্যতা হলে পূর্বার্জিত অপরা বিদ্যার নিপুণতা অনেক সময়ই নিরর্থক হয়ে পড়ে। এজন্য 'অপরা' ও 'পরা'র সহিত 'নশ্বর' ও 'নিত্য'—এই দুটি শব্দ ব্যবহৃত হয়। আপাত-কার্যসিদ্ধির জন্য শব্দশাস্ত্রে অধিকার লাভ আবশ্যক। ঐ সকল শব্দসমষ্টি দ্বারা পরস্পর ভাবের বিনিময় ও অভিব্যক্তি হয়—সভ্যতা ও সামাজিকতায়

প্রবেশ লাভ ঘটে। এইটুকুই মাত্র যাঁদের প্রার্থনীয়, তাঁরা অপরা বিদ্যার লাভকেই তাঁদের সাধ্য মনে করেন। কিন্তু মানুষের খুব দূরদর্শিতা আবশ্যক। বহুদিন পরে যে অমঙ্গল উপস্থিত হবে—ভবিষ্যতে যে-সকল অসুবিধা উপস্থিত হতে পারে, তজ্জন্য দৃষ্টিসম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। যাঁরা সেরূপ সুদূরদর্শী নন, সেরূপ অভিজ্ঞতাবাদীদের মতে কেবল ঋক্, সাম, যজুঃ প্রভৃতির প্রয়োগে সাধারণ বিদ্যা আবশ্যক। কিন্তু উহাই নিত্যোদ্দেশে ভিন্নফল বা জাড্যপরিহৃত চিন্ময় রাজ্যের উপযোগী।

সভ্য সমাজ সভ্যতার ক্রমিক উন্নতিক্রমে যে সকল তত্ত্ব-বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, তাঁদের সেই সকল কথা শ্রবণ করতে পারলে অর্থাৎ সভ্যতার ইতিহাস—সভ্যতার ঘাত-প্রতিঘাত—সভ্যতার সংঘর্ষে নানাপ্রকার সমস্যার সাময়িক সমাধান প্রভৃতি বিষয়ে যে-সকল ব্যক্তি পারদর্শিতা লাভ করেছেন, তাঁদের মুখে সে সকল কথা শ্রবণ করে আমরা অল্লায়াসে সুদূর অতীতকালের সভ্যতা, অভিজ্ঞতা, বিদ্যাবত্তা, প্রভৃতিকে আমাদের বর্তমান অভিজ্ঞতার দ্বারে অতিথিরূপে বরণ করতে পারি। যিনি ঐ সকল অভিজ্ঞতার কথা বলেন, তিনি শিক্ষক বা কীর্তনকারী, আর যিনি অভিজ্ঞান লাভ করেন, তিনি শিক্ষাকারী বা শ্রবণকারী। এইরূপ অভিজ্ঞতার কীর্তন-শ্রবণ-প্রণালীর মধ্য দিয়ে জাগতিক শিক্ষাস্রোত দিন দিন উন্নতির পথে প্রধাবিত হচ্ছে, আমরা মনে করি। ইহাতে উদাসীন হলে সমাজের শুভানুধ্যায়িগণ আমাদিগকে অলস ও জগতের অমঙ্গলকামী বলে মনে করেন; কিন্তু আমাদের এরূপ শিক্ষাধারা, এরূপ অভিজ্ঞানের কীর্তন-শ্রবণ-প্রণালী এবং অভিজ্ঞতা-বিদ্যাতুঙ্গে অধিরোহণই কি চরম কথা? অনিত্য শিক্ষা ও নিত্য শিক্ষা-বিবেক কি সুদূরদর্শী মানব-বিচারের বিষয় হবে না? কেবল অল্পকালের অভিজ্ঞানে সাময়িক শিক্ষায় শিক্ষিত হব—তদ্দ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধিলাভ করব,

এরূপ বিচারে আবদ্ধ থাকাই কি মানবের দূরদর্শিতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক? মনুষ্যজাতি যার জন্য খুব ব্যস্ত, সেই বিদ্যা, আমাদের কোন একটি ইন্দ্রিয় পক্ষাঘাতগ্রস্ত হলেই নির্বাপিত হয়ে পড়ে। এজন্য উপনিষৎ বলেছেন,—"অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে"। কালের গতি অন্য প্রকার। বর্তমানকালের শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে লক্ষিত হয় যে, পরা বিদ্যার প্রতি ঔদাসীন্যে পারদর্শিতা-লাভই যেন বিদ্যার সার্থকতা! এরূপ বিচার আধ্যক্ষিকতা মাত্র। বিষয় গ্রহণে অসম্পূর্ণতা হতেই এরূপ আধ্যক্ষিকতা-অমরা-পুরীর সোপান নির্মিত হয়েছে।

১৩১১ সালে যখন আমি এখানে প্রথম এসে বাস করতে আরম্ভ করি, তখন স্থানীয় লোকের শিক্ষার জন্য যত্ন করেছিলাম; পরা শিক্ষার কথা দূরে থাকুক, প্রাথমিকী শিক্ষা—আধ্যাক্ষকী শিক্ষার বিষয়েও এ প্রদেশের লোকের আগ্রহ এত কম দেখতে পেয়েছিলাম যে, আমাকে সেরূপ যত্ন হতে ক্ষান্ত হতে হয়েছিল। পরা বিদ্যার আলোচনার জন্য ৪।৫ বৎসর পূর্বে যত্ন করেছিলাম—প্রাচীন পারমার্থিক গ্রন্থ এবং পারমার্থিক শাস্ত্র, দর্শন ও বিজ্ঞান প্রভৃতির নিরপেক্ষ তুলনামূলক আলোচনার জন্য একটি প্রকৃত প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হউক, এজন্য যত্ন করেছিলাম; কিন্তু সাধারণের সংস্কৃত ব্যাকরণের কয়েকটী সূত্রকণ্ঠস্থ-করণ কিংবা কয়েকখানা প্রাকৃত কাব্যগ্রন্থে অধিকার-লাভই অধিকতর আগ্রহের বস্তু অথবা ন্যায়তীর্থ প্রভৃতি উপাধি-লাভই তাদের আশার শেষ সীমা বা পরমপুরুষার্থরূপে বিচার দেখতে পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু আমি যে উদ্দেশ্য ও অভিলাষের বশবর্তী হয়ে এরূপ প্রযত্ন করেছিলাম, আমি যা ইচ্ছা করেছিলাম, সে ফল লাভ হয় নি। অধিক কি অনেকেই সেই উদ্দেশ্যের তাৎপর্যটিও গ্রহণ করবার মত যোগ্যতা লাভ করেন নি। দেশের অবস্থা এরূপ!

মার্কিণ দেশে, য়ুরোপের নানাস্থানে এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে বহু শিক্ষা-মন্দির রচিত হয়েছে ও হচ্ছে; কিন্তু এসকল শিক্ষা মন্দিরের ভাষা-বিজ্ঞানে উন্নত হয়ে কি তাৎপর্য লাভ করা যায়, তাতে আমরা অনেকেই উদাসীন। কিছু কালের জন্য দরকার পড়েছে যে শিক্ষার, সাময়িক কাজ মাত্র চলে যেতে পারে যে শিক্ষায়, এরূপ শিক্ষার আলোচনায়ই আমরা মস্তক আলোড়ন করে থাকি। সুদূর কার্যের প্রয়োজনসাধিকা শিক্ষার আলোচনা না করলেও চলবে—এরূপ একটা সংক্রামক আলস্য আমাদের সকলকে গ্রাস করেছে। কিন্তু ইহা দেশ-হিতৈষিতা ও পরদুঃখদুঃখিতার অভাবজ্ঞাপক।

কিছুদিন পূর্বে আমরা ভ্রমণ করতে করতে মেদিনীপুর সহরে গিয়েছিলাম, সেখানকার জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন তখন আমাদের কথায় অপরিচিত জনৈক শ্বেতাঙ্গ পুরুষ। সেখানকার স্কুল গৃহে হরি-কথা আলোচনা হলে সাধারণের হরিকথা শুনবার অধিক সুযোগ হবে বিচার করে আমরা স্থানীয় স্কুলের কর্তৃপক্ষগণের নিকট হতে স্কুলগৃহে স্থান ভিক্ষা করেছিলাম; কিন্তু ডিরেক্টর অব পাবলিক ইন্‌ষ্ট্রাক্‌সন মহোদয়ের অভিমতানুসারে ধর্মবিষয়সমূহে মতভেদ থাকায় তন্মূলে বিরোধ উৎপত্তি লাভ করবে বলে বালকদিগের যাতে কোনপ্রকার ধর্মবিষয়িণী শিক্ষা ও ধর্মনীতির সহিত সংযোগ না থাকে, তজ্জন্য স্কুলে ধর্মের আলোচনা সম্পূর্ণভাবে নিষেধ ছিল। কাজেই আমরা আর সেখানে পরধর্মের কথা বলবারও স্থান প্রাপ্ত হই নি। অবশ্য যাঁরা অভিজ্ঞতাবাদের ভূমিকায় আরোহণ করে ঐরূপ বিচার করেন, তাঁদের সেরূপ বিচারের অধিকার থাকতে পারে। 'ধর্মে মতভেদ আছে বলে কোন ধর্মই আলোচিত হবে না, এরূপ বিচার-স্রোতে তাঁরা গা ভাসিয়ে দিতে পারেন! তবে এখানে সুদূরদর্শিগণ বলবেন—মানুষ

মরীচিকা দেখে ঠকেছেন বলে কোথাও বা কখনও আর জলের অন্বেষণ করবেন না'—জোনাকী পোকার আলোতে আগুন পাওয়া যায় না বলে 'যেখানে যত আলোক আছে, কোথাও আগুন নেই' বলে স্থিরসিদ্ধান্ত করা অত্যন্ত স্থূল ও অতিসাহসিক বিচার।

আমাদের পঠদ্দশায় আমরা স্যর ষ্টুয়ার্ট ব্ল্যাকির সেলফ্ কাল্চার (Self culture) নামক একখানা বই পড়েছিলাম। মিঃ এন্ ঘোষ—যিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন, তিনি উক্ত ব্ল্যাকি সাহেবের ছাত্র ছিলেন। আমাদের সময় ঐ পুস্তকখানা এফ্-এ ক্লাসের পাঠ্য ছিল। তাতে পড়েছিলাম, "ঈশ্বরবিহীন যে বিদ্যা, তা অবিদ্যা, তার কোন মূল্য নেই। সদ্ব্যবহার, জনহিতকর কার্য প্রভৃতি করেও যদি রাজার প্রতি সৌজন্য না থাকে, তা হলে যেরূপ সব বিফল হয়, সেরূপ ভগবান্‌কে বাদ দিয়ে যে জনহিতকর বা পরোপকারের ছলনা, তারও কোন মূল্য নেই।" সে সময় আমাদের এ-সকল কথা পড়ে হৃদয়ে বড় আনন্দ হয়েছিল। পাশ্চাত্য দেশে জন্মগ্রহণ করেও এরূপ বিচারের কথা হৃদয়ে স্ফূর্তিলাভ করেছে দেখে আমরা আনন্দ লাভ করেছিলাম। Cultural Education (কৃষ্টিগত শিক্ষা) থেকে যদি ঈশ্বরের সেবাটী বাদ দেওয়া যায়, তা হলে হিংসা বা মৎসরতা এসে উপস্থিত হয়। যেহেতু লৌকিক ধর্মের আলোচনায় মতভেদ আছে, সুতরাং আত্মধর্মকথার আলোচনাকে একেবারে নির্বাসিত করতে হবে, এরূপ বিচারযুক্ত শিক্ষা পোষণ করা গোড়া কেটে আগায় জল দেওয়ার বিচার। তাতে মৎসরতা খুব বৃদ্ধি পেয়ে শেষে কেবল অসুবিধা হবে।

পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষা ও সভ্যতার পূর্ণ যৌবনকালে ১৯১৪ হতে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত যে বিষম মহাসমর পাশ্চাত্য দেশের সভ্যতাকে

আক্রমণ করেছিল, তাতে কত শিক্ষিত ব্যক্তির যূপকাষ্ঠে বলিদান হল! সভ্যতার অগ্রসর হওয়ার নামে সভ্যতা কত পিছিয়ে গেল! ভগবদ্-বিষয়িণী শিক্ষাকে—আত্মধর্মের শিক্ষাকে নির্বাসিত করে লৌকিকী শিক্ষা ও সভ্যতার চরম ফল এইরূপই হয়ে দাঁড়ায়! নৈতিক ও পারমার্থিক-শিক্ষাকে বাদ দিয়ে যে বিচারস্রোত উপস্থিত হয়, তা হতে রক্ষা পাওয়া দরকার। দাবা খেলে অদৃষ্ট-ফলে যে-সকল কথার মীমাংসা লাভ হয়, তজ্জন্য লোক জীবন-যৌবন উৎসর্গ করছে! তদানীন্তন পোপ যত্ন করেছিলেন—এরূপ বিবাদ-বিসম্বাদের হাত হতে যাতে পাশ্চাত্য দেশ রক্ষা পায়—মানুষগুলোকে মেরে ফেলে সভ্যতার উন্নতির নামে সভ্যতাকে পিছিয়ে দেওয়া কর্তব্য নয়—একথা মানুষকে বুঝাবার যত্ন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর যত্ন সত্ত্বেও এ সকল কথা শুনতে শুনতেও তাদের ৩।৪ বছর কেটে গেল যখন বহু লোকের ক্ষয় হল, তখন তাদের উত্তেজনা-স্রোতে একটুকু ভাঁটা দেখা গেল বটে, কিন্তু আবার অন্যভাবে অন্য আকারে সেগুলি বৃদ্ধি পেতে থাকল।

নৈতিক ও পারমার্থিক শিক্ষাই ভারতের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য। ভারত ধর্মশিক্ষাবর্জিত হয়ে কোন দিনই কোন কথা গ্রহণ করেন নি। যদিও চার্বাকাদি সম্প্রদায় সৃষ্ট হয়েছিল, তথাপি জনসাধারণ তা গ্রহণ করেন নি। কিন্তু বর্তমানে জনসাধারণেই পারমার্থিকতার অভাব লক্ষিত হচ্ছে। বর্তমানে আধ্যক্ষিকতার চরম সীমায় উঠে—তর্ককে অস্ত্র করে বিচারের যেরূপ অপব্যবহার করা হচ্ছে, পূর্বে এতদূর অপব্যবহার লক্ষিত হয় নি। নীতিশাস্ত্র-লঙ্ঘনকে একটুকু সামান্য বুদ্ধিমান ও বিচারপরায়ণ ব্যক্তিও কর্তব্য বলে মনে করেন না। চার্বাকনীতি, এপিকিউরাসের নীতি, ইউটিলিটেরিয়্যানদের নীতি ব্যক্তিবিশেষের প্রীতি উৎপাদন করতে পারে, কিন্তু বিচারপরায়ণ

মনুষ্য-সাধারণের শিক্ষার সহিত নীতির অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ স্বীকার্য।

ভারতীয় নীতির মধ্যে 'অহিংসা' নাম্নী নীতিটি চিরকালই প্রচলিত রয়েছে। বৈদিক নীতি হতে পৃথক হয়েও বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায় অহিংসানীতির আদর করেছেন। বেদ-বিরোধী হয়েও তাঁরা হিংসা-নীতির অনুমোদন করেন নি—যা বর্তমানে খুব আদৃত হচ্ছে! মানুষ পশুগুলিকে খেয়ে-ফেলছে! মানুষ খাওয়া বন্ধ হয়েছে, কিন্তু মানুষের মত জিনিষগুলিকে খাওয়া বন্ধ হয় নি। বানর ধরে ধরে খাচ্ছে—পশু, পক্ষী, তির্যক জাতিকে খেয়ে ফেলছে। এরূপ সঙ্কীর্ণ জাতীয়তা আবার বর্তমান যুগে মহা উদারতা ও দেশপ্রেম-নামে প্রচারিত হচ্ছে!

ঋষিনীতি, ক্ষাত্রনীতি, বৈশ্যনীতি, শূদ্রনীতি, সাঙ্কর্যপ্রভাবজাত নীতিতে ভেদ হচ্ছে। কেউ বলছেন,—ঋষিনীতি প্রবর্তিত হোক, কেউ বলছেন,—নীতিশাস্ত্রে যখন বহু মত-ভেদ লক্ষ্য করা যায়, তখন তা শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হলে শিক্ষা বিপদগ্রস্ত হবে। শিক্ষা ত বিপদগ্রস্ত হয়েছেই, নীতিকে কল্যাণকরী মনে না করায়। পাশ্চাত্য শিক্ষার মধ্যেও ত বি, ডি; ডি, ডি প্রভৃতি পাশ্চাত্য ধর্মশাস্ত্র-পরীক্ষার প্রণালী গৃহীত হয়েছে, তাঁরা থিওলজিকে একেবারে বাদ দেন নি। 'পলিটিক্যাল ইকনমি' বলে যে একটা জিনিষ আছে, তা তথাকথিত ইউটিলিটেরিয়্যানদের বিচারে সাময়িক মঙ্গল বিধান করতে পারে; কিন্তু তদ্দ্বারা সমাজের স্থায়ী মঙ্গল হতে পারে না। বর্তমানে মিশনারী স্কুল ব্যতীত যেখানে যত শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, সকলেই ন্যূনাধিক Material basis এর জড়ের (ভূমিকায়) উপর প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। তবে মিসনারী স্কুল প্রভৃতিও Material basis হতে কতটা পৃথক হতে পেরেছে, তাও বিচার্য। বর্তমানে Legislative. Assemblyতেও

religious questionকে বাদ দেওয়া হচ্ছে! Mahomedan, Non-Mahomedan বিচারে Mahomedan যদি ধার্মিক হন, Non-Mahomedan অধার্মিক হয়ে যাচ্ছেন। Materialistic বিচার-স্রোতে ভরপূর মস্তিষ্কসমূহের ভোটে Theistic educationকে (ভগবদ্ভক্তিমূলা শিক্ষাকে) চিরনির্বাসিত করবার ব্যবস্থা হচ্ছে। যাঁরা বাস্তবিক ধার্মিক, তাঁরা এ সকল কথার মধ্যে প্রবিষ্ট হন না; কারণ, যাঁরা অপস্বার্থের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েছেন, এরূপ জনমণ্ডলীর মতও কুশিক্ষারই পূর্বফল।

মুণ্ডকোপনিষদে যে অপরা ও পরা বিদ্যার পার্থক্য আলোচিত হয়েছে, সেটা সবটুকু ঠাকুর-দাদার আমলের গল্প বা 'তাতস্য কূপঃ'-ন্যায়ে সংশ্লিষ্ট নহে। বর্তমান যে nationality বলে একটা কথা প্রচলিত হয়েছে, তা ন্যূনাধিক ঐ 'তাতস্য কূপঃ'-ন্যায়ে প্রতিষ্ঠিত। বৃদ্ধ প্রপিতামহের আমলের কূপে বিশুদ্ধ নির্মল জল ছিল বলে যদি কয়েকপুরুষ পরেও কূপে সেইরূপ জলই আছে, মনে করে নিয়ে সেই কূপের জল ব্যবহার করতে আরম্ভ করা হয়, তা হলে কতকগুলি ব্যাঙ্‌ ও পাঁকসংশ্লিষ্ট অব্যবহার্য বস্তুই গ্রহণ করা হবে। এ দ্বারা "যেনাস্য পিতরো যাতা যেন যাতাঃ পিতামহাঃ" প্রভৃতি উক্তিকে আদর করার নামে স্বীয় বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেওয়া হবে না। আমার বাপ-পিতামহ যদি মূর্খতাকে বহুমানন করে থাকেন, সেজন্য আমি মূর্খতাকেই ভাল বলব—আমার বাপ-পিতামহ গাঁজা খেতে খুব ওস্তাদ ছিলেন বলে যেহেতু আমি সে বংশে জন্মগ্রহণ করেছি, তখন আমাকেও গাঁজা খাওয়া শিখতেই হবে, এরূপ সেকেলে অসদ্ বিচারের আদর কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই করেন না। ইহা আধুনিক ন্যাশানেলিটির অঙ্গ হতে পারে।

কিছুদিন পূর্বে ট্রেণে ভ্রমণ করবার সময় শ্রীযুত হরেন্দ্রবাবু ও শ্রীযুত প্রফুল্ল বাবুর সহিত ট্রেণে সাক্ষাৎ হয়। ইঁহারা উভয়েই শিক্ষাবিভাগের সম্মানিত ব্যক্তি। শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল বাবুর নিকট শুনলাম,—পাশ্চাত্য দেশের শিক্ষকগণ যেরূপ উদারতার সহিত শিক্ষা দেন, আমাদের দেশের পণ্ডিতগণের সেরূপ উদারতা দৃষ্ট হয় না। তিনি সেই প্রসঙ্গে বল্লেন—'আমাদের দেশের ওঝারা পর্যন্ত কাউকে কোন সাপের মন্ত্র, বাঘের মন্ত্র শিখাবে না—কামার তার নিজের ছেলে বা বংশ ছাড়া কাউকে কারু-কার্যের কৌশল শিখাবে না!' আমি তার উত্তরে আমাদের বাল্য-কালে পড়া একটী উদাহরণ উল্লেখ করে বল্লাম,—পিটার রুশিয়া হতে জার্মাণীতে Ship building (জাহাজ নির্মাণ) শিখতে গিয়ে-ছিলেন, কিন্তু পুর্বে প্রুশিয়ার লোকেরা অপর দেশের লোককে তা শিক্ষা দিত না। তাঁরা এই প্রসঙ্গে 'Trade Secret' (বাণিজ্যে গোপনীয়তা) বলে একটা কথা বললেন। আমি বল্লাম,—আপনারা পাশ্চাত্য দেশের পণ্ডিতগণের নিকট হতে শিক্ষা লাভ করেছেন, তাতেই উদারতা লক্ষ্য করেছেন। এ দেশেরও যাঁরা প্রকৃত পণ্ডিত, তাঁদেরও উদারতা কম নয়। যে ব্যক্তিবিশেষের পাণ্ডিত্য ও শিক্ষা কম, তার মধ্যেই ঐ প্রকার অনুদারতা লক্ষিত হয়। তাঁরা আমার কথার অধিক প্রতিবাদ না করে উদার লোকই প্রকৃত শিক্ষা দিতে পারেন, স্বীকার করলেন। যদি সত্য সত্য কেউ শিক্ষালাভ করতে পারেন তা হলে তাঁর স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হয় যে, জগতে বহু লোক ঐরূপভাবে শিক্ষিত হোক। প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তির এরূপ একটা ভ্রাতৃ-প্রীতি স্বতঃই উপস্থিত হয়। শিক্ষকসম্প্রদায়ের যদি ঐরূপ সংকীর্ণতা থাকে, তা হলে তাঁদের মধ্যে আরও নীতিবিরুদ্ধতা ও সঙ্কীর্ণতা পুষ্ট হতে থাকে। কিন্তু তাই বলে বলছি না যে, নীতি ও ধর্ম নিয়ে পরস্পর ঝগড়া আরম্ভ হোক।

অধিকাংশ স্থলেই দেখতে পাওয়া যায়—যাঁরা খুব বড় বড় University degree-holder—খুব ভাল লেখা পড়া শিখেছেন, কিন্তু শিক্ষিত বললে যে সকল বিষয় জানা উচিত, তাতে তাঁরা সম্পূর্ণ উদাসীন। যেমন তেমন করে নিজের অপস্বার্থ সাধন করে নেব,—ইহাই তাঁদের মূল উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। ধর্মপ্রবৃত্তির প্রতি বিদ্বেষভাব দূর হয়ে যাতে আত্মধর্মের প্রতি অনুরাগ গোড়া থেকে বালকদের কমনীয় বৃত্তিতে প্রস্ফুটিত হতে থাকে, তজ্জন্য সামাজিকগণের বিশেষ দায়িত্ববোধ থাকা উচিত। নীতিকে অবহেলা করার জন্য যে কুশিক্ষা—'যেমন করে হোক, দৌরাত্ম্য করে খাব, দাব, থাকব'—এই যে কুশিক্ষা, তা হতে বর্তমান সমাজকে রক্ষা করবার জন্য একটী বিদ্যালয় উদ্বোধন করবার আবশ্যক হয়েছে। যাতে নীতি ও ধর্ম বিষয়ের আলোচনা করবার যোগ্যতা আসে, যাতে Comparative study of religion প্রকৃত নিরপেক্ষভাবে সাধিত হয়, এজন্য শিশুকাল হতেই প্রস্তুত হওয়ার উদ্দেশ্যে সাধারণ শিক্ষার সহিত পারমার্থিক-শিক্ষার একটী বিদ্যালয়ের আবশ্যকতা আছে।

আপাত-মঙ্গল-দ্রষ্টা মনে করে,—"এখন যেমন তেমন করে যথেচ্ছাচারিতা করা যাক, মরণের পরে যখন সবই নিবে যাবে, তখন আপাত সুখটুকু হতে বঞ্চিত কেন হই ?" "পরজগতের কথা বিচার করা মূর্খতা ও সময়ের অপব্যবহার মাত্র"—এরূপ বিচার পাশ্চাত্য-শিক্ষার কুফল থেকে ভারতেও আধুনিক কালে আমদানি হয়েছে। আবার কেউ কেউ 'আইন বাঁচিয়ে কার্য করবার' কৌশল-শিক্ষার ন্যায়াবলম্বনে যে-সকল কার্য দৈহিক সুখের বাধক হতে পারে, সেরূপ কার্য হতে বিরতিকেই নীতি বলে বিচার করেন। কিন্তু 'আইন বাঁচিয়ে কার্য করা' ব্যাপারটায় সরলতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এরূপ সরলতার অভাব বিদেশীয় বা

ভারতীয় উন্নত জীবনে অভিলাষ করা উচিত নয়। পরমার্থ নীতিতে এরূপ সরলতার অভাব বিন্দুমাত্রও নেই। এই ভারতে নৈতিক ও পারমার্থিকতায় রুচি উৎপাদন করবার চেষ্টারও দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়েছে। আকুমারিকা-হিমাচল, অন্য দিকে আসাম, পূর্ববঙ্গ হতে দ্বারকা, বোম্বাই, গোয়া ভ্রমণ করলাম, সর্বত্রই নৈতিক ও পারমার্থিক রুচির প্রচুর অভাব লক্ষ্য করেছি। লোকে শিক্ষা-দীক্ষা কল-কৌশল অনেকেই আয়ত্ত করছেন, কিন্তু প্রকৃত শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রতি সকলেই উদাসীন। নারদপঞ্চরাত্র বলেছেন,—

"আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥" *

তাৎকালিক-তপস্যা বা শিক্ষা-বিষয়ক সাধন যদি নিত্য-ভগবৎসেবা ব্যতীত অন্য কার্যে নিয়োজিত হয়, তবে কুফল ফলবেই ফলবে,—ইহা জানি না বলেই আমরা হিমালয়ে গিয়ে রেচক, পূরক, কুম্ভক আরম্ভ করি। যখন তপস্যা করা যায়, তখন লোকের নিকটে প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায়। কিন্তু দেখা গিয়েছে, বহু লোকের তপস্যা নষ্ট হয়ে গেছে;— বিশ্বামিত্র ও মেনকার উদাহরণই তার সাক্ষ্য। আমরা দেখেছি, হাজার

---

* যদি (তপস্যা ব্যতিরেকে) হরি আরাধিত হন, তাহা হইলে তপস্যার প্রয়োজন কি? যদি তপস্যাদ্বারা হরি আরাধিত না হন তাহা হইলে সেই তপস্যার প্রয়োজন কি? যদি (তপস্যা ব্যতিরেকে) অন্তরে ও বাহিরে হরি স্ফূর্তি প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তপস্যার প্রয়োজন কি? তপস্যাদ্বারা যদি অন্তরে ও বাহিরে হরি স্ফূর্তি প্রাপ্ত না হন তাহা হইলে সেই তপস্যার প্রয়োজন কি?

হাজার তপস্বী পতিত হয়ে গেছেন। মানুষের এরূপ একটা তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে বিচার উপস্থিত হয়েছে যে, ধার্মিক-নামধারী লোক-মাত্রেই ভণ্ড, অসৎ। কোথায়ও গ্রন্থের ত অভাব নেই, কত কত বই ছাপা হয়েছে ও হচ্ছে, কিন্তু আমাদের মূল কথাটাই চাপা পড়ে গেছে। মূল কথাটী হচ্ছে,—

"আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।"

ভিতরে বাহিরে যদি হরিসেবাময়ী বুদ্ধি না থাকে, তা হলে তপস্যা করে কি হবে? Different schools of thoughts হয়ে উঠেছে। যদি শিক্ষার প্রারম্ভ থেকে একটা নিরপেক্ষ comparative study থাকে, তা হলে জেনে নিতে পারি, কোন জিনিষটায় প্রকৃত মঙ্গল, আর কোন জিনিষটায় অমঙ্গল হবে। এরূপ Comparative study সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে পাশাপাশি হওয়া উচিত, নতুবা খুব বড় বড় University degree-holder এবং সাধারণ শিক্ষার শীর্ষস্থানের অধিকারী, বহু ভাষাবিৎ, কলাবিৎ হয়েও যখন দেখা যাচ্ছে যে, তাঁরা অশিক্ষিত অপেক্ষাও কোটিগুণে অধিক কাম-ক্রোধাদির দাস হয়ে বিপথে পতিত হয়ে যাচ্ছেন, তখন সেইরূপ শিক্ষার ফলে পরোপকার ত দূরের কথা, বর্তমান সমাজের সমূহ অমঙ্গলই অবশ্যম্ভাবী।

কুশিক্ষা, বিকৃত-শিক্ষা ও অশিক্ষার জন্য জগতে ও সমাজে নানা-প্রকার অনর্থ এসে উপস্থিত হয়েছে। দাক্ষিণাত্যে পঞ্চম শ্রেণীর জাতি পেরিয়াকে, রাস্তা দিয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে যেতে হয় যে, 'আমি যাচ্ছি।' এদের চেঁচানো শুনে যদি বহু দূর থেকে উচ্চশ্রেণীর জাতি সাবধান না হন এবং নিম্নশ্রেণীর জাতি এরূপ না চেঁচিয়ে যান, তাহলে তাদিগকে আদালতে বিচারের অধীন হতে হয়। ইহা দেখে ঐরূপ পঞ্চম শ্রেণীর জাতি প্রভৃতি বিচার করে নিয়েছে যে, যখন হিন্দুদের মধ্যে এতদূর

নিরপেক্ষতার অভাব, তখন আমরা 'হিন্দু' বলেই পরিচয় দেব না। তাই তারা অন্যমতে প্রবিষ্ট হয়ে পড়ছে। শ্রীযুক্ত মদনমোহন মালব্য প্রভৃতি আবার অন্য উদ্দেশ্যের বশবর্তী হয়ে মনে করছেন, ইহাদিগকে কিছুটা সুবিধা দেওয়া হোক। কেউ আবার বলছেন, তাদিগকে দাবিয়ে রেখে, আমাদেরই প্রাধান্য রাখবার জন্য জোর অভিযান হোক কিন্তু প্রকৃত শিক্ষার বিস্তার হলে ঐরূপ কৃত্রিম সাময়িক অধিকার প্রদান বা সম্প্রদায়-বিশেষে কৃত্রিম প্রাধান্য কতদিন থাকবে? একারণে সম্প্রতি একটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করা বিষয়ে আমাদের দুর্বল প্রয়াসের প্রয়োজন হচ্ছে। এইরূপ প্রতিষ্ঠান সমৃদ্ধ হলে শুধু বাঙ্গলা বা ভারতবর্ষেই আবদ্ধ থাকবে না, ক্রমে ভারতবর্ষের অতীত সকল দেশের অধিবাসী African, American, European, Asiatic সকল ভ্রাতৃবৃন্দ—পৃথিবীর সকলের প্রতি প্রকৃত মঙ্গল বিস্তার করবার জন্য পরস্পর সহানুভূতি করতে পারবেন। সকল দেশের লোক, সকল দেশের বালক পারমার্থিক বিদ্যালয়ে পরমার্থ নীতি শিক্ষা করে সমাজ ও দেশের প্রকৃত মঙ্গল করতে পারবেন। জগতে আবার প্রকৃত বর্ণাশ্রম-ধর্ম—শাস্ত্রীয় বর্ণাশ্রম-ধর্ম প্রবর্তিত হবে। কল্পিত ও বিকৃত বর্ণাশ্রম-ধর্ম যে শাস্ত্রীয় বর্ণাশ্রম ধর্ম নয়,—ইহা লোকে পারমার্থিক শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই বুঝতে পারবেন।

শ্রীযুক্ত বিড়্‌লা-নামক একজন সম্পত্তিশালী ও প্রতিষ্ঠাশালী বৈশ্য আছেন, তিনি শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য মহাশয়ের নিকট হতে শিক্ষা লাভ করেছেন এবং অর্থাদিদ্বারা শিক্ষাবিস্তারের যথেষ্ট যত্ন করেছেন। স্থানে স্থানে তাঁদের কথারও আদর হচ্ছে, কিন্তু মূল কথা হচ্ছে, আচারবান শিক্ষক না হলে আচারের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করা

যায় না। যাঁরা আচার-প্রচারময়ী পরমার্থশিক্ষা লাভ করছেন, যতদিন পর্যন্ত না জগৎ তাঁদের শিক্ষার সুফল লাভ করছেন, ততদিন পূর্ব কুশিক্ষার সকল কুফল ভোগ করতেই হবে। জগতের সকল সম্প্রদায়—সকল শিক্ষক যে সকল শিক্ষার কথা বলেছেন, তা ন্যূনাধিক পরম শিক্ষা নয়, কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর **'শিক্ষাষ্টকে'** পরম শিক্ষার কথা বলেছেন। এই শিক্ষা সরস্বতীপতি শ্রীগৌরসুন্দর জগৎকে জানিয়েছেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সেই শিক্ষা বিস্তারের জন্য আধুনিক শিক্ষিত যুগে বিশেষ চেষ্টা করেছিলেন এবং সেই পরমশিক্ষা-বিস্তারে তাঁর আত্যন্তিক হার্দ অভিলাষ ছিল। তাঁর এই অভিলাষ যাতে পূর্ণ হয়, জগতে কল্যাণকল্প-তরুর সুশীতল ছায়া ও ফল বিস্তারিত হয়, তজ্জন্য আমরা ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের নামে একটি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়—যাতে পারমার্থিক শিক্ষাকে মুখ্য উদ্দেশ্য করে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে তাঁরই আনুকূল্যকারিণী দাসীসূত্রে সাধারণ-শব্দশাস্ত্র-শিক্ষাও নিয়োজিত হতে পারে, এরূপ উদ্দেশ্যের বশবর্তী হয়ে একটী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান উদ্বোধন করবার সঙ্কল্প করেছি।

* * * *

রাণাঘাট উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বিপিন বাবুর মনে যে সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে,—বৈষ্ণবধর্ম-যাজীর সহিত উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় পরিচালনের সামঞ্জস্য কিরূপে হয়, তদ্বিষয়ে কিছু আলোচনা করা কর্তব্য। আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা হতে জেনেছি,—ঐরূপ দুটো জিনিষ কিছু আলাদা নয়, শ্রীগৌরসুন্দর বলেছেন,—

"অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে"॥ *
(ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব ২-২৫৩)

সাধারণ লোক শ্রীগৌরসুন্দরের বাক্য অনুশীলন করেন না, তাই তাঁদের মধ্যে পরস্পর বিবদমান মতবাদ বিস্তারিত হয়েছে ; তাঁরা ভোগ ও ত্যাগ—এই দুয়ের কবলে কবলিত। কিন্তু ভগবদ্ভক্তি ও তদানুকূল্যময়ী লৌকিকতা বা বৈদিকতা জড় ও চেতনের মত পৃথক বস্তু নয়। আমরা ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে শ্রীগৌরসুন্দরের কথিত শাস্ত্রীয় উপদেশ দেখতে পাই,—

"লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে।
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্যা ভক্তিমিচ্ছতা"॥ *

যাঁর ভগবানে ভক্তি আছে, তিনিই মনুষ্য। যাঁর ভগবানে ভক্তি নেই, তিনি ভোগী, ত্যাগী বা অন্যাভিলাষী। ফল্গুবৈরাগ্য ও যুক্ত-

---

* অনাসক্ত হইয়া নিজ সাধন-ভক্তির অনুকূলমাত্র-বিষয়-স্বীকারকারীর বিষয়-বিরক্তিকে 'যুক্তবৈরাগ্য' বলে। তাহাতে কৃষ্ণসম্বন্ধীয় বিষয়ে আগ্রহ থাকে। অর্থাৎ প্রাকৃত বিষয়ে বিরক্ত অথচ কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় বিষয়ে আগ্রহশীল যে ব্যক্তি অনাসক্তভাবে নিজভক্তির অনুকূলমাত্র বিষয়-গ্রহণ করেন, ভক্তিপ্রতিকূল বিষয় গ্রহণ করেন না, তাঁহার বৈরাগ্যকে 'যুক্তবৈরাগ্য' বলে।

ভগবৎসম্বন্ধীয় বস্তুতে প্রাকৃত বুদ্ধি করতঃ মুমুক্ষুদিগের তাহা পরিত্যাগ করাকে 'ফল্গুবৈরাগ্য' বলে।

* হে মুনে! জগতে যে সকল লৌকিক বা বৈদিক ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয় তন্মধ্যে যে সকল কর্ম হরিসেবার অনুকূল সেইগুলি মাত্র ভক্তিকামী ব্যক্তি অনুষ্ঠান করিবে, অবশিষ্টগুলির অনুষ্ঠান প্রয়োজন বোধ করিলে

বৈরাগ্যের যে বিচার শ্রীগৌরসুন্দর সাকর মল্লিককে * বলেছিলেন, তাতে আমরা ভোগী ও ত্যাগি-সম্প্রদায়ের বিচারের অসম্পূর্ণতা ও একদেশদর্শিতা দেখতে পাই। 'ঈশাবাস্য' জগতের ঈশসেবার উপকরণগুলিকে কাকবিষ্ঠার সহিত তুলনা নির্বিশেষবাদিগণের অসম্পূর্ণ বিচারে লক্ষিত হলেও শ্রীগৌরসুন্দর তা বলেন না। যাঁরা শ্রীরূপের ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর শ্রীচরিতামৃত পাঠ করেছেন, তাঁরা বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী—এই চতুর্বিধ সামগ্রীর অন্যতম বিভাবের অন্তর্ভুক্ত আলম্বন ও উদ্দীপন, আবার আলম্বনের অন্তর্ভুক্ত বিষয় ও আশ্রয়ের কথা শ্রবণ করে থাকেন। 'কাব্য-প্রকাশ' ও 'সাহিত্যদর্পণে'র লেখক, তথা ভরতমুনি যে বিষয়াশ্রয়-বিবেকের কথা আলোচনা করতে পারেন নি, ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীরূপ-গোস্বামীর দ্বারা 'শ্রীরসামৃতসিন্ধু' ও 'উজ্জ্বলে' তা সুষ্ঠুভাবে আলোচনা করেছেন। ভগবান্ ব্যতীত আর দ্বিতীয় বিষয় নেই। যাঁরা ভগবান্ ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তু আছে বিচার করেন, তাঁদের বিচার খণ্ডিতধর্মে সংশ্লিষ্ট। "সদেব সৌম্যেদমগ্রমাসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্" জিনিষটা দশটা পাঁচটা নয়। Absolute Truth is one without a second. যাঁরা মনে করেন—Absolute Truth challengeable, তাঁদের success সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। কিন্তু আমরা Personal Godheadএর উপাসক—আমরা Impersonalityর উপাসক নই। প্রপন্নাশ্রিত আমাদের সাফল্য অনিবার্য। সবিশেষ বিষ্ণুবস্তুর উপাসকগণ বিষয় ব্রজেন্দ্রনন্দনকে ধরে রাখতে পারেন—যাহাতে উহা হরিসেবার অনুকূল হয়, এরূপভাবে অনুষ্ঠান করিতে পারেন।

* সাকর মল্লিক—শ্রীল সনাতন গোস্বামী।

'সত্তোহস্ত্যবরুধ্যাতে' ইহার প্রমাণ। তাঁরাই realise করতে পারেন—তাঁরাই "আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়"। "আচার্যবান্ পুরুষো বেদ" উপনিষমন্ত্র তাঁদেরই গান করেছেন। বিষয়বিগ্রহ শ্রীভগবান্ ও আশ্রয়বিগ্রহ আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম—এই দুয়ের সম্মিলনে অসংখ্য বিপদের মস্তকের উপর দিয়ে চলে যেতে পারব—সাফল্য আমাদের নিশ্চয়ই হস্তামলক হবে। (চতুর্দিক হইতে আনন্দধ্বনি ও করতালি) শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রিত সেবক কখনই বিচলিত হন না। শ্রীমদ্ভগদ্গীতা (৯।৩০-৩১) বলেন,—

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥" *

অভক্ত সম্প্রদায় নিশ্চয়ই কালপ্রভাবে পতিত হবে। ভগবদ্ভক্ত কখনই অধঃপতিত হন না। অভক্ত পতিত হবে—আর যেখানে কপট ভক্তি, সেই ভণ্ড দলও পতিত হবে—Mental speculationists

* যিনি আমাকে অনন্যচিত্ত হইয়া ভজনা করেন, তিনি সুদুরাচার হইলেও তাঁহাকে 'সাধু' বলিয়া মানিবে, যেহেতু তাঁহার ব্যবসায়—সর্বপ্রকারে সুন্দর। হে কৌন্তেয়, আমার প্রতিজ্ঞা এই যে, আমার অনন্যভক্তিপথারূঢ় জীব কখনই নষ্ট হইবে না। প্রথম অবস্থায় 'নিসর্গ' ও 'ঘটনাবশতঃ' তাঁহার অধর্মাচরণাদি থাকিলেও ঐ অধর্মাদি শীঘ্রই পরমৌষধিরূপা হরিভক্তিদ্বারা বিদূরিত হইবে। তিনি জীবের নিত্যধর্মরূপ স্বরূপগত আচারনিষ্ঠ হইয়া পাপপুণ্য-বন্ধন হইতে ভক্তিজনিত পরম শান্তি লাভ করিবেন।

(মনোধর্মিগণ) সব পড়ে যাবে। স্বর্গের সিঁড়িতে অধিকক্ষণ balance (সমতা) রক্ষা করতে পারবে না।

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততো পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥ *
(শ্রীমদ্ভাগবত ১০।২।২৬)

কালঃ কলির্বলিন ইন্দ্রিয়া বৈরিবর্গাঃ
শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টককোটিরুদ্ধঃ।
হা হা ক্ব যামি বিকলঃ কিমহং করোমি
চৈতন্যচন্দ্র যদি নাদ্য কৃপাং করোষি ॥ †
(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত)

যাঁরা শ্রীচৈতন্যপাদপদ্মে আশ্রিত, তাঁদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে,—

দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈর্ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ।
গঙ্গাম্ভসাং ন খলু বুদ্বুদফেনপঙ্কৈর্ব্রহ্মদ্রবত্বমপগচ্ছতি নীরধর্মৈঃ ॥ ‡

---

* হে অরবিন্দাক্ষ, যাহারা 'বিমুক্ত হইয়াছি' বলিয়া অভিমান করে, তাহারা আপনাতে ভক্তিশূন্য হওয়ায় অবিশুদ্ধবুদ্ধি। তাহারা অনেক ক্লেশে মায়াতীত পরমপদ ব্রহ্ম পর্যন্ত আরোহণ করিয়া ভগবদ্ভক্তির অনাদর করতঃ অধঃপতিত হয়।

† কাল কলি ; ইন্দ্রিয়রূপ শত্রুসকল অত্যন্ত বলবান এবং পরমোজ্জ্বল ভক্তিমার্গ কর্মজ্ঞানাদি কোটিকণ্টক-জালে অবরুদ্ধ। অতএব হে চৈতন্য-চন্দ্র, তুমি যদি আজ আমাকে কৃপা না কর, তাহা হইলে হায়! এই অবস্থায় বিহ্বল আমি কি করি, কোথা যাই ?

‡ ভক্তের স্বভাবজনিত দোষসমূহ এবং শারীরদোষসমূহদ্বারা প্রাকৃত দর্শনে ভক্তকে দৃষ্টি করিবে না। যেরূপ বুদ্বুফেনপঙ্ক গঙ্গাজলে মিলিত

Ordinary Common people (সাধারণ-জনগণ) মনে করেন, —empericismএর (আধ্যক্ষিকতার) পুঁজিপাটাই আমাদের সত্যের দিঙ্‌নির্ণয়যন্ত্র। কিন্তু empericism প্রতি মুহূর্তে মানুষকে স্খলিতপদ করে দিচ্ছে—প্রতি মুহূর্তে বদলাচ্ছে। একমাত্র Absolute Truth (বাস্তব সত্য)এর deviation (চ্যুতি) নেই। ভগবদ্ভক্তের সহিত সাধারণ কর্মীর পার্থক্য এই যে, কর্মী অভিজ্ঞতার ভূমিকম্পে সর্বদা ত্রস্ত, ভীত ও সংশয়াত্মা। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত সত্য-ভূমিকার অচলায়তনে—সত্যের একায়নে প্রতিষ্ঠিত। "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—প্রতিষ্ঠা কিছু কর্মীর মত বাহাদুরীর কার্য নয়। নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধির সাধক-স্বরূপ এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠায়, কর্ম কি করে ভক্তির অনুকূল হয়, "ভক্তি-বিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের" প্রতিষ্ঠায় তাহার বীজ নিহিত রয়েছে। "লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে। হরিসেবানুকূলৈব সা কার্যা ভক্তিমিচ্ছতা ॥"—এই শ্রৌতবাণী "ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের" শিক্ষক ও শিক্ষার্থিগণের নিত্য অধ্যাপন ও পাঠের বিষয়। এঁদের বিহিস্তা স্বর্গ, বা প্যারাডাইসের বাদসাহ হবার জন্য কোন আকাঙ্ক্ষা নেই। বিহিস্তা প্রভৃতির প্রতি বিরক্ত হয়ে নির্বিশেষ হয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে ইঁহারা অভ্যর্থনা করেন না। যারা সত্য ব্যতীত অন্য জিনিষের আশ্রিত, তারা ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানদ্বারা বস্তু মেপে নেয়। তাদের মধ্যে personality (সবিশেষত্ব) ও Impersonality (নির্বিশেষত্ব) নিয়ে বৃথা তর্ক উপস্থিত হয়। কিন্তু যাঁরা একায়ন-পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, তাঁরা লৌকিক ও বৈদিক যে কার্য করুন না কেন, কখনও

হইলেও নীরধর্মপ্রভাবে গঙ্গোদক ব্রহ্মধর্ম পরিত্যাগ করেন না, তদ্রূপ প্রাকৃত দৃষ্টিতে ভক্তের প্রাকৃত দোষসমূহ দেখিয়া তাঁহাতে ভক্তির অভাব আছে মনে করিতে হইবে না।

ভগবানের সেবা হতে একচুলও বিচ্যুত হন না। নৈষ্কর্ম্যবাদের সাফল্য নিশ্চয়ই হবে; তদব্যতীত অন্য কোন কথা নেই; অসাফল্য কখনই হতে পারে না। জীবের নিশ্চই মঙ্গল হবে। জীবকে পাপপুণ্যের অতীত করে দেবে। ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের আশ্রিত জনগন মনোধর্ম-জীবী নন; তর্কপন্থীরাই মনোধর্মজীবী, তাই তারা সংশয়াত্মা, তাদের নশ্বরতা অবশ্যম্ভাবী; তাদের সাফল্য নেই। তাদের আপাত সাফল্যের প্রতিবিম্বও তাদের পতনেরই পূর্বাভাস। মনোধর্মজীবী—ভোগী বা নির্বিশেষবাদী ত্যাগী। তারা কাল্পনিক প্রদেশে লম্ফ প্রদান বা অজ্ঞাত নিরাকার প্রভৃতি ভূমিকা রচনা করে। তারা লাফিয়ে গিয়ে কোন যায়গায় পড়বে তার ঠিকানা নেই—"লাগে, তাক না লাগে তুক" বিচার করে অন্ধকারে হাতড়াতে থাকে। আমরা তা নই; আমরা Trancendental positivists (পারমার্থিক আস্তিক্যবাদী)—আমরা সকল লোকের অনুগ্রহ পাব—জোর করে তাঁদের অনুগ্রহ লাভে দাবি করব—ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের-বাস্তব বাণী অযাচক সকলকে হাতে পায়ে ধরে জানিয়ে দেব—সকলেই ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপায় উদ্ভাসিত হবে। 'সত্যকে আশ্রয় করা' মানে—চেতনময়তা লাভ করা। সেই চেতনময়তায় সমগ্র বিশ্ব উদ্বুদ্ধ হোক। জগতে যুক্তবৈরাগ্যের বিচার প্রচারিত হোক। সকল বৃত্তি, সকল ব্যাপার, লৌকিকী বৈদিকী যাবতীয় ক্রিয়া ভগবদ্-ভক্তির কৈঙ্কর্য করুক, তা হলেই বিশ্ব পূর্ণ সুখময় ধাম হবে।

এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এত আছে, আমি যদি দশ দিন দশ রাত্রি একমুহূর্তও বিরত না হয়ে এ সকল কথা আপনাদের কাছে বলে যাই, তা হলেও আমার পিপাসার নিবৃত্তি হবে না। আমি একটা ভোগী—আমি ত্যাগীর পোষাকপরা একটা যথেচ্ছাচারী; আমার মুখে এত বড়

কথা শোভা পায় না। কিন্তু আমার আশা আছে, আমার কাজ পিয়নের মত ; পিয়ন যেরূপ বহু মূল্যবান ইন্‌সিওর্ড দ্রব্য ও বহুমূল্য টাকার মণিঅর্ডার নিজে মালিক না হলেও তা বহন করতে পারে, সেই সকল মুদ্রার অধিকারীদের কাছে পৌঁছে দিতে পারে, আমিও তেমনি শ্রীগুরু-পাদপদ্মের পিয়নসূত্রে আপনাদের উর্বরক্ষেত্রে—পরমোন্নতক্ষেত্রে সমগ্র মনুষ্যজাতির কাছে বাস্তবসত্যের কথা পৌঁছে দেবার বড় আশা পোষণ করি। যাঁর আধার আছে, যিনি অধিকারী, তিনি গ্রহণ করবেন। যাঁদের অন্য বিচার, তাঁরা বলবেন,—আমরা ঐরূপ ধর্মের কথা শুনতে চাই না। তাঁদের ওরূপ বলবার অধিকার আছে। তাঁরা ঐ কথা যত বলবেন, ততই চেতনের কথা বলবার জন্য আমাদের উৎসা অধিকতর বৃদ্ধি পাবে। চেতনধর্মের যে-সকল কথা অবিমিশ্রভাবে এসে উপস্থিত হয়, তাহা যেন কীর্তনমুখে বলবার যোগ্যতা লাভ হয়,—আপনারা এরূপ আশীর্বাদ করুন। আমার ভাষাজ্ঞান নেই—কিন্তু এ সকল কথা বলবার প্রবৃত্তি প্রচুর পরিমাণে আছে। আমার আশা আছে,—আপনাদের কৃতিত্বের কাছে এসকল কথা পৌঁছিয়ে দিতে পারলে নিশ্চয়ই সুফল ফলবে। আমাদের অন্য কোন কৃত্য নেই, কেবল কীর্তনই আমাদের একমাত্র কৃত্য, জড়ের কীর্তন-নয়—চৈতন্য কীর্তন। হরি-কথার দুর্ভিক্ষ আমাদিগকে—মানবসমাজকে যেরূপভাবে গ্রাস করছে, তাতে অন্য সব কাজ ছেড়ে দিয়ে আমাদের কীর্তন-ভাগীরথী জগতে সেচন করা ছাড়া আর অন্য কোন কৃত্য নেই। মায়া প্রবল হলে আমরা বিভিন্ন ইন্দ্রিয়দ্বারা মেপে নেবার চেষ্টা করি। বাল্যকাল হতে এ সকল বস্তুর আলোচনা হলে অদ্বিতীয় বস্তু ভগবানের সেবা ব্যতীত আমাদের দ্বিতীয় বস্তুর সেবাকে অধিকতর আদরণীয় মনে না করবার অনেকটা সুযোগ উপস্থিত হয়। শ্রীচৈতন্যদেব যে বিদ্বদ্‌রূঢ়ির কথা

ছেলেদের কাছে বলেছেন, যেই শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়ি লৌকিক ভাষার মধ্য হতে আকর্ষণ করে স্থকুমারমতি বালকদের নিকট ধারাবাহিকভাবে আচারবন্ত পারমার্থিক শিক্ষকগণের দ্বারা উপস্থিত করার উদ্দেশ্যে "ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্" প্রতিষ্ঠিত হল। যাঁরা মনে করেন, উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের মধ্য দিয়ে কিরূপে পারমার্থিকতার কথা সংরক্ষিত হতে পারে, তাঁদেরও "ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের" শিক্ষাপ্রণালী যথেষ্ট আলোক দান করবে। আমার এ বিষয়ে অনেক কথা বলবার আছে। সময় অধিক হয়ে যাচ্ছে বলে আমি মাত্র দু একটি দিক দিয়ে সামান্য একটুকু কৈফিয়ৎ দিলাম। অসংখ্য বিচারের দ্বারা এই বাস্তব-সত্যের কথা বলা যেতে পারে।

—*—

গৃহপ্রবেশ

[গত ২৭শে চৈত্র (১৩৩৭), ১০ই এপ্রিল (১৯৩১) শুক্রবার প্রাতে শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল ঘোষের নবনির্মিত গৃহে হরিকথামৃত]

পরমহংসকুলের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হতেই গৃহান্ধকূপে পতিত হওয়ার যোগ্যতা বিনষ্ট হয়, আর সেই মুক্তকুলের প্রকৃষ্ট সঙ্গ ফলেই পারমার্থিক গৃহস্থ হবার যোগ্যতা লাভ হয়। যাঁরা অনুক্ষণ অভিন্ন-বিচারে শ্রীমদ্ভক্তভাগবত ও শ্রীমদ্গ্রন্থ-ভাগবত আলোচনা না করেন, তাঁরা কখনই গৃহে মঙ্গল লাভ করতে পারেন না। যাঁরা ভাগবতের কৃপায়

অনুক্ষণ সঞ্জীবিত না থাকেন, তাঁরা শ্রীগৌরসুন্দরের নিম্নোদ্ধৃত দুইটি কথার অর্থই বুঝতে পারেন না, যে দুইটী কথা পারমার্থিক জীবনের ধ্রুবতারা—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥ *

গৃহে প্রবেশ করা বৈষ্ণবমাত্রেরই কর্তব্য, কারণ তাতে সুষ্ঠু হরিভজন হয়; গৃহব্রতধর্মে তা হয় না। 'কৃষ্ণসেবা করব' সঙ্কল্প করে গৃহে প্রবেশ করাই শ্রেয়ঃ, ফল্গু মর্কটবৈরাগ্য অপেক্ষা তা অতুলিত-গুণে শ্রেষ্ঠ। ফল্গুবৈরাগ্য আদৌ শ্রেয়ঃসাধক নহে। হরিভজনের অনুকূল সংসার হলে সেরূপ গৃহস্থাশ্রমই গ্রহণীয়; আর যদি প্রতিকূল সংসার হয়, তা হলে সেরূপ গৃহান্ধকূপ পরিত্যাজ্য। ফল্গুবৈরাগ্যের Gymnastic feat (ব্যায়াম কৌশল) দেখাবার জন্য যদি গৃহের প্রতি বিতৃষ্ণা উপস্থিত হয়, তা হলে সেরূপ গৃহপরিত্যাগ কখনই শ্রেয়ঃ নহে। ঐরূপ অপক্ক বৈরাগী দুই দিন পরেই পতিত হয়ে যায়। পারমার্থিকের গৃহপ্রবেশ ও মঠ-প্রবেশে কোন ভেদ নেই; কিন্তু গৃহব্রতের গৃহ-প্রবেশ ও কৃষ্ণব্রতের গৃহ-প্রবেশের সহিত যেন মুড়িমিশ্রি এক করে ফেলা না হয়। গৃহব্রতসম্প্রদায় একথা বুঝতে পারে না। যাঁরা শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যায় জীবন লাভ করেছেন, তাঁদের সঙ্গক্রমে গৃহব্রতধর্ম সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। যারা কেবল বহির্জগতের নীতি অবলম্বন করে গৃহে প্রবেশ করে, তারা গৃহব্রত-ধর্মেই অধিকতর নিবিষ্ট হয়। ভগবদ্ভক্তের সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ যেরূপ প্রয়োজন, তদ্রূপ ভগবদ্ভক্তের গৃহস্থাশ্রমগ্রহণ এবং গৃহ-

প্রবেশও পরম প্রয়োজন। ভগবদ্ভক্তের গৃহ-প্রবেশই বাঞ্ছনীয়, অভক্তের গৃহপ্রবেশ কর্তব্য নয়। ভগবদ্ভক্ত গৃহে প্রবেশ করলে জানতে হবে, তিনি মঠপ্রবেশই করেছেন। অনুক্ষণ অনুকূল কৃষ্ণানুশীলন করবার জন্যই গৃহপ্রবেশ করতে হবে। অত্যাহার, প্রয়াস, প্রজল্প, নিয়মাগ্রহ, জনসঙ্গ ও লৌল্য—ইহা হতে পারমার্থিক গৃহস্থ সর্বদা দূরে থাকেন। উৎসাহ, নিশ্চয়, ধৈর্য, অনুক্ষণ শ্রবণ-কীর্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ পালন; অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গ, স্ত্রৈণভাবাবলম্বন সর্বতোভাবে পরিত্যাগ এবং কৃষ্ণের অভক্তের দুঃসঙ্গত্যাগ, পৃথু-অম্বরীষাদি সাধু আচরিত মহাজন-গণের সদাচারানুষ্ঠান, লৌকিকী বৈদিকী যাবতীয় ক্রিয়া হরিসেবার অনুকূলভাবে অনুষ্ঠান, বাক্যের বেগ, মনের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, উদর ও উপস্থের বেগ ধারণ করা পারমার্থিক গৃহস্থের কর্তব্য। শ্রীউপদেশামৃতের এই সকল উপদেশে উদাসীন থাকলে গৃহপ্রবিষ্ট পুরুষ পশু প্রকৃতিতে উপনীত হয়ে গৃহস্থধর্ম হতে বিচ্যুত এবং গৃহব্রত-ধর্মে অত্যধিক আসক্ত হয়ে পড়ে। সুতরাং 'গৃহব্রতধর্ম' বা ফল্গু-বৈরাগ্য গ্রহণ না করে হরিভজনের জন্য পারমার্থিক গৃহস্থধর্ম যাজন করব, কৃষ্ণের প্রহরীরূপে কৃষ্ণভজনের অনুকূল শুক্লবিত্ত সঞ্চয় করব—এইরূপ সঙ্কল্প করে পারমার্থিকগণ গৃহে প্রবিষ্ট হন। দুর্নৈতিক হলে হরিভজন হয় না, বা কেবল নীতির দ্বারাও হরিভজন হয় না। পাপকার্য সংগ্রহ করলে ত হরিভজন হবেই না, পুণ্য-সংগ্রহেচ্ছা থাকলেও হরিভজন হবে না। পুণ্যকে শেষ সীমা মনে করে যে-সকল ব্যক্তি ভোগী ও কর্মবীর হবার দুর্বুদ্ধি পোষণ করে, তাদের সেই দুর্বুদ্ধি হতে মুক্ত হয়ে ঐকান্তিক হরিভজনের জন্য গৃহস্থধর্ম যাজন করতে হবে। নিজের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য প্রয়াস করলে ভোগী গৃহব্রত হয়ে পড়তে হবে; কিন্তু কৃষ্ণসেবার জন্য নিখিল প্রয়াস

করলে মঙ্গল হবে। নিয়মাগ্রহ বা নিয়ম-অগ্রহ থাকলে গৃহব্রত হয়ে যেতে হবে। অনেকে মনে করতে পারেন, গৃহে প্রবেশ করে ঘর দরজা দিয়ে মালা জপ (?) করলেই ত মঙ্গল হবে, আমরা পারমার্থিক গৃহস্থ বলে প্রচারিত হতে পারব; কিন্তু কয়েকদিন এইরূপ মালা নিতে নিতেই কুবিষয়ান্ধকূপে পতিত হতে হবে। পরমহংসকুলের শ্রীমুখ হতে শ্রুত কথার যদি অনুকীর্তন না করি, তদনুরূপ জীবন গঠন না করি, তা হলে গৃহব্রত-ধর্মে পতিত হয়ে যেতেই হবে।

যাঁরা সমস্ত পরিত্যাগ করে সর্বতোভাবে অনুক্ষণ কৃষ্ণভজন করছেন, তাঁদিগকে সর্বতোভাবে সুযোগ প্রদানের জন্য গৃহস্থ ভক্ত অনুক্ষণ চেষ্টা করবেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বর্তমানে যে-কার্য করছেন—নিখিল মানবজাতির যাতে হরিভজন হয়, তজ্জন্য যে চেষ্টা করছেন—বহু বহু গ্যালন রক্ত খরচ করছেন, তাঁদের সেই সেবা-কার্যের সুযোগ প্রদানে যিনি যতটা উদাসীন থাকবেন, তিনি ততটা গৃহব্রতধর্মে প্রবিষ্ট আছেন, জানতে হবে; আর যাঁরা পারমার্থিক গৃহস্থ, তাঁরা নিজের স্ত্রী-পুত্রের জন্য যেরূপ প্রচুর পরিমাণে পরিশ্রম করেন, তদ্রূপ হরিসেবার জন্যও প্রচুর পরিমাণে চেষ্টা করে থাকেন। নিজ স্ত্রী-পুত্রাদি ভগবদ্ভজন করছেন জানলে তাদের পোষণ করেন, নতুবা দুধ-কলা দিয়ে সাপ পোষণ করেন না, তাদের সঙ্গ প্রতিকূল জেনে তফাৎ হয়ে যান। পারমার্থিক গৃহস্থগণ বিষয়-সুখের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন, তারা ২৪ ঘণ্টা হরিসেবার জন্য ব্যস্ত, তাঁরা কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা-বিশিষ্ট—সর্বক্ষণ রকমে রকমে হরিসেবা করছেন। গৃহস্থ ভক্তগণ পারমার্থিক নীতিকেই বহুমানন করেন, লৌকিকী নীতির প্রতি

তাঁদের দ্বেষ বা রাগ নেই। সমস্ত নীতিই তাঁদের সেবাময়ী বুদ্ধিতে পারমার্থিকী নীতিতে পর্যবসিত হয়।

তোণ্ডারড়িপ্পড়ি আলোয়ার কাল্লুর-বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। হরিভক্তি প্রচার করতে করতেও পূর্বসংস্কারবশতঃ তিনি ডাকাতি করে ফেললেন; কিন্তু পারমার্থিকী নীতি তাঁর হৃদয়ে প্রাধান্য লাভ করায় তিনি ডাকাতিকেও হরিসেবার অনুকূলে পরিণত করতে পেরেছিলেন। সমস্ত পরিশ্রম হরিসেবায় নিযুক্ত করবার কৌশল ভগবদ্ভক্তগণই জানেন। যেমন জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহাশয় বহু পরিশ্রম-লব্ধ—যেরূপভাবেই হোক, সংগৃহীত অর্থ হরিসেবার অনুকূলে নিযুক্ত করতে পেরেছিলেন। তাঁর অতি অল্প-সময়ের মধ্যে যে বৃত্তি এসে উপস্থিত হল,—অনন্তকোটি জীবের মধ্যে একটীরও যে সুবুদ্ধি হওয়া কঠিন, অকস্মাৎ তাঁর সেই সুবুদ্ধি হয়ে গেল। তিনি সমস্ত হরিসেবায় সমর্পণ করে গেলেন। তাঁর সংসারের লোকেরা যদি হরিসেবা করেন, তবে তাঁরা ভগবৎপ্রসাদস্বরূপ ভগবদুচ্ছিষ্ট গ্রহণ করতে পারবেন—এইরূপ তাঁর বিচার হয়েছিল। এইরূপ বুদ্ধি উপস্থিত হওয়ায় তাঁর লাভ লোকসান সমস্তই হরিসেবায় নিযুক্ত হয়ে গেল; তিনি নিজে কোন প্রকার পাপ-পুণ্যের ভাগী হলেন না। পরমেশ্বর বস্তুকে বঞ্চিত করে নিজের পাপ-পুণ্য, ভোগ বা ত্যাগ, ন্যায় বা অন্যায়, যে কিছু করবার চেষ্টা হবে, তাতে ন্যায়-অন্যায়ের ফলভোগ করতেই হবে। কিন্তু পরমেশ্বর বস্তু সমস্ত ফল পেলে জীবের ন্যায়-অন্যায়ের ফলভোগী হতে হয় না। মানুষ ডাকাতি করে—নিজের ভোগের জন্য, কিন্তু ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু আলোয়ারের সেই ডাকাতি বিষ্ণুর কার্যে লেগে যাওয়ায় তাঁকে ডাকাতির ফলভোগ করতে হল না।

অর্থার্জন করতে গিয়ে জগবন্ধু বাবুর যে অপরিহার্য অন্যায়াদি স্বীকার করতে হয়েছিল, সে সমস্ত অসুবিধার পূরণ হয়ে গেল যখন সমস্ত ন্যায়-অন্যায়ের ফল পরমেশ্বর বস্তুর সেবানুকূল্যে নিযুক্ত হল। তাই বলে নাম-বলে পাপাচার করতে হবে না। যেহেতু ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু আলোয়ার ডাকাতিকে হরিসেবায় নিযুক্ত করতে পেরেছিলেন, সেই হেতু সকলেই ডাকাতি করে হরিসেবা করবেন—এইরূপ বিচার নাম-বলে পাপ-প্রবৃত্তি হতে উদ্ভূত। জগবন্ধু বাবুর বিষয়-কার্য দৈবাৎ হরিসেবানুকূল্যে নিযুক্ত হয়ে পড়েছিল বলে আমাদিগকে পূর্বে বিষয়ী হয়ে তৎপরে হরিসেবক হতে হবে—এরূপ বিচার ভক্তির প্রতিকূল। যদি দৈবক্রমে কারও কোন পূর্বসংস্কারজাত আচরণ হরিসেবায় নিযুক্ত হয়ে পড়ে, তবে সেই আচরণ সাধারণের পক্ষে বিধি, নিয়ম বা আদর্শ হতে পারে না। যদিও তোণ্ডারড়িপ্পড়ি আলোয়ারের পাপকার্যাদি লয়ে—যদিও মঙ্গলামঙ্গল সব লয়ে জগবন্ধুর সেবা-কার্য, তথাপি তাঁদের কোন বিশেষ সুকৃতিফলে পরমেশ্বর বস্তুতে সমস্ত নিযুক্ত হওয়ায় সুবিধা হয়ে গেল।

কর্মাগ্রহিতা—অকর্মণ্য। কর্মকাণ্ডের দ্বারা কখনও জীবের মঙ্গল হয় না, উহা ফুটবলের মত একবার জীবকে উপরে, আর একবার নীচে চঞ্চল করে তুলে। পাপের কশাঘাত গ্রহণ করতে করতে জীবের পুণ্য-প্রবৃত্তি, আবার পুণ্যের আকাশ-কুসুমে প্রতারিত হতে হতে পাপ-প্রবৃত্তি উপস্থিত হয়; এইজন্য ত্যাগের পন্থা—মোক্ষপর্যন্ত ত্যাগ করবার যে স্পৃহা, তাই ভগবদ্ভক্তির বৃত্তিবিশেষ বলে পরিজ্ঞাত।

পারমার্থিকের মঠ-প্রবেশ ও গৃহ-প্রবেশ একই শ্রেণীর। পারমার্থিক সর্বদা সাবধান থাকেন; যে কার্য করুন না কেন, তাতে যেন তাঁর

পরমেশ্বর-উপাসনা হয়, তা সয়তানের উপাসনা বা নিজের ভোগে যেন না লাগে।

আত্মতত্ত্ব

আমরা গতকল্য দ্বিতীয় পর্যায়ের সম্বন্ধজ্ঞান-বিষয়ক আলোচনা আরম্ভ করেছিলাম, তৎপরবর্তী কতকগুলি কথা আজ বলব। আমাদের বক্তব্য ছিল—আত্মজিজ্ঞাসা। 'আত্ম'-শব্দের অর্থ—"আততত্বাচ্চ মাতৃত্বাদাত্মা হি পরমো হরিঃ"—আত্মা পরমাত্মারই অংশ-বিশেষ; বৃহদাত্মা—পরমাত্মা, হরি। 'আততত্ব'-শব্দের 'তন্' ধাতু বিস্তার অর্থে ব্যবহৃত এবং 'মাতৃত্ব'—মাতা যেরূপ পালন করেন, হরি তেমনই পালনকর্তা। অথবা মাতার পালন-কর্তৃত্ব হরির মাতৃত্ব বা পালনধর্মের অতি সামান্য বিকৃত প্রতিফলন মাত্র। উদ্ভব ও বিনাশ-কার্যের মধ্যস্থানে যে স্থিতি বা সত্তা, তার অধিষ্ঠাতৃদেবতা—বিষ্ণু বা সত্ত্বতনু হরি। পরমাত্মাকর্তৃক সত্ত্ব-সমূহ পালিত হয়—বিনষ্ট হয় না—'আততত্ব'-শব্দে বিস্তৃতি লক্ষ্য করে। শ্রুতি বলেন,—

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে॥

জীবাত্মাকে কেশাগ্রের শতভাগের শতাংশতুল্য সূক্ষ্ম জানতে হবে, অর্থাৎ জীবাত্মা অতি ক্ষুদ্র—অণুচেতন। "স চানন্ত্যায় কল্পতে"।

বিভুচেতনে যে-সকল গুণ, উহাই অণুরূপে জীবাত্মায় বর্তমান। বিভুতে যা আছে, তা অণুতেও আছে। কিন্তু বিভু কখনও অণু নয়, অংশী কখনও অংশ, কলা, বিকলা নয়। অনেক সময় পরমাত্মাও 'আত্ম'-শব্দে সংজ্ঞিত হয়, অনেক সময় জীবও 'আত্ম'-শব্দে লক্ষিত হয়।

'জিজ্ঞাসা' শব্দে—জানবার ইচ্ছা। আত্মবিষয়ক জিজ্ঞাসা ; খণ্ডবস্তুর বা খণ্ডকালের জিজ্ঞাসার কথা হচ্ছে না ; সমগ্র বস্তু ও পূর্ণকালকে লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে। 'আত্ম'-শব্দের দ্বারা নিজেকে নিজে সংরক্ষণ করতে সমর্থ, ইহা বুঝায়। যা সমর্থ নয়, তা 'আত্ম' শব্দে ব্যবহৃত হতে পারে না। সল্পতা বা বৃহত্ত্ব-নির্বিশেষে আত্মশব্দের ব্যবহার। অত্র আত্মবিষয়ক জ্ঞানলাভের কথা হচ্ছে।

জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার মধ্যবর্তি-স্থানে 'জ্ঞান' অবস্থিত। কেবল-জ্ঞাতা ও কেবল-জ্ঞেয়ের মাঝখানে কেবল-জ্ঞান বর্তমান। অন্য তৃতীয় ব্যাপার যদি মাঝখানে দাঁড়ায়, তা হলে জ্ঞান হবে না। যা থেকে জ্ঞান লাভ হয়, বোধের প্রমাণস্বরূপ যা আছে, তা কেবল-চেতন, চিদ্‌চিন্মিশ্র ও অচেতন—এই তিন প্রকারের হতে পারে। মাঝখানে যদি চেতনের সহিত চেতনাভাব অন্য বস্তু আসে, তবে সেটা মিশ্র চেতন।

চেতনের বিপরীত—অচিৎ। যখন জ্ঞেয়—অচিৎ, জ্ঞাতা—অচিন্মশ্র, তখন চিদচিন্মিশ্র জ্ঞাতার জ্ঞানও—অচিতের জ্ঞান, তখন কেবল-জ্ঞানের ক্রিয়ার সুষুপ্তি অবস্থা—শুদ্ধ জ্ঞাতৃত্ব লুপ্ত। জ্ঞেয় বস্তুর যদি কিছু চেতনতা থাকত তবে তার স্বতন্ত্রতা ব্যবহার করত।

আত্মজিজ্ঞাসা—'আমি কে'— এই প্রশ্ন যখন বদ্ধজীব (Conditioned Soul) জিজ্ঞাসা করেন, আমি স্থূল ও সূক্ষ্ম আবরণযুক্ত

হয়েছি, চিদচিন্মিশ্র-ভাবাপন্ন হয়েছি, আমার জ্ঞাতৃত্বধর্ম—যাকে অবলম্বন করে জানব, তা চিদচিন্মিশ্র, তখন চিদচিন্মিশ্র জ্ঞান মাত্র লাভ হবে। জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা যদি কেবল-চেতন হয়, তবেই পূর্ণজ্ঞান লাভ হতে পারে। জ্ঞাতা যদি বহির্জগতের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে, তবে ন্যূনাধিক মিশ্রজ্ঞান লাভ হয়।

পরমাত্মা ও ব্রহ্ম—একই বস্তু। ব্রহ্মের ভাব অদ্বিতীয় বৃহত্তত্ত্ব মাত্র, ব্যাপক পরমাত্মপ্রতীতিবৈশিষ্ট্য তাতে নেই। প্রকৃতিজাত খণ্ডিত পদার্থ সমস্তই ব্রহ্ম-প্রতীতি-বর্জিত। অখণ্ড ব্রহ্মে কোন খণ্ডিতভাব আরোপ করা যাবে না।

প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত—উভয়ধর্ম পরমাত্ম-প্রতীতিতে অবস্থিত। ব্রহ্মে খণ্ডিতভাব বাদ দেওয়া হয়—নিঃশক্তিক বিচার। পরমাত্মায় চিদচিৎ-শক্তি-বিচার এসে গেছে। যেখানে নিঃশক্তিক নির্বিশেষ ব্রহ্ম-বিচার; সেখানে দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন—এই বিশেষধর্ম নষ্ট হয়। বৃহত্ত্বের এক অংশ—প্রকাশ-রহিত নির্বিশেষ ও আর এক—চিৎপ্রতীতি স্বপ্রকাশ পূর্ণ সবিশেষ।

জিজ্ঞাসুর দুই প্রকার শ্রেণী। এক শ্রেণী বলেন,—তাঁরা পূর্বে জানেন না, পরে তাঁদের জানা আরম্ভ হয়। আর এক শ্রেণীর জানতে জানতে পরে জানা থেমে যাবে। 'আত্ম-জিজ্ঞাসা'-শব্দে—অন্বয়ভাবে 'আত্ম' ও ব্যতিরেকভাবে 'অনাত্ম' জিজ্ঞাসা উভয়ই লক্ষিত হচ্ছে।

ব্রহ্মে যে নির্বিশেষ-বিচার, তাতে ইহ জগতের ধর্মের অভাবমাত্র বলা হচ্ছে। সবিশেষবাদী বলেন,—নির্বিশেষবাদও একটা অসংখ্য চিদ্বিশেষের অন্যতম। প্রাকৃত সবিশেষের অভাবরূপ বিশেষ—নির্বিশেষবাদে বর্তমান। একই বস্তুর নিঃশক্তিক ও সশক্তিক-বিচার বর্তমান যেখানে, সেখানে পরমাত্মার বিচার।

পরমাত্ম-বিচারে নির্বিশেষের বিপরীত ভূমা, বিরাট বিশ্বরূপ বিচার। পতঞ্জলির "ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা", "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" প্রভৃতি কথা ব্রহ্ম-বিচার হতে একটুকু পৃথক। তাতে বিবর্তাশ্রয়ে সব বস্তুর মিথ্যাত্ব স্বীকৃত হয় নি। পরমাত্মার সশক্তিক-বিচারে অন্তরঙ্গা, তটস্থা ও বহিরঙ্গা শক্তির পরিচয় আছে। অঙ্গ ও অঙ্গী-বিচারে যাহার অঙ্গ, সে অঙ্গী; অঙ্গীর অঙ্গ, রূপ ও রূপী, শক্তি ও শক্তিমান—প্রথমটীর দ্বারা দ্বিতীয়টী পরিচিত। বস্তু—এক, শক্তি—অসংখ্য। নিঃশক্তিক বিচার এইরূপ বিচার হতে দূরে—স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয় ভেদরহিত—জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-জ্ঞানবিশেষ নেই।

কতকগুলি লোক Cessation of conception and perception (ধারণা ও অনুভূতিশূন্যতা) কেই লক্ষ্য বস্তু মনে করেন। শাক্যসিংহের পরবর্তিকালে চিদরাহিত্য বা অচিন্মাত্রবাদ এবং তৎপরে জ্ঞান-সাহিত্যই স্বীকৃত। কেবল-জ্ঞানই থাকবে; দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন থাকবে না।

পরমাত্মা—পরিমাণগত একে বিভু, অপরটি ভগ্নাংশ অণু। বহিরঙ্গা শক্তিতে কালক্ষোভ্য ভাব, একত্বের বিরুদ্ধ দ্বৈতভাব বর্তমান। অন্তরঙ্গা শক্তিতে নিত্যত্ব উপাদেয় অদ্বয়-বিচিত্রতা ভাব বর্তমান। বহিরঙ্গ শক্তিতে ক্লেশ, অন্তরঙ্গা-শক্তিতে সমস্তই শুদ্ধ অবিমিশ্র।

অচিদংশকে যদি বর্জন করি, সূক্ষ্মদেহের বিচারকেও যদি বাদ দেই, তা হলে শুদ্ধচেতনের বিচারে উপস্থিত হই। যখন আমরা শুদ্ধ চেতনের বিচারে উপস্থিত হই, তখন বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাবে প্রভাবান্বিত হই না। কিন্তু যখন সূক্ষ্মদেহ ও স্থূলদেহ উভয়কে সংযুক্ত করে আলোচনা করি, তখন চিদচিন্মিশ্রভাব, কর্ম-বিচারে হঠযোগ ও জ্ঞান-বিচারে রাজযোগের কথা জানি—চিদচিন্মিশ্রভাবে উপদিষ্ট হই।

যখন ভগবৎ-প্রতীতি হয়, তখন কেবল চিদণু বিভুচিৎকর্তৃক আকৃষ্ট হয়, বস্তুর শক্তির অংশ বা ভেদ লক্ষিত হয়। গুণমায়া রচিত যে-সকল উপকরণ, সেগুলি এক, দুই, বহু অঙ্ক (numerals) সৃষ্টি করে। দ্রষ্টায় ভেদ, দৃশ্যে ভেদ, দর্শনে ভেদ—বহুত্ব দর্শন—বিভিন্ন আধারে প্রতিবিম্বিত এক বিম্বের বহু প্রতিবিম্ব উপস্থিত হয়। অন্তরঙ্গা শক্তির রাজ্যে এক-তাৎপর্যপর হওয়ায় ১, ২, ৩, ৪, বৈচিত্র্যপর পরস্পর বিবদমান (Contending) নয়; এ জগৎ যেমন পরস্পর বিবদমান, পরিবর্তনশীল ও নশ্বরধর্মযুক্ত, সেরূপ অন্তরঙ্গা শক্তির নিত্য চিদ্‌বৈচিত্র্য নহে। নশ্বরতা বা ধ্বংসশীলতা নিত্য মাতৃত্বধর্মের স্বরূপ নহে—বিষ্ণুর প্রতীতি নহে—বিষ্ণুমায়ারচিত চিৎ-প্রতিকৃতি মাত্র। এ জগতে বিভিন্নবস্তু—নশ্বর, উহা 'আত্ম'-শব্দ-বাচ্য নহে, উহা অনাত্ম, অনিত্য।

জীবাত্মা—অনাত্মা নহে। নাস্তিক বলেন,—জীবাত্মা—অনাত্মা। আস্তিক বলেন,—জীবাত্মা নিত্য আত্মবস্তু—শুদ্ধস্বরূপে অবিমিশ্র চেতনবস্তু—পূর্ণচেতনের শক্তিরূপ অণু-অংশ—পূর্ণ চেতনের নিত্য অধীন বা বশ্য।

ভগবানের এক প্রকার অঙ্গ অন্তরের, আর এক প্রকার অঙ্গ বাহিরের। বাহিরের অঙ্গে পূর্ণ জ্ঞানের বাধা, কালক্ষোভ্য ধর্ম বর্তমান; বাহিরের অঙ্গ হতেই জগৎ। জগতে গমনশীলতাধর্ম, জাগতিক বস্তু কর্পূরের ন্যায় উৎক্ষিপ্ত হয়। জগতে পরিবর্তনশীল ধর্ম রয়েছে—শিশু, যুবা বৃদ্ধ হয়—মৃত্যুগ্রস্ত হয়—বাসনার দ্বারা চালিত হয়ে ভিন্ন স্তরে নীত হয়—ওজঃ বীর্য-দ্বারা মাতৃ-কুক্ষিতে জন্মগ্রহণ করে।

আত্মজিজ্ঞাসা কর্তব্য—এ স্থলে অনাত্মজিজ্ঞাসা নহে। গীতার ২য় অধ্যায়ে,—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥
নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥ *

গীতার ৭ম অধ্যায়ে,—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ॥ ‡

—ইত্যাদি শ্লোকে জীবের পরিচয় উক্ত হয়েছে। সেই জীব বদ্ধ-ভাবাপন্ন হয়ে একপ্রকার, মুক্ত হয়ে আর এক প্রকার, আর উভয়যুক্ত ধর্মে তটস্থ। একটি যষ্টি বা শঙ্কুর (Gnomon এর) দুইটি দিক— একদিকে এক নাম, অপর দিকে অন্য নাম।

---

* জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নরগণ যেমন অপর নব-বসন পরিধান করে, দেহীও তেমনি জীর্ণ শরীর ত্যাগ করতঃ অভিনব দেহ ধারণ করিয়া থাকে। জীবাত্মা অস্ত্র-শস্ত্রাদিতে ছিন্ন হন না, অগ্নিতে দগ্ধ হন না, জলে ক্লেদিত হন না এবং বায়ুদ্বারাও শুষ্ক হন না। এই জীবাত্মা—অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য ও অশোষ্য; ইনি—নিত্য, সর্বগত, স্থাণু ও অচল অর্থাৎ স্থিরতর; ইনি—সনাতন অর্থাৎ সদা বিদ্যমান।

‡ ভগবৎস্বরূপ ও ভগবদৈশ্বর্য জ্ঞানের নামই 'ভগবজ্-জ্ঞান'। তাহার বিবৃতি এই যে, আমি—সদা স্বরূপসংপ্রাপ্ত শক্তিসম্পন্ন তত্ত্ববিশেষ; ব্রহ্ম—আমার শক্তিগত একটী নির্বিশেষ ভাবমাত্র; তাহার স্বরূপ নাই,—

যখন আমি 'প্রভু' সাজতে চাই, অন্যের উপর প্রভুত্ব করতে চাই, তখন প্রকৃতির বশ হই, মায়াবাদী হই। বৌদ্ধগণকে প্রকৃতিবাদী বা মায়াবাদী বলা হয়। শৌতক্রব মায়াবাদিগণ আধ্যক্ষিকতা ও প্রচ্ছন্ন তার্কিকতা অবলম্বন করায় 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ' নামে অভিহিত।

চিৎসমন্বয় শুদ্ধাদ্বৈতবিচারে প্রতিষ্ঠিত। শ্রীধর স্বামিপাদ—শুদ্ধাদ্বৈতবাদী। কেবলাদ্বৈতবাদিগণ শ্রীধর স্বামীর শুদ্ধাদ্বৈতবিচারকে

সৃষ্টজগতের ব্যতিরেক চিন্তাতেই তাহার সাম্বন্ধিক-অবস্থিতি। পরমাত্মাও জগন্মধ্যে আমার শক্তিগত আবির্ভাব-বিশেষ; ফলতঃ তাহাও অনিত্য-জগৎ-সম্বন্ধি তত্ত্ববিশেষ, তাহারও 'নিত্য' স্বরূপ নাই। আমার ভগবৎ-স্বরূপই 'নিত্য' তাহাতে আমার শক্তির দুইপ্রকার পরিচয় আছে; শক্তির একটী পরিচয়ের নাম—'বহিরঙ্গা' বা 'মায়াশক্তি'। জড়-জননী বলিয়া তাহাকে 'অপরা শক্তি'ও বলা যায়; আমার এই অপরা বা জড়-সম্বন্ধিনী শক্তির মধ্যে তত্ত্ব-সংখ্যা লক্ষ্য করিবে; ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ—এই পাঁচটী মহাভূত এবং শব্দ, স্পর্শ. রূপ, রস, গন্ধ—এই পাঁচটী তন্মাত্র; এই প্রকার দশটী তত্ত্ব গৃহীত হয়। অহঙ্কার-তত্ত্বে তাহার কার্যভূত ইন্দ্রিয়সকল ও কারণভূত মহত্তত্ত্ব গৃহীত হইবে। বুদ্ধি ও মনের পৃথগুক্তি—কেবল তত্ত্বসমূহের মধ্যে তাহাদের প্রাধান্য-মতে ভিন্ন ভিন্ন কার্য থাকা-প্রযুক্ত, ফলতঃ তাহারা—'এক'তত্ত্ব। এই সমুদায়ই আমার বহিরঙ্গা-শক্তিগত। এতদ্ব্যতীত আমার একটি 'তটস্থা প্রকৃতি' আছে, যাহাকে 'পরা প্রকৃতি' বলা যায়। সেই প্রকৃতি—চৈতন্যস্বরূপা ও জীব-ভূতা; সেই শক্তি হইতে সমস্ত জীব নিঃসৃত হইয়া এই জড়জগৎকে চৈতন্যবিশিষ্ট করিয়াছে। আমার অন্তরঙ্গা-শক্তি-নিঃসৃত চিজ্জগৎ ও বহিরঙ্গা-শক্তি-নিঃসৃত জড়জগৎ—এই উভয় জগতের উপযোগী বলিয়া জীবশক্তিকে 'তটস্থা শক্তি' বলা যায়।

বিদ্ধ বিচারে পরিণত করবার জন্য সচেষ্ট। ইহা বিদ্ধাদ্বৈত-বাদিগণের অসদভিপ্রায়। সর্বজ্ঞ মুনি শঙ্করাচার্যের বহু শত বৎসর পূর্বে মাদুরা জেলার কল্যাণপুর গ্রামে শুদ্ধাদ্বৈতবাদ প্রচার করেন। তা কালপ্রভাবে অভক্ত-মোহনকল্পে বিকৃত হয়ে কেবলাদ্বৈতবাদে প্রাধান্য লাভ করেছে। এমন কি, শ্রীপাদ শঙ্করের পর সর্বজ্ঞাত্ম মুনির সহিত সর্বজ্ঞ মুনির একটা গোঁজামিল দিয়ে লোকের চক্ষে ধাঁধা লাগাবার চেষ্টা পর্যন্ত হয়েছে!

বস্তুর অংশ-বিচারে বিকার-বাদের হেয়তা প্রবল হবে, এজন্য শ্রীল লক্ষ্মণদেশিকের শক্তি-বিচার শ্রীগৌরসুন্দর অনুমোদন করেছেন। বস্তুর বিকার এই জগৎ নহে, পরন্তু বস্তুর বহিরঙ্গা শক্তির বিকার, ইহা গৌরসুন্দর বলেছেন। খৃষ্টাবলম্বিগণের বিচারে জীব কালাধীনে ঈশ্বর-সৃষ্ট মাত্র; এই বিচার সমীচীন নহে। জীব বস্তুর শক্তির অংশ বা বিভেদ। জীবে সদসৎ উভয় প্রকার গুণ বর্তমান। অন্তরঙ্গা শক্তিতে নিখিল সৎ (অস্তিত্বযুক্ত) নিত্য গুণরাশি বর্তমান। সত্ত্ব, রজঃ ও তমো-গুণত্রয় বহিরঙ্গা শক্তি প্রকৃতিতে বর্তমান। নিখিল-সদ্‌গুণ-কল্যাণ-বারিধি বিষ্ণুতে বিশুদ্ধসত্ত্ব নিত্য বর্তমান; সেখানে আপেক্ষিকতা নেই। গুণজাত জগতে আপেক্ষিকতা—সত্ত্ব, রজঃ ও তমে পরস্পর আপেক্ষিকতা বর্তমান।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণিঃ সর্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে॥ (গীঃ ৩।২৭) *

---

* বিদ্বান ও অবিদ্বানের ভেদ বলি, শ্রবণ কর। অবিদ্যাদ্বারা জড়া প্রকৃতিতে আবদ্ধ হইয়া জীব প্রাকৃত অহঙ্কারবশতঃ প্রকৃতির গুণদ্বারা ক্রিয়মাণ সমস্ত কার্যকে স্বীয় কার্য মনে করিয়া 'আমি কর্তা'--এইরূপ অভিমান করেন। ইহাই অবিদ্বানের লক্ষণ।

এই গুণজাত জগতের বিপরীতভাব জাড্য বা সুষুপ্তি নির্বিশেষ-বিচারে আবৃত। "সুখ-মহমস্বাপ্সম্"---আমি সুখে নিদ্রা গিয়েছিলাম। সুখ-নিদ্রা তাঁর স্মৃতির বিষয়। তিনি সুষুপ্তিতেও অস্মিতা পর্যন্ত উপলব্ধি করেন, নতুবা সুখ-নিদ্রার স্মৃতি হত না। যেমন জাতিস্মর-অবস্থায় পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করে বলতে পারে।

"দেহে আত্মবুদ্ধি হয় বিবর্তের স্থান", এই স্থূলদেহ—'আমি'—ইহাই এক বস্তুতে অন্য বস্তু ভ্রম বা বিবর্ত। "আমি দেহ, আমার কালঙ্কোভা দেহ, আমাকে অমুক লোক গালাগালি দিল"—বর্ণনগুলি স্থূল ও সূক্ষ্ম-দেহ-সংক্রান্ত। প্রকৃত শুদ্ধ আমি আগমাপায়ী নহে। দেহ আমি নই, মনও আমি নই ; সকালে, দুপুরে, সন্ধ্যায় বদলে যায় যে মন, কখনও প্রসন্ন, কখনও অপ্রসন্ন হয় যে মন, তা আমি নই। সত্যের যে ধারণা বদলে যায়, তা মনোধর্ম। যে চেতন অচিতের সহিত মিশ্রিত হবার উপযোগী, উহা তটস্থা শক্তি হতে উদ্ভূত। তটস্থশক্তিজাত হয়েও নিজকে শক্তিমান বা শক্তির চালক মনে করা কতটা অসদভিপ্রায়-পোষণ! ইহারা "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি", "ঈশ্বরোঽহম্" প্রভৃতি গীতোক্ত শ্লোকের বিষয়।

যেরূপ ধান ও শ্যামা গাছ বস্তুতঃ পৃথক বস্তু, যেরূপ ধানের নিড়ান দেওয়া আবশ্যক, সেরূপ শুদ্ধচিৎ ও চিদাভাস, চিৎপ্রতীতি ও অচিৎ-প্রতীতি বস্তুতঃ পৃথক ; চিৎ হতে অচিৎকে নিরাকরণ করা আবশ্যক। চিজ্জড়সমন্বয়বাদী সৎ ও অসৎসঙ্গ, ধান গাছ ও শ্যামা গাছ, ভক্তি ও অভক্তিকে সমান মনে করে। মায়াবাদের বিকৃতিই চিজ্জড়সমন্বয়বাদ। মায়াবাদিগণ মুখে বলেন—'সকলই মানি' ; কিন্তু তাঁরা পরমেশ্বর বস্তুকেই মানেন না—পরমেশ্বর-তত্ত্বের নিত্য নাম, নিত্য রূপ, নিত্য গুণ, নিত্য পরিকর-বৈশিষ্ট্য, নিত্যলীলা স্বীকার করেন

না। ইঁহারা মানবোচিত ব্যবহার পরমেশ্বরে আরোপবাদ (anthropomorphism) বা মনুষ্যে দেবারোপকল্পনাবাদ (apotheosis) সৃষ্টি করেন---ভগবানের নিত্য শুদ্ধ নাম-রূপাদি বাদ দিয়ে এখানকার মলিনতা পূর্ণ-সচ্চিদানন্দবস্তুর গায়ে মাখাবার চেষ্টা করেন। পশুতে দেবারোপ-কল্পনাবাদ (zoo-morphism) ইহাদেরই সৃষ্ট মত। ইহারা সকলেই বুৎপরস্তের পূজক। বাস্তব রাম-নৃসিংহ-বরাহ-মৎস্য-কূর্মাদি শ্রীনারায়ণ---নিত্যনাম, নিত্যরূপ, নিত্যগুণ, নিত্য-পরিকর-বিশিষ্ট্য-যুক্ত, নিত্য-লীলাময়, মায়াধীশ, অপ্রাকৃত বিষ্ণুবস্তু। ইঁহাদের প্রত্যেকের নিত্য বৈকুণ্ঠ আছে ; তাঁরা বৈকুণ্ঠ হতে কৃপাপূর্বক স্বেচ্ছাবশতঃ জীব-সকলের জন্য কুণ্ঠজগতে স্বপ্রকাশ প্রদর্শনকল্পে অবতীর্ণ হয়েও সর্বদা পূর্ণ-বৈকুণ্ঠস্থ থাকেন। ইঁহারা সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্রতা-ধর্ম সম্পূর্ণভাবে সংরক্ষণ করেন। ইঁহারা মনুষ্যে দেবারোপকল্পনাবাদী বা পশুতে দেবারোপ-কল্পনাবাদী, পৌত্তলিক, চিজ্জড়সমন্বয়বাদী কিম্বা মায়াবাদিগণের নায়ক বা আরাধ্য তত্ত্ব নন। চিজ্জড়সমন্বয়বাদিগণের কল্পনা, কপটতা, পূজার ছলনা---রাবণের মায়াসীতা হরণচেষ্টার ন্যায় সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র বিষ্ণু-তত্ত্বকে স্পর্শও করতে পারে না। আত্মবিদগণ বহির্জগতের এরূপ সমুদয় মল পরিত্যাগ করে নিত্য, বাস্তব, অখণ্ড, পূর্ণ-সচ্চিদানন্দ, নিত্য-নাম-রূপ-গুণ-লীলা পরিকরবৈশিষ্ট্য ভগবদ্বস্তুর নিত্য সেবা করেন। মায়াবাদী এই জগতের হেয় পরিচ্ছিন্নভাব ভগবদ্বস্তুতে আরোপিত বা ব্যাপ্ত করবার দুর্বুদ্ধি পোষণ করেন। তাঁর বিবর্তের নেশা তাঁকে কোনকালেই পরিত্যাগ করে না ; ভগবদ্বস্তুর অনুশীলনকালেও ভগবদ্বস্তুতে তাঁর মায়িকবস্তু ভ্রান্তি এসে উপস্থিত হয়। তাই মায়াবাদী ভগবদ্বস্তুতে হেয়তার আরোপ করেন, ভগবদ্বস্তুর নিত্য নাম-রূপ-গুণাদিকে মায়াময় মনে করেন। আধুনিক খৃষ্টোপাসকগণেরও কেহ

কেহ আমাদের পৌরাণিকগণকে মনুষ্যে দেবারোপকল্পনাবাদী বা পশুতে দেবারোপকল্পনাবাদী মনে করেন। ইহা তাঁদের সুষ্ঠু বিচারের অভাব।

বাস্তব সনাতনধর্ম—শ্রীচৈতন্যপ্রচারিত ধর্ম এরূপ নহে। "প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণুকলেবর। বিষ্ণু নিন্দা আর নাহি ইহার উপর॥" বিষ্ণু—নিরবচ্ছিন্ন চেতন, স্থিতিবান ও আনন্দময়। মায়ার জগতে বিষয়ের বহুত্ব ; বৈকুণ্ঠে এক অদ্বয় বিষয়। সেখানে henotheism, polytheism or cathonitheism (পঞ্চোপাসনা, বহ্বীশ্বরবাদ) নেই। মোক্ষমূলার সাহেব কতকটা পঞ্চোপাসনাকে henotheism নামে অভিহিত করেছেন। সদানন্দ যোগীন্দ্র সদসদ হতে অনির্বচনীয় অজ্ঞান-সমষ্টিকে 'ঈশ্বর' কল্পনা করেছেন। সদানন্দ যোগীন্দ্রের কল্পনার কারখানায় গড়া ক্ষণভঙ্গুর ঈশ্বর—পূর্ণ আস্তিকগণের বাস্তব পরমেশ্বর বস্তু নহে। শ্রীগৌরসুন্দর বলেন,—"অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।" অদ্বয়জ্ঞানে প্রাকৃত দ্বৈতজ্ঞান নেই— "দ্বৈতে ভদ্রাভদ্রজ্ঞান সব মনোধর্ম। এই ভাল, এই মন্দ—এই সব ভ্রম॥" কেবলাদ্বৈতের সহিত যে অচিন্ত্য-ভেদাভেদের নিত্য পার্থক্য আছে, তা ভক্তিধর্মে জানতে পারি। অনাত্ম-প্রতীতির সহিত আত্ম-প্রতীতির, অচিৎ-প্রতীতির সহিত চিৎপ্রতীতির যে ভেদ আছে, উহাকে সমন্বয় করা উচিত নহে, উহা ভক্তি-বিরুদ্ধ।

রামানুজীয় দার্শনিক সাহিত্যে শক্তি-বিচার দেখি,—চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সাহিত্যে অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থা। যদি 'চিৎ'শব্দ সুষ্ঠু হত, তবে অচিতের সহিত সংশ্লিষ্ট হত না। শ্রীচৈতন্যদেব আনন্দতীর্থের বিচার-প্রণালীকে স্বীকার করে কেবলা-দ্বৈতবাদের সহিত অত্যন্ত পার্থক্য স্থাপন করেছেন,—

"আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং সর্বশক্তিং রসাব্ধিং
তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতি-কবলিতান্ তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ।

ভেদাভেদপ্রকাশং সকলমপি হরেঃ সাধনং শুদ্ধভক্তিং
সাধ্যং তৎপ্রীতিমেবেত্যুপদিশতি জনান্ গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং সঃ ॥”

গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত বেদবাক্যই আম্নায়। বেদ ও তদনুগত শ্রীমদ্ভাগবতাদি স্মৃতিশাস্ত্র, তথা তদনুগত প্রত্যক্ষাদিই প্রমাণ। সেই প্রমাণদ্বারা স্থির হয় যে, হরিই পরমতত্ত্ব, তিনি সর্বশক্তিসম্পন্ন, তিনি অখিলরসামৃতসিন্ধু ; মুক্ত ও বদ্ধ—দুই প্রকার জীবই তাঁর বিভিন্নাংশ ; বদ্ধজীব—মায়াগ্রস্ত, মুক্তজীব—মায়ামুক্ত ; চিদচিৎ সমস্ত বিশ্বই শ্রীহরির অচিন্ত্য-ভেদাভেদপ্রকাশ, ভক্তিই একমাত্র সাধন এবং কৃষ্ণ-প্রীতিই একমাত্র সাধ্যবস্তু।

“শ্রীমধ্বঃ প্রাহ বিষ্ণুং পরতমমখিলাম্নায়বেদ্যঞ্চ বিশ্বং
সত্যং ভেদঞ্চ জীবান্ হরিচরণজুষস্তারতম্যঞ্চ তেষাম্।
মোক্ষং বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রিলাভং তদমলভজনং তস্য হেতুং প্রমাণম্
প্রত্যক্ষাদিত্রয়ঞ্চেত্যুপদিশতি হরিঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রঃ ॥

শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীমদানন্দতীর্থের বিচারপ্রণালীকে স্বীকারপূর্বক কেবলাদ্বৈতবাদের সহিত পৃথক করেছেন। আত্মজিজ্ঞাসায় আমরা যখন পরমাত্মার পদবী গ্রহণ করি, তখন আমাদিগকে আচার্য জিজ্ঞাসা করবেন,—

---

* শ্রীল মধ্বাচার্য বলেন—শ্রীবিষ্ণুই শ্রেষ্ঠতত্ত্ব ; তিনি সর্ববেদবেদ্য। বিশ্ব সত্য (মিথ্যা নহে) কিন্তু বিষ্ণু হতে ভিন্ন। জীবসকল শ্রীহরির চরণসেবনকারী ; কিন্তু তাঁদের মধ্যে হরিসেবনানুসারে তারতম্য আছে। শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মলাভই মোক্ষ। শ্রীবিষ্ণুর অমলভজনই শ্রীবিষ্ণু-পাদপদ্মলাভের হেতু। প্রত্যক্ষাদি তিনটি অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ,—এই তিনটী প্রমাণ। ইহাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র হরি উপদেশ দিয়েছেন।

"ঐশ্বর্যং তব কুত্র কুত্র বিভুতা সর্বজ্ঞতা কুত্র তে।
তন্মেরোরিব সর্ষপেণ হি তুলা জীব ত্বয়া ব্রহ্মণঃ ॥"

দেখ, তোমার ঐশ্বর্য, বিভুতা ও সর্বজ্ঞতা কোথায়? হে জীব, সর্ষপের সহিত যেরূপ সুমেরু পর্বতের তুলনা, তোমার সহিত সেইরূপ ব্রহ্মের অভেদ তুলনা।

নদ্যঃ সমুদ্রে মিলিতাঃ সমন্তান্নৈক্যং গতা ভিন্নতয়া বিভান্তি।
ক্ষীরোদশুদ্ধোদকয়োর্বিভেদাদাস্তে তয়োর্বাস্তব এব ভেদঃ ॥
দুগ্ধে তোয়ং মিলিতমপরে নৈব পশ্যন্তি ভেদং
হংসস্তাবৎ সপদি কুরুতে ক্ষীরনীরস্য ভেদম্।
এবং জীবা লয়মধিপরে ব্রহ্মণা যে বিলীনা
ভক্তা ভেদং বিদধতি গুরোর্বাক্যমাসাদ্য সদ্যঃ ॥

নদীসকল সমুদ্রে মিলিত হলে সম্পূর্ণরূপে ঐক্য লাভ করে না। পয়োরাশির মধ্যে উভয় জল পৃথক পৃথক থাকে। ক্ষীর-সমুদ্রের জল ও নদীর জল সর্বদা ভিন্ন থাকায় নদী ও সমুদ্রের বাস্তব ভেদ নিত্য। দুগ্ধের সহিত জল মিশ্রিত করলে অপরে তাতে ভেদ দেখতে পায় না। কিন্তু হংস উপস্থিত থাকলে তৎক্ষণাৎ ক্ষীরকে নীর হতে পৃথক করে। তদ্রূপ মায়াবাদীর বুদ্ধিতে যে-সকল জীব পরতত্ত্বে ব্রহ্মের সহিত বিলীন হয়, ভক্তসকল গুরুবাক্য অবলম্বনপূর্বক সদ্য সেই জীব ও ব্রহ্মের ভেদ দেখিয়ে দিতে পারেন।

জীব যদি ব্রহ্ম হয়, তবে তাকে শিষ্য বা অজ্ঞানী—এরূপ জ্ঞান কর কেন? আর তোমার মতে জগতের অসত্য নির্দ্ধারিত হওয়ায় শিষ্য, আচার্য ও আচার্যের উপদিষ্ট জ্ঞান—এ সমস্তও যে জগতেরই অন্তর্গত।

"তর্হ্যেবং জগন্মিথ্যাত্ববাদে শিষ্যাচার্যয়োস্তদুপদিষ্ট-জ্ঞানস্যাপি তদন্তর্গতত্বাচ্ছিষ্যোপদেশার্থং কল্পিতমিত্যপি ন শক্যতে বক্তুম্, কল্পিতাচার্যোপ-

দিষ্টেন কল্পিতজ্ঞানেন কল্পিতস্য শিষ্যস্য কা ব্যর্থসিদ্ধিঃ। নির্বিশেষ চিন্মাত্রাতি-রেকি সর্বং মিথ্যেতি বদতো মোক্ষার্থশ্রবণাদি প্রযত্নো নিষ্ফলোঽবিদ্যা কার্যত্বাৎ শুক্তিকারজতাদিষু রজতাদ্যুপাদানাদি প্রযত্নবৎ। মোক্ষার্থ-প্রযত্নোঽপিব্যর্থঃ, কল্পিতাচার্যায়ত্তজ্ঞানকার্যত্বাৎ। শুক-প্রহ্লাদ-বামদেবা-দিপ্রযত্নবৎ।"

শ্রীরামানুজাচার্য বলেন,—যেখানে জগৎ অসত্য, সেখানে আচার্য ও আচার্য-উপদিষ্ট জ্ঞানও মিথ্যা। ঐ সকল জ্ঞান কেবল শিষ্যোপ-দেশের জন্য কল্পিত হয়েছে, একথাও বলতে পার না; কারণ কল্পিত আচার্যের কল্পিত জ্ঞানদ্বারা কল্পিত শিষ্যের কি প্রয়োজন সিদ্ধ হতে পারে?

রজতরূপে প্রতীয়মান শুক্তি দেখে রজতার্থী কোন ব্যক্তি যদি রজত আহরণের জন্য তাতে প্রবৃত্ত হয়, তা হলে তার সেই প্রযত্ন যেরূপ বিফল হয় অর্থাৎ রজত লাভ হয় না, সেরূপ নির্বিশেষ-জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম ভিন্ন সমস্তই মিথ্যা বলে মোক্ষলাভের জন্য শ্রবণাদি বিষয়ে প্রযত্নও অবিদ্যার কার্য বলে নিষ্ফল হয়ে পড়ে।

মুক্তিলাভের চেষ্টাও কল্পিত আচার্যের অধীন জ্ঞানের কার্য বলে কল্পিত শুক, প্রহ্লাদ এবং বামদেব প্রভৃতির চেষ্টার ন্যায় ব্যর্থ হয়।

"জাতে তু জ্ঞানে যত্র ত্বস্য সর্বমাত্মৈবাভূৎ কেন কং পশ্যেৎ ইত্যাদি-শ্রুতের্নদ্বৈতদর্শনমিতি চেত্তর্হি অদ্বিতীয়াসাক্ষাৎকারাদ্ বিনষ্টমূলাজ্ঞান-তাৎকার্যস্য কথং দ্বৈতদর্শনপূর্বকোপদেশাদি ব্যবহারাঃ।"

হে মায়াবাদিন যদি বল, তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তির পূর্বে উপদেশ প্রভৃতি বিষয় যথার্থরূপেই বর্তমান থাকে, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হলে "যে-সময় ইহার নিকট সমস্তই আত্মস্বরূপে প্রতিভাত হয়, তখন কাহার দ্বারা কাহাকে দর্শন করব"—এই শ্রুতি অনুসারে দ্বৈতদর্শন না থাকায়

উপদেশাদি সমস্তই মিথ্যা হয়ে পড়ে। তা হলেও বক্তব্য এই যে, গুরুর অদ্বৈত-সাক্ষাৎকারদ্বারা মূল অজ্ঞান ও অজ্ঞানের কার্য দ্বৈতদর্শন বিনষ্ট হয়েছে, তিনি আবার কিরূপে দ্বৈতদর্শনপূর্বক শিষ্যকে তত্ত্বোপদেশ দিতে সমর্থ হন? অদ্বৈতোপলব্ধিতে যখন দ্বৈতজ্ঞান তিরোহিত হয়, তখন ত উপদেশ সম্ভবই নহে। আর ভেদজ্ঞান বিরাজ থাকা-কালে অজ্ঞান থাকে, সে-কালে অজ্ঞানী, অসিদ্ধ ব্যক্তি ত উপদেশই করতে পারেন না। সুতরাং মায়াবাদী ত কোনও কালেই 'গুরু' হতে পারেন না। সিদ্ধাবস্থায় (?) তাঁর গুরু হওয়া অসম্ভব। অসিদ্ধাবস্থায় ত গুরু হতেই পারেন না। এজন্য কখনও মায়াবাদীকে 'গুরু' করা উচিত নয়। তিনি নিজেই যদি উপদেশকালে অসিদ্ধ থাকেন, তা হলে সেই অসিদ্ধের নিকট গমন ও শ্রবণ বৃথা।

আমরা চিদচিন্মিশ্র তটস্থ—বিরজায় বা কারণ-সমুদ্রে মানবজ্ঞানের ত্রিগুণ সাম্যাবস্থা লাভ করেছে। সেখানে গুণ-বৈচিত্র দেখা যায় না। সেখানে ভাগবত-প্রতিপাদ্য বাস্তব-সত্যের কথা নেই।

রামানুজীয় বিচারে যেখানে চিৎ-এর ব্যবহার, সেখানে বিবর্ত আসার শঙ্কা। "অহং ব্রহ্মাস্মি" তটস্থ ভাবমাত্র—তৃণাদপি সুনীচ ভাবটী প্রকৃত চেতনের—জীবের ধর্ম।

গৌড়ীয়-দর্শনকে "অচিন্ত্যভেদাভেদ-দর্শন" বলা যায়। "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস। কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ।" ইহা 'কে আমি' প্রশ্নোত্তরে বলা হয়েছে। তুমি ব্রহ্ম নহ, তটস্থ শক্তিজাত চেতনও বটে। আবার অচেতনের সহিত সংমিশ্রিত ,চিদচিদ বৃত্তিযুক্ত। যদি কেবল অচেতন হতে, তবে স্বতন্ত্রতা থাকত না।

"ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ (গীঃ ১৮।৬১)

যদি স্বেচ্ছায় প্রেয়ঃপথে চালিত হই, তবে ত্রিতাপজ্বালা অনিবার্য। কিন্তু আমি জন্ম-স্থিতি-ধ্বংসযুক্ত বস্তু নই। আমি তটস্থ ধর্মযুক্ত। আমার প্রভুত্বে ইচ্ছা আমার সর্বনাশের কারণ। মুক্তগণের—আত্মবিদ-গণের—বিচার নহে,—ভগবদবহির্মুখ হওয়া।

লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে।
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্যা ভক্তিমিচ্ছতা॥
ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥

মানবকুল লৌকিক ও বৈদিক যে-সকল ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে, ভক্ত্যাভিলাষি-ব্যক্তি সেই সমস্ত ক্রিয়া যাতে হরিসেবার অনুকূলা হয়, সেইরূপভাবে করবেন।

যে-কোনও অবস্থায়ই পতিত হউন না কেন, কায়, মন ও বাক্যের দ্বারা হরির দাস্যে যাঁর সর্বতোভাবে প্রযত্ন, কৃষ্ণার্থেঽখিলচেষ্ট সেই পুরুষই জীবন্মুক্ত।

"মুক্তির্হিত্বাঽন্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ"। অন্যরূপ অর্থাৎ বিরূপ পরিত্যাগ করে নিত্যশুদ্ধ স্বরূপে বিশেষরূপে অবস্থিতির নামই মুক্তি। এরূপ ধরণের কথা নয় যে, অণুচিৎ আমি বৃহৎচিৎ হব।

যথা সমুদ্রে বহবস্তরঙ্গাস্তথা বয়ং ব্রহ্মণি ভূরি জীবাঃ।
ভবেৎ তরঙ্গো ন কদাচিদব্ধিস্ত্বং ব্রহ্ম কস্মাদ্ভবিতাসি জীব?

যেরূপ সমুদ্রে অনন্ত তরঙ্গ রয়েছে, সেরূপ আমরাও চিৎসমুদ্রস্বরূপ ব্রহ্মে অনন্ত জীব অবস্থিত। তরঙ্গ যেরূপ কখনই সমগ্র সমুদ্র বলে গণ্য হতে পারে না, সেরূপ তুমি জীব কিরূপে আপনাকে ব্রহ্ম বলে প্রতিপন্ন করবে? অর্থাৎ সমুদ্র তরঙ্গপূর্ণ বটে, যেহেতু তরঙ্গ সমুদ্রের অঙ্গ, কিন্তু তরঙ্গ কখনই—সমগ্র সমুদ্র বা নিজ সমুদ্র (ocean proper) নয়।

চিৎকণ জীবসমূহ ব্রহ্মের বিভিন্নাংশ হলেও জীব কখনই ব্রহ্ম হতে পারে না।

ঘটাকাশ ও মহাকাশের উপমা খুব অসম্পূর্ণতা-দোষে দুষ্ট। বোকা লোকের ভাঁশাবুদ্ধি সাময়িক অভিভূত করে তাদিগকে ঠকানোর চেষ্টা! ঘটাবৃত আকাশ—মহাকাশ নয়। ঘট ভাঙ্গলে—"স চ অনন্ত্যায় কল্পতে।" সে তখন কৃষ্ণদাস—কৃষ্ণকর্তৃক আকৃষ্ট—পূর্ণতমকর্তৃক পূর্ণরূপে আকৃষ্ট—পাঁচ প্রকার আকর্ষণ।

ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকারভারভূঃ।
হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ॥

ভাবনার পথ অতিক্রম করে অপ্রাকৃত চমৎকার পরাকাষ্ঠার আধার স্বরূপ যে স্থায়ীভাব শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল হৃদয়ে নিশ্চিতরূপে আস্বাদিত হয়, তাই 'রস' বলে কথিত। নলদয়মন্তীর—ভরতমুনির প্রাকৃত রস—'রস' নহে। জয়দেবের "চন্দ্রালোকের" রস হতে উহা পৃথক। বৈরাগ্য 'রস' নয়। আত্মজিজ্ঞাসা—মনের দ্বারা জিজ্ঞাসা নয়। লব্ধ সমাধিতে অর্থাৎ neutral stageএ (নিরপেক্ষ অবস্থায়) absoluteএর অবস্থান। তথায় আমরা 'শান্ত রস' দেখি। নির্বিশেষবাদীর শান্তরস নয়, যেহেতু জড়বিশেষবাদে সাপেক্ষধর্ম চিত্তদর্পণকে পার্থিব চিন্তারজো-দ্বারা আবরণ করায় উহা হতে মুমুক্ষাই নির্বিশেষ-বিচার।

যদি নৈষ্কর্ম্য-বিচারে পূর্ণমাত্রায় অবস্থান করি, তা হলেই আমরা এই সকল বিচার বুঝতে পারি।

তত্ত্ব জিজ্ঞাসা—

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

তত্ত্ববস্তুর ধারণা কেবল চেতন হলে—ব্রহ্ম ধারণা, সৎচিৎ ধারণা হলে

পরমাত্মা ও সচ্চিৎসহ আনন্দসংযুক্ত হয়ে ধারণা হলে—ভগবান্। সুতরাং অসম্পূর্ণ ধারণা তিনটিকে পৃথক করে না, তবে অসম্পূর্ণতা সংরক্ষণকারী তাদের পৃথক বুঝে। অদ্বয়জ্ঞানকেই তত্ত্ব বলে। 'ব্রহ্ম' একটী মহঃ, পূর্ণ প্রতীতিরই একটী অসম্যক্ আবির্ভাব-বিশেষ।

যতদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা-
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোহস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ॥

তত্ত্ববাদ—ওঁ তৎ সৎ বিচারে প্রকটিত। মায়াবাদ—তত্ত্বেতর প্রতীতিতে উদ্ভূত।

কিছুদিন পূর্বে বৌদ্ধগণকে মায়াবাদী বলা হত। আর তার পর যারা শ্রুতির অর্থ বিপর্যয় করে ব্রহ্মে মায়া-মিশ্রিত-ভাব আরোপ করত, তাদিগকে মায়াবাদী বা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলা হয়েছে।

মায়াবাদমতান্ধকারমুষিত-প্রজ্ঞোঽসি যস্মাদহং
ব্রহ্মাস্মীতি বচো মুহুর্বদসি রে জীব ত্বমুন্মত্তবৎ।
ঐশ্বর্যং তব কুত্র কুত্র বিভুতা সর্বজ্ঞতা কুত্র তে
তন্মেরোরিব সর্ষপেণ হি তুলা জীব ত্বয়া ব্রহ্মণঃ॥

হে জীব, মায়াবাদ-মতবাদরূপ অন্ধকারের দ্বারা তোমার প্রজ্ঞা অপহৃত হয়েছে। সেজন্যই তুমি উন্মত্তের ন্যায় মুহুর্মুহু 'আমি ব্রহ্ম' —একথা বলছ। দেখ, তোমার ঐশ্বর্য, বিভূতা ও সর্বজ্ঞতা কোথায়? হে জীব, সর্ষপের সঙ্গে যেরূপ সুমেরুর তুলনা, তোমার সঙ্গেও সেরূপ ব্রহ্মের তুলনা।

আমরা কেবল চেতনের—তত্ত্ববস্তুর জিজ্ঞাসা চাই—কোনরূপ মনঃ-কল্পিত একদেশ বিচার চাই না।

পরিকর জিজ্ঞাসা—অবিকৃত অমিশ্র চেতনে প্রবিষ্ট হয়ে কিরূপে বিলাসে অবস্থিতি হয়, তার জিজ্ঞাসা।

অনাত্মভেদ—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ॥

—এই বিচারে প্রতিষ্ঠিত—এখানে পঞ্চভেদের বিচার আলোচ্য। নিঃশক্তিক ও সশক্তিক—ভগবান্—সশক্তিক। ভগবদ্বস্তুকে মিশ্রবোধ করে যে বিচার-ভ্রান্তিতে ব্রহ্মবিচার, উহাই নিঃশক্তিক বিচার। অপরিবর্তিত শক্তি—অন্তরঙ্গা শক্তি—বৈকুণ্ঠ-বস্তু। আর বহিরঙ্গা শক্তিজাত বস্তু—মায়িক। "মীয়তেঽনয়া ইতি মায়া"। স্বরূপ-নির্ণয় সত্য জ্ঞানকে বিপন্ন করে, তা হতে মুক্ত হয়ে যে বিচার, তাই স্বরূপ-নির্ণায়ক বিচার। স্বরূপের বিকৃত অবস্থা আমাদের নিত্যত্বের, চেতনত্বের ও আনন্দের ব্যাঘাতকারক। স্বরূপের দাস্য—ভগবদ্দাস্যময়। আর বিরূপের দাস্য—ভগবদ্দাস্য ব্যতীত অন্য চেষ্টাময়। কুকুরের চাকরকে লোকে 'মেথর' বলে। নশ্বর বস্তুর সেবায় আমাদের দিন দিন অমঙ্গল, দরিদ্রের সেবায় আমাদেরও দরিদ্রতা লাভ হয়, অতএব পূর্ণজ্ঞানের—পূর্ণসত্তার—পূর্ণ আনন্দের সেবা করাই মানবের একমাত্র স্বরূপের ধর্ম। পূর্ণ-জ্ঞানময়, পূর্ণ দয়াময়ের বিচারের বিরুদ্ধে চেষ্টা প্রশংসনীয় নহে।

লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।

তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্বতঃ স্যাৎ ॥ * (ভাঃ ১১।৯।২৯)

যে-কোন অবস্থা আমরা পাই, ইন্দ্রত্ব—অমরত্ব সব অবস্থায় প্রভুত্ব চলতে পারে—কোনটা সত্ত্বগুণ, কোনটা রজোগুণ, কোনটা তমোগুণের দ্বারা হতে পারে। কিন্তু কতদিন করতে পারব?

প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং
দেব্যা বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালম্।
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং
বৈতানিকে মহতি কর্মণি যুজ্যমানঃ ॥(১) (ভাঃ ৬।৩।২৫)

---

* অতএব বহুজন্মান্তর সংসারে ভাগ্যক্রমে পুরুষার্থ-সাধক, সুদুর্লভ এই অনিত্য মানবদেহ লাভ করিয়া যে-পর্যন্ত এই মৃত্যুশীল দেহের পতন না ঘটে; তাবৎকাল পর্যন্ত বিবেকী পুরুষ সত্বর নিশ্রেয়োলাভের জন্য নিরন্তর যত্নশীল হইবেন; বিষয়ভোগ অন্যান্য নিকৃষ্ট প্রাণীর শরীরেও সম্ভবপর হইয়া থাকে, কিন্তু পরমার্থলাভ অন্যদেহে সম্ভবপর নহে।

(১) (নাম—সঙ্কীর্তনাদির দ্বারাই যদি মুক্তি সুলভা হয়, তবে বিদ্বদগণ কর্ম-যোগাদির উপদেশ করেন কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—) ভাগবত-ধর্ম-তত্ত্ববেত্তা পূর্বোক্ত দ্বাদশ মহাজন ব্যতীত যাজ্ঞবল্ক্য-জৈমিনী প্রভৃতি অন্যান্য ধর্মশাস্ত্র-প্রণেতৃগণের মতি প্রায়ই দৈবী মায়ায় অতিশয় বিমোহিতা হওয়ায়, তাঁহারা এই নাম-সঙ্কীর্তনরূপ পরম ভাগবত ধর্ম জানিতে পারেন নাই। তাঁহাদের চিত্ত ঋক, যজুঃ ও সাম—এই ত্রয়ীর অর্থবাদাদি-দ্বারা মনোহরবাক্যেই জড়ীভূত; তাই, তাঁহারা দ্রব্য, অনুষ্ঠান ও মন্ত্রাদি-দ্বারা বিস্তৃত বহুকষ্টসাধ্য দর্শপৌর্ণমাসী প্রভৃতি তুচ্ছ অনিত্য-ফলপ্রদ কর্মযজ্ঞেই প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং সুখসাধ্য অথচ চতুর্বর্গধিকারী পরমার্থফলপ্রদ নাম-কীর্তনাদিতে রত হন নাই।

যিনি আমাদিগকে জড়ানুভূতিতে রেখে কাম্য কর্মের উপদেশ করেন, তিনি 'মহাজন' নন। কতক্ষণের জন্য কতদূর কর্মফল লাভ হবে? আমাদিগকে বেশ লাড্ডু দেখিয়ে ইতর বস্তুর সেবায় নিযুক্ত করে। আমরা আর জন্মজন্মান্তর এরূপভাবে সময় নষ্ট করব না। মূর্খলোক তাৎকালিক কথায় আবদ্ধ থাকে—পূর্ণচেতনের কথা না শোনা পর্যন্ত তারা নিজ নিজ ক্ষুদ্র অধিকারের কথায় ব্যাপৃত থাকে। কিন্তু পারমার্থিকগণ,—

স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্তিতঃ।
বিপর্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষ নিশ্চয়ঃ॥ (২) (ভাঃ ১১।২১।২)

—এই শ্লোকের বহুমানন করেন।

উচ্চ অধিকারের নিন্দা বা তাতে উদাসীন হওয়া বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে।

ন ময্যেকান্তভক্তানাং গুণদোষোদ্ভবা গুণাঃ।
সাধূনাং সমচিত্তানাং বুদ্ধেঃ পরমুপেয়ুষাম॥ (৩) (ভাঃ ১১।২০।৩৬)

যাঁরা সর্বক্ষণ ভগবৎসেবা করেন, তাঁদের বাক্য সর্বতোভাবে শ্রোতব্য। সুতরাং বহু জন্মজন্মান্তরের পরে মানবজন্ম পেয়ে মানবকে আক্রমণ বা হিংসা করা উচিত নয়। মানবজন্মের একমাত্র সার্থকতা যে হরিভজন, সেই হরিভজনে অন্যাভিলাষ-কর্ম-জ্ঞান-যোগাদির চেষ্টাদ্বারা যে বাধাপ্রদান, তাই মানবের প্রতি অত্যন্ত ক্রূরজাতীয় হিংসা; ঐ হিংসার

---

(২) নিজ নিজ অধিকারে অবস্থানই গুণ এবং তাহার বিপর্যয়ই দোষ, গুণদোষের এইরূপ নির্দ্ধারণ অবগত হইবে।

(৩) রাগাদিরহিত, সর্বত্র সমবুদ্ধিসম্পন্ন এবং বুদ্ধির অতীত ভগবদ্বস্তু-প্রাপ্ত মদীয় একান্ত ভক্তগণের বিহিত বা নিষিদ্ধ কর্মজন্য পুণ্য বা পাপের সম্ভব হয় না।

মূল্য বেশী নেই। আমাদের চিদচিদ্ বিবেক আছে, তথাপি যদি আমরা পশুভাবের সহিত আমাদিগকে এক মনে করি, তবে আমাদিগকে কেউ প্রশংসা করবেন না।

অদ্য আলোচনার কথা ছিল—"উপাস্য-বিচার"। যা ধ্বংসশীল, যা নিত্য নয়, যা কেবল চিৎ নয়, তার প্রতি আমাদের সেবাবৃত্তি প্রযুক্ত হলে আমরা বড় ক্ষতিগ্রস্ত হব।

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভূজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়ানাং তথৈব সর্বার্হণমচ্যুতেজ্যা ॥*

(ভাঃ ৪।৩১।১৪)

যিনি অচ্যুত, তাঁর সেবাই কর্তব্য। আত্মবিষয়ই আলোচ্য। যদি তা না হয়, তবে আমাদের অমঙ্গল নিশ্চয়।

মানুষমাত্রেই নিত্যকালই উপাসক—কেবল নিষ্ক্রিয় নহে। উপাসনার বস্তু—চিরস্থায়ী, নিত্য চিন্ময়, নিত্য আনন্দময় কি না জানবার যোগ্যতা আমাদের আছে। আমরা সংশয় নিবৃত্ত করতে পারি, আমরা নির্বুদ্ধির নিকট পরামর্শ চাই না, পারমার্থিকের নিকট শ্রেয়ঃ চাই।

যেরূপ বৃক্ষের মূলদেশে সুষ্ঠুভাবে জলসেচন করিলেই উহার স্কন্ধ শাখা, উপশাখা, পত্রপুষ্পাদি সকলেই সঞ্জীবিত হয়, প্রাণে আহার্য প্রদান করিলে, যেরূপ সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই তৃপ্তি সাধিত হয়, তদ্রূপ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের পূজা-দ্বারাই নিখিল দেব-পিত্রাদির পূজা হইয়া থাকে। তাঁহাদের আর পৃথক পৃথক আরাধনার অপেক্ষা করে না।

উপাস্য-বিচার

স্থান—শ্রীধাম মায়াপুর, 'অবিদ্যাহরণ'-শ্রবণসদন।

সময়—২৫শে মাঘ (১৩৩৭), রবিবার, প্রাতঃ ১০ ঘটিকা

আমরা নিদ্রালস্যহত দুর্বল জীব, শরীরের বিক্লবতা উপস্থিত হওয়ায় গতকল্য বিশ্রাম দিয়েছি। কাল আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা কীর্তন করছিলাম। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদের অজ্ঞানবিধ্বংসী, আলোক-প্রদানকারী ও সর্বতোভাবে আমাদের আত্মমঙ্গলের সাহায্যকারী। সেই গুরুপাদপদ্মের সাহায্য নিয়ে যদি আমরা আত্মভোগ চরিতার্থ করবার ইচ্ছা পোষণ করি, তা হলে গুরুপাদপদ্মকে ভৃত্যত্বে পরিণত করবারই চেষ্টা হয়। সেইজন্য অপস্বার্থপর অন্যাভিলাষ, কর্মবাদ, নির্ভেদ-জ্ঞানবাদ প্রভৃতির মধ্যে শ্রীগুরুপাদপদ্ম থাকতে পারেন না; একমাত্র ভক্তিরাজ্যেই গুরুপাদপদ্ম সেবিত হতে পারেন। অন্যাভিলাষীর গুরু, কর্মীর গুরু, নির্ভেদজ্ঞানীর গুরু—অনিত্য গুরুমাত্র; তাঁদের গুরুত্ব নেই—তাঁরা শিষ্যের ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানেরই কিঙ্কর। সেতার শিক্ষা, তবলা শিক্ষা প্রভৃতির জন্য যে কোনও ব্যক্তিবিশেষকে সামান্য গৌরব প্রদত্ত হয়, তাতে প্রকৃত গুরুপদ নির্দিষ্ট হয় না। কর্মী, জ্ঞানী, যোগী, অভক্ত কখনই গুরু হতে পারে না—"সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ"। যিনি পরিপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণবস্তুকে সর্বতোভাবে সংগ্রহ করতে না পেরেছেন, তিনি কিরূপে অপরকে সাহায্য করবেন? তাঁর যে সামান্য পুঁজিপাটা, তা হতে একটুকু দিতে গেলেই স্বার্থহানি হয় এবং সঞ্চিত দ্রব্য ক্ষয় হয়ে যায়। মহান্তগুরু-নির্বাচনের একটা প্রধান বিষয়—অন্যাভিলাষ, কর্ম, জ্ঞান হতে পৃথক হওয়া আবশ্যক। তদন্তর্ভুক্ত থাকলে ধর্ম, অর্থ,

কাম—এই ত্রিবর্গের তাড়নায় আধ্যাত্মিক হয়ে পড়ব। আপবর্গিক ধর্মের অপব্যবহারে যে মুক্তিপথে চালিত হবার কথা উপস্থিত হয়, তাতে আমাদিগকে আচ্ছন্ন না করুক।

বর্তমান বিপন্ন মানবজাতির একমাত্র মঙ্গলময় কৃত্য হচ্ছে,—এই যে সংসার, এই যে বোকামির হাতে পড়েছি, তা হতে উদ্ধার লাভ করে নিত্য কৃষ্ণসংসারে প্রবিষ্ট হওয়া। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করলেই সেই বোকামির হাত হতে উদ্ধার-লাভ হয়—অন্য উপায়ে হয় না। সেই গুরু কি অন্যাভিলাষী হতে পারেন? —সেই গুরুপাদপদ্ম কি অনিত্য কর্মফলবাধ্য কর্মী জীব হতে পারেন?—সেই গুরুদেব কি ছলনাময় প্রচ্ছন্ন নাস্তিক নির্ভেদজ্ঞানী হতে পারেন?—সেই গুরু কি অভক্ত, অনিত্য যোগী হতে পারেন? সমগ্র ভগবানে সর্বতোভাবে ভক্তিবিশিষ্ট না হলে কি কেহ গুরু হতে পারেন?

জড় জগতের অন্যান্য কথায় প্রবিষ্ট হলে আমরা তাতে ভোগ্যবুদ্ধি করায় ভোগিরূপে ভোগে আচ্ছন্ন হয়ে যাই। জড়জগতে আচ্ছন্ন হওয়ার কার্য বা জড় জগৎকে ক্রোধভরে তিরস্কার মাত্র করে অন্যপ্রকার কৃষ্ণ-বিমুখতা-অর্জন-কার্যকেও গুরুর কার্য বলা যেতে পারে না। ঐ সকল অভক্তির পথ। এই ভক্তির কথা সর্বতোভাবে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল,—

"কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্মো যস্যাং মদাত্মকঃ॥" * (ভাঃ ১১।১৪।৩)

ভক্তিবাণী কালে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। বহির্জগতের নানাপ্রকার ইন্দ্রিয়-তাড়নায় জীবজগৎ কৃষ্ণ বিস্মৃত হয়েছে। আমরা নানাপ্রকার

---

* (শ্রীভগবান্ বলিলেন,—)যে বেদবাক্যে মদীয় স্বরূপভূত ধর্ম বর্ণিত রহিয়াছে, তাহা কালপ্রভাবে প্রলয়ে অদৃশ্য হইলে সৃষ্টির প্রারম্ভে আমি ব্রহ্মাকে ইহার উপদেশ প্রদান করিয়াছিলাম।

স্বিরূপে—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপস্বার্থে আচ্ছন্ন হয়ে যন্ত্রনার পথে ধাবিত হই, আর তাকেই বলি কর্মের সিদ্ধি, জ্ঞানের সিদ্ধি; কোন কোন লোক আবার কপটতা করে তাকেই বলে ভক্তি! অক্ষজ পদার্থের প্রতি প্রভুত্ব—ভক্তি নয়, জুয়াচুরি বা আত্মবঞ্চনা মাত্র। এই অভক্তির পথ হতে জীবকুলকে রক্ষা করবার জন্য শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। শুদ্ধ আচার্যগণ যত্ন করেছিলেন—সেই শ্রীমদ্ভাগবতধর্মের বীজ রোপণ করতে। কিন্তু আমাদের উষর-ক্ষেত্রে আমরা তা রক্ষা করতে পারি নি। কি-ভাবে সুষ্ঠুরূপে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে হয়, তা ভাগবতধর্মেই অকৃত্রিমরূপে প্রদর্শিত হয়েছে। শ্রীগৌরসুন্দর তাহা স্বয়ং আচরণ করে জানিয়ে দিয়েছেন। সেই শ্রীগৌরসুন্দরই পরম উপাস্য বস্তু—জগতের সকলেরই শেষ উপাস্য বস্তু—জগতে যত উপাস্য বস্তু আছে, সেই সকল উপাস্য বস্তুরও পরম উপাস্য বস্তু।

শ্রীগৌরসুন্দর—জগদগুরু। অবশ্য আমাদের অনর্থযুক্ত অবস্থায় জগদ্‌-গুরু শ্রীনিত্যানন্দ—যা হতে বৈকুণ্ঠে মহাসঙ্কর্ষণ, কারণবারিতে প্রকৃতির ঈক্ষণকর্তা কারণার্ণবশায়ী, গর্ভবারিতে ব্রহ্মার পিতা গর্ভোদকশায়ী, ক্ষীরবারিতে ব্যষ্টি-বিষ্ণু ক্ষীরোদকশায়ী ও পাতালে অনন্তদেব শেষ-বিষ্ণু প্রকাশিত। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কথার আলোচনায় আর একটি পুরুষের কথা বলা হয়। তিনি পুরুষমাত্র নহেন—তিনি শ্রীল পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য—মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ বলে শ্রীল স্বরূপ দামোদর—যা হতে জগতে গৌড়ীয়গণ প্রকাশিত হয়েছেন। সেই দামোদর স্বরূপের পরম প্রিয় শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু—যা হতে শ্রীরূপানুগ গৌড়ীয়-সম্প্রদায়। সেই রূপ-প্রভুর অনুগত শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু। তাঁর অনুগত শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু। তদনুগত শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর। তাঁর অনুগবর্য শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর। শ্রীল চক্রবর্তীর অনুগত শ্রীল

বলদেব বিদ্যাভূষণ। তদনুগত শ্রীল জগন্নাথ, তদনুগত শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও তাঁর অভিন্ন সুহৃৎ ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ গৌরকিশোর। আমরা আমাদের বর্তমানকালেই সেই শ্রীস্বরূপ-রূপানুগবরগণের দর্শন ও কথা শুনবার সৌভাগ্য পেয়েছিলাম। এই ধারায় যে জিনিষ এসেছে, তাতে মহাপ্রভুর কথা অবিমিশ্রভাবে শুনেছি। অন্যে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুকে যে সম্মান করে থাকেন তা মৌখিক। স্ব-স্ব ইন্দ্রিয়-বৃত্তির চরিতার্থ করবার বৃত্তিদ্বারা পরিচালিত হয়ে যে আচার্য-সম্মান-প্রদর্শনের অভিনয়, তাহা কপটতা মাত্র। কিন্তু আমরা যে অকৃত্রিম অবিমিশ্রধারার কথা বললাম, তা সকল কপটতার আবরণ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন—সকল সত্য কথা জানিয়ে দিয়েছেন। এই সকল কথার বিরোধ করেন যাঁরা তাঁদিগকে দূর হতে দণ্ডবৎ করি। কিন্তু জগৎ এই সকল কথায় প্রতারিত হচ্ছে; তা হতে উদ্ধার করবার জন্য যাঁদের হৃদয় অকৃত্রিমভাবে ক্রন্দন করেছিল, তাঁরাই জগতে শুদ্ধভক্তির প্রচারের অভাব বোধ করেছেন। সেই অভাব পূরণ করবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দর যাঁদিগকে মহান্তরূপে প্রেরণ করেছেন, তাঁরাই আমাদের নিত্য আদরের বস্তু।

মিছাভক্ত-সম্প্রদায় সুষ্ঠুভাবে গুরুপাদপদ্ম-সেবা হতে বিচ্যুত হয়ে অন্য ব্যাপারকে গুরুসেবা মনে করেছিল—শুদ্ধভক্তগণকে আক্রমণ করছিল; তদ্দ্বারা জগজ্জীবের মহা অমঙ্গল প্রসব করছিল। শুদ্ধভক্তির কথাটী আমরা পাই নি—শুদ্ধভক্তির কথা লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। বহির্জগতের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শের বিচারে যে মায়াবাদি-সম্প্রদায় আপনাদিগকে ভক্ত অভিমান করে অভক্তির প্রশ্রয় দিয়েছেন, তা যে ভক্তি নহে, তা যতদিন মানবজাতিকে বুঝান না যায়, ততদিন মানবজাতির মঙ্গল হবে না। জগৎকে এই বিরাট বিদ্ধ ধারণা হতে

মুক্ত করবার জন্য আম্নায়-পারম্পর্যে শ্রীল জগন্নাথ হতে শুদ্ধভক্তির কথা বর্তমান-যুগে অবতরণ করেছেন। যিনি বর্তমান জগৎকে সেই শুদ্ধভক্তির কথা এবং শ্রীগুরুধারা প্রচুররূপে জানবার সুযোগ দিয়েছেন, সেই ঠাকুর ভক্তিবিনোদই আমাদের আশ্রয়স্থল।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভক্তিতেই 'প্রেয়োবুদ্ধি'। ভক্তিটীই 'শ্রেয়ঃ'—এই কথাটী পূর্ব পূর্ব আচার্যগণ বলেছেন। ভক্তিটীই 'প্রেয়ঃ'—এই কথা শ্রীরূপানুগবর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর জগৎকে বিশেষরূপে জানিয়েছেন। যাঁদের প্রেয়োবিচারে ভক্তি নেই, তাঁরাই শ্রেয়োহীন হরি-বিমুখ অবৈষ্ণব। মানবজাতির অন্যাভিলাষ, কর্ম ও জ্ঞানে প্রেয়োবুদ্ধি বা ইন্দ্রিয়তর্পণে বিনোদন; কিন্তু ভগবদ্ভক্তিতে যাঁর প্রেয়োবুদ্ধি বা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণে যাঁর একমাত্র বিনোদ, তিনি শ্রীজগন্নাথ-বস্তুর সেবকোত্তম, সমগ্র জগতের প্রভু, বিষয়াশ্রয়বিগ্রহ জগন্নাথের অভিন্ন-বিগ্রহ।

ভগবদ্ভক্তিই পরমধর্ম; সেই ভক্তিটী কি জিনিষ,—প্রাকৃত প্রেয়ঃ-পথাবলম্বী তা বুঝতে পারে না। যাঁদের স্বরূপে অবস্থিতি নেই, যাঁরা পারমহংস্য-ধর্মে অবস্থিত হননি অর্থাৎ যাঁরা ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রাদি বর্ণ-বিচারে, ব্রহ্মচর্য-গার্হস্থ-বানপ্রস্থ-সন্ন্যাসাদি আশ্রম-বিচারে, ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষ-পুরুষার্থ-বিচারে অবস্থিত আছেন, তাঁরা বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবা-বঞ্চিত হয়ে পরম-মুক্ত-বিচারে অবস্থিত নহেন। "মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ"। অন্যথারূপে অবস্থিতিকালেই মনুষ্যে কৃষ্ণেতররূপ-দর্শন-স্পৃহা উদিত হয়। প্রেয়ঃ-পথে চালিত হয়ে শ্রেয়োজ্ঞান বলে যা উদিত হয়, তা শ্রেয়ঃ নহে, উহা মোক্ষাদি নিজ-লাভেচ্ছার প্রকারভেদে প্রাকৃত প্রেয়েরই প্রকার-বিশেষ। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ অহৈতুকী ভক্তিকেই নিজ-প্রেয়ঃ জানিয়া একমাত্র শ্রেয়ঃপথ-জ্ঞানে বিচরণ করবার উপদেশ জগৎকে দিয়েছেন।

বেদে অর্থাৎ পাণ্ডিত্যে বা ব্রহ্মে যিনি বিচরণ করেন, তিনি ব্রহ্মচারী। যদি পাণ্ডিত্যের উপদিষ্ট বস্তু ভগবদ্ভক্তি না হয়, তা হলে অন্ধ হয়ে তাদৃশ বিচরণের পথ স্বরূপোদ্বোধক ব্রহ্মচর্য নহে; সেরূপ ব্রহ্মচর্য হতে বিচ্যুতি অবশ্যম্ভাবী। স্বরূপে ব্যবস্থিতি হচ্ছে—অন্যথা-রূপের পরিত্যাগ। বর্তমানে "আমি স্থূষ্ট প্রাকৃত পুরুষ, আমি প্রাকৃত স্ত্রী"—মানব জাতিকে এই দুর্বুদ্ধি আক্রমণ করেছে; এরূপ দুর্বুদ্ধিযুক্ত 'অহং-মম'-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের মুখে হরিনাম কীর্তিত হন না, ইহা বুঝিয়ে না দিলে জীবের প্রকৃত মঙ্গল হবে না—জীবকুল বঞ্চিত হবে—অভক্তি প্রেয়ঃ-পথকেই 'শ্রেয়ঃপথ' মনে করে অসুবিধায় পতিত হয়ে থাকবে। "তোমার প্রেঃয়পথ একটা, আমার প্রেয়ঃপথ আর একটা"—এরূপ অভক্তি-বিনোদন চেষ্টা হতে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর জীবকুলকে রক্ষা করেছেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ আংশিক বস্তুর বিনোদ—অভক্তির বিনোদের কথা জগতে প্রচার করেন নি। "তোমার বিনোদন-যোগ্য-ব্যাপার 'ভক্তি' থাকে থাকুক, আমার বিনোদন-কার্যের বস্তু—অভক্তি"—এরূপ বিচারে যারা ধাবিত হয়, সেই সকল চিজ্জড়-সমন্বয়বাদীর বিচারও ভক্তি-বিনোদের বিচার নহে। অভক্তি ও ভক্তি কখনই এক নহে, কৃষ্ণ ও মায়ার বিনোদ—এক বস্তু নহে। ভক্তির পূর্ণ বিনোদন ব্যতীত ভক্তিবিনোদের অন্য কোন বৃত্তিতে প্রীতি নেই।

আমরা নানাবিধভাবে জগতের বস্তু-সমূহের দ্বারা বঞ্চিত হলে, স্বরূপ-বিভ্রান্ত হলে, যখন দুর্বুদ্ধি-যুক্ত হই, তখন শ্রীগুরু-পূজা কৃপা-পূর্বক প্রকটিত হন। আমার ন্যায় নগণ্য লঘুবস্তু যে মহদ্‌বস্তু—গুরুবস্তু হতে কৃপা লাভ করে, সেই গুরুপাদপদ্মের পূজাই আমাদের নিত্যকৃত্য। ব্যাসের গণ যে গুরু-পূজা করেন, সেই গুরু-পূজার মন্ত্র—"সত্যং পরং ধীমহি"।

যত রথো লোক রথ দেখতে আসে। কেউ কলা বেচতে এসে, রথও দেখছে মনে করে। ঐরূপ রথো লোক প্রকৃত প্রস্তাবে রথ দেখতে আসে না—কলা বেয়ে যায়—বঞ্চিত হয়ে যায়—স্ব-স্ব প্রেয়ঃ-সাধনকেই "রথ দেখা" মনে করে। কিন্তু "রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।" রথে বামন দর্শন করা চাই—বলির ন্যায় আত্ম-বলি অর্থাৎ আত্মসমর্পণ করা চাই। শুক্রাচার্যের শিষ্যগণ এসে বাধা দিবে; কিন্তু গুরুকৃপা-বলে—বলদেবের বলে বলী হয়ে আত্মবলি দিতে হবে—সর্বস্ব সমর্পণ করতে হবে, তবে বামনের কৃপা লাভ হবে—বামন দর্শন হবে।

"কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।

দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাৎ॥" * (ভাঃ ১২।৩।৫২)

হরির কীর্তন হলে সমস্ত কার্য সুষ্ঠুভাবে সাধিত হয়। সত্যযুগে ধ্যানের কথা বর্ণিত আছে। বর্তমান কলিকালে বিক্ষিপ্ত মনে ধ্যানের কথা পালিত হতে পারে না। এজন্য মহাধ্যানের কথা বর্ণিত হয়েছে। হরি কীর্তন—মহাধ্যান। কৃতযুগে স্বল্প ধ্যানের কথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু তাতে ঔদার্যবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন হত না; এজন্য কলিকালে মহাধ্যান। ধ্যানে দোষ প্রবেশ করেছিল বলে ত্রেতায় যজ্ঞ প্রবর্তিত হয়েছিল। এজন্য কলিতে মহাযজ্ঞ সঙ্কীর্তনের বিধি। যজ্ঞে দোষ আরোপিত হওয়ায় দ্বাপরে অর্চন-বিধি প্রবর্তিত হল। কলিতে মহা-অর্চন-বিধি। মহা-অর্চন—শ্রীনাম-কীর্তন। সমস্ত চিকিৎসায় নিরাশ হয়ে অন্তিমকালে যেমন অত্যন্ত মুমূর্ষু রোগীকে বিষবড়ি খাইয়ে দেয়—তাতে খুব শক্তি (potency) আছে বলে,—সেরূপ কলিকালে জীবের

---

* সত্যযুগে বিষ্ণুকে ধ্যান করে, ত্রেতাযুগে যজ্ঞদ্বারা যজন করে এবং দ্বাপরযুগে অর্চনাদি করে যে ফল লাভ হত, কলিকালে হরিকীর্তন হতে সে সব ফল লাভ হয়।

দুর্দশার চরম দেখে শ্রীনাম-কীর্তনের ব্যবস্থা হয়েছে। শ্রীনাম-কীর্তনে সর্ব্বশক্তি সমর্পিত হয়েছে—সকল শক্তি পূর্ণমাত্রায় আছে। কীর্তনই—মহাধ্যান, মহাযজ্ঞ, মহার্চন। কৃষ্ণের ধ্যান, যজ্ঞ, অর্চন—সাধারণ মাত্র। কৃষ্ণকীর্তনরূপ মহাধ্যানে, মহাযজ্ঞে, মহার্চনে তত্তদ্বিষয়ের পরিপূর্ণতা। যখনই মানুষের বিচার এসে উপস্থিত হয় যে, সত্য হতে বিচ্যুত হয়েছি, তখনই যজ্ঞ করবার অবকাশ হয়। শ্রীনাম-ভজনেই মহার্চন, মহাযজ্ঞ, মহাধ্যান। মহাধ্যানে অন্য-মনস্ক হওয়া উচিত নয়। যখনই অন্যমনস্ক হব, তখন বলব,—সত্যযুগে ফিরে যাই, কিন্তু এখন যে কলিযুগ! সুমেধোগণ এই মহাধ্যান, মহাযজ্ঞ মহার্চন করেন, আর কুমেধোগণ অন্যান্য পথ স্বীকার করেন, তাতে তাঁদের মঙ্গল লাভ হয় না। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলেছেন,—

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।

যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥" ❀ (ভাঃ ১২।৫।৩২)

ত্রেতায় শ্রীরামচন্দ্রের উপাসকগণ যজ্ঞবিধিদ্বারা উপাসনা করতেন, তাঁরা বলছেন,—"শ্রীরামচন্দ্রকে সীতাদেবী যে-ভাবে উপাসনা করে-ছিলেন, সেই-ভাবে ত সেবা করতে পারি না।" কিন্তু এখানে একটুকু কথা হয়েছে, শ্রীমদ্ভাগবত বলছেন—'সুমেধসঃ'। 'সুমেধস্'-শব্দ বহুবচনে প্রযুক্ত হয়েছে। এক সীতাদেবী যদি বহু সীতাদেবী হয়ে সেবা করেন, তবে সীতা ও রাম—উভয়েই অসন্তুষ্ট হবেন; কারণ, শ্রীরামচন্দ্র—একপত্নীব্রতধর, আর সীতাদেবী—একপতিব্রতধরা। কিন্তু—

❀ যাঁহার মুখে সর্বদা কৃষ্ণ-বর্ণ, যাঁহার কান্তি অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌর, সেই অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্ষদ-পরিবেষ্টিত মহাপুরুষকে সুবুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ সঙ্কীর্তনপ্রায় যজ্ঞদ্বারা যজন করে থাকেন।

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥"

নাম-মহাযজ্ঞের দ্বারা যে পূর্ণ বস্তুর উপাসনা, তাতে অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র এবং পার্ষদের নিত্য অবস্থান বিশেষরূপে বিবেচ্য। তাঁদের অনুগত হয়ে সুমেধোগণ নাম-সঙ্কীর্তন করে থাকেন—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবের অনুগত হয়ে তাঁরই পশ্চাদ্‌ভাগে অবস্থান করে নামযজ্ঞ করে থাকেন। যাঁরা গৌরবিহিত কীর্তন পরিত্যাগ করে অন্য প্রকারে কীর্ত্তন করেন, তারা অচৈতন্যাশ্রিতজন। সুতরাং জগদ্‌গুরু শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর আনুগত্যে যে-সকল বিচার উপস্থিত হয়েছে, তা অবলম্বন করে অগ্রসর হওয়া আবশ্যক। গুরুসেবা প্রধান কর্তব্য। আম্নায়-বেদ্য জিনিষটি বিমুখ কর্ণ দিয়ে শ্রবণ করা যায় না। গুরুদেবের শব্দ সেবোন্মুখ কর্ণে পৌঁছিলে—কর্ণবেধ হলে চক্ষুর অজ্ঞান-তিমির বিদূরিত হয়; তখন চক্ষু নির্মল হয় এবং সেই নির্মল চক্ষুতে কৃষ্ণদর্শন হয়ে থাকে।

জগজ্জঞ্জাল-দ্বারা শুদ্ধভক্তির স্রোত জগতে রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। ভক্তিতেই একমাত্র প্রেয়োবুদ্ধি যাঁর, সেই শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শুদ্ধ-ভক্তি প্রবাহ পুনরায় প্রবাহিত করেছেন। সেই ভক্তিবিনোদ প্রভুর শুদ্ধ-ভক্তির কথায় যিনি একমাত্র আদর করেন, তিনিই আমার শ্রীগুরুদেব, আর, যাঁরা আদর করেন তাঁরাও আমার গুরুবর্গ।

যাঁরা বিধর্মের (দেহধর্ম, মনোধর্ম বা কর্মরাজ্যের বিচারযুক্ত ভোগময় ধর্মের) বশীভূত হয়ে না বুঝতে পেরে জড় জগতের পদার্থজ্ঞানে তাঁকে ভোগ্য বলে বিচার করেন, তাঁদের হত আমাদের কোন সম্বন্ধ নেই। ভক্তিবিনোদ-বিরোধী জড়েন্দ্রিয়-ভোগীর দুর্মুখ যেন কোনদিন আমাদের দর্শন করতে না হয়। যিনি ভক্তিকেই একমাত্র প্রেয়ঃপথ মনে করেন, আমরা

একমাত্র সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মেরই আশ্রিত। আপনারা আজ একজন নগণ্য ব্যক্তিকে—অবিবেচক ব্যক্তিকে 'গুরু' বলে স্বীকার করে যে সকল অর্ঘ্য প্রদান করেছেন, সেই সকল অর্ঘ্য আমার শ্রীগুরুদেবতত্ত্বেরই প্রাপ্য-বস্তু। আমি ঐগুলি হরণ না করে, তাঁর প্রাপ্যবস্তু তাঁর নিকট পৌছিয়ে দিলাম। আমার কিছু নেই ; কিছু রাখলে গুরুসেবক বা কৃষ্ণদাস্য হতে বঞ্চিত হব, জেনেছি।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥

শ্রীহরিনাম কি ?

[দার্জিলিংএ ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ৯ই মে, দুইজন ইসলামধর্মাবলম্বী ভদ্রলোকের 'শ্রীহরিনাম কি ?' প্রশ্নের উত্তরে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথার মর্ম।]

পরমেশ্বরের যাবতীয় ঈশিত্ব শ্রীহরিনামে বিদ্যমান। শ্রীহরিনাম সমস্ত অচেতনের অচেতনত্ব হরণ করেন, শ্রীহরিনাম সর্বত্র পরিব্যাপ্ত ; সেই জন্যই শ্রীহরি 'বিষ্ণু'-নামে কথিত। কর্মকোলাহলময় জগতে বিপদাপদ্ নিবারণ-কল্পে যে সকল হরিকীর্তনের আবাহন দেখা যায়, উহা বাস্তব শ্রীহরিনাম না হওয়ায় জীবের কোন প্রকার সুবিধা হইতেছে না—শ্রীহরিনামে রুচি উৎপন্ন হইতেছে না। বাস্তব-হরিনাম-কীর্তন-কারীর বড়ই দুর্ভিক্ষ। অবশ্য যাঁরা শ্রীহরিকৃপা-প্রাপ্তির আশায় হরিকীর্তন করেন না, তাঁহাদিগের জন্য এই সকল জাগতিক ব্যাপার-বিমিশ্রিত হরিকীর্তনের ছল থাকে থাকুক, তাহার স্বপক্ষে বিপক্ষে বলবার কিছু নেই, কিন্তু যাঁরা প্রকৃতপক্ষে শ্রীহরিপাদপদ্ম-সেবাভিলাষী, তাঁরা বাস্তব কীর্তনকারীর নিকটে শ্রীহরিকীর্তন শ্রবণ করুন।

দার্জিলিং শৈলে শ্রীল প্রভুপাদ

বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্ব-প্রসঙ্গে হরিকথা

[১৩৩৮ বঙ্গাব্দের ২১শে বৈশাখ, ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মে তারিখে শ্রীল প্রভুপাদ দার্জিলিংএ উপস্থিত হয়ে এই দিবস সায়ংকালে 'লাউইস জুবিলি স্যানেটোরিয়ামে'র পরিচালক ও অধ্যক্ষ ডাঃ শিশিরকুমার পাল ও তাঁর কতিপয় বন্ধুর নিকটে বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় পরিপ্রশ্নের উত্তরে নিম্নলিখিত হরিকথা কীর্তন করেছিলেন।]

কার্য-কারণ অনুসন্ধান আমাদের অবশ্য কর্তব্যরূপে বর্তমানে উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু কার্য-কারণের অনুসন্ধান mediumএর (মাধ্যমের) অপেক্ষা করে। mediumদ্বারা শুদ্ধচেতন অভিঘাত-যোগ্য। দেহ ও দেহীর পার্থক্য উপলব্ধি করতে না পারায় এইরূপ কতকগুলি তথাকথিত কর্তব্য উপস্থিত হয়েছে।

আটটি প্রকৃতি ছাড়া আর একটি প্রকৃতি আছে, যার সংজ্ঞা 'জীব'। এই আটটির সঙ্গে meddle (সংশ্রব) করা জীবের কর্তব্য-রূপে নির্দিষ্ট হয় নাই। বহির্জগতের দর্শনে প্রবৃত্ত হলে অনেকগুলি কথা উপস্থিত হয়। সৃষ্টিতত্ত্বসম্বন্ধে প্রশ্ন তাদেরই অন্যতম।

ইহার অনেকগুলি উত্তরও সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত হয়েছে। কেহ কেহ বলেন, চেতন particular material conditions এর effect (নির্দিষ্ট জড়ীয় অবস্থাসমূহের ক্রিয়া)—'চেতন' বলে জড় হতে আলাদা কোন জিনিষের কল্পনা করবার আবশ্যক নেই। ইহা সাধারণ জড় বৈজ্ঞানিকদিগের ধারণার অনুরূপ কথা। তাঁরা বলেন, "যা বুঝতে (?) পেরেছি, তারই আলোচনা করা যাক।" এই মতের প্রতিবাদী চিন্মাত্র-

বাদী বলেন,—"চেতনই একমাত্র বস্তু। অচেতন অবস্তু বা অচেতনানুভূতিরূপ বিবর্ত সরিয়ে দিলে অমিশ্র-চেতনে পৌছান যায়। সুতরাং 'কেবল অচিৎ-মত' স্বীকার না করে 'কেবল-চেতন মত' স্বীকার করাই সঙ্গত।"সৃষ্টির সন্ধান করতে গিয়ে এইরূপ পরস্পর বিবদমান মতসমূহ সৃষ্ট হয়েছে।

এই সমুদয় আলোচনাকারীর ভূমিকাই বিবাদের কারণ। তাঁরা এক ভূমিকা হতে অন্য ভূমিকার বিচার করতে প্রবৃত্ত হওয়ায় এইরূপ অকৃতকার্য হতে বাধ্য হন। এখান থেকে (প্রত্যক্ষ জড়-ভূমিকা হতে)যাত্রা করার দরুণ তাঁদের বিচারে ভ্রম উপস্থিত হয়। এইজন্য শ্রৌতপথে এই সকল অভিজ্ঞতাবাদের ছলনাময়ী ধারণা ও কল্পনা স্বীকৃত হয় না। শ্রৌতপথের বিচার—সূর্যরশ্মির সাহায্যে সূর্যদর্শন করতে হবে। আমার অন্যরূপ বিচারদ্বারা সূর্য বিপর্যস্ত বা অন্য বস্তু হয়ে যাবে না, কিংবা কৃত্রিম আলোকসমূহের দ্বারাও বাস্তবসূর্য দর্শন হবে না। বাস্তব নিত্যবস্তুর অস্তিত্ব ও স্বাভাবিক স্বরূপের প্রতিদ্বন্দ্বী না হয়ে বস্তুর নিকটে উপনীত হবার চেষ্টা করতে হবে। আমার আবৃত স্বরূপের ধারণা-সম্বন্ধে খণ্ডত্ব বা অসম্পূর্ণত্বের আরোপ হতে পারে, কিন্তু পূর্ণ নিত্য বাস্তব-বস্তু-সম্বন্ধে তা হতে পারে না। যাঁর সাক্ষাৎ লাগ পাই না, তাঁর সম্বন্ধে তর্ক বৃথা। অভিজ্ঞতা বা আরোহচেষ্টার দ্বারা বস্তুদর্শনের প্রয়াসমুখে যে বিশেষ ধারণা, তা স্বভাবতঃই বিবাদময়ী ও বহু; কারণ তাতে non-deviating principle (বাস্তবসত্যে চ্যুতি-রহিত নিষ্ঠা) নেই।

কেবল অপ্রাকৃত শব্দাবতারের দ্বারাই তুরীয় এবং অনন্তমানের কথা এই তৃতীয়মানের রাজ্যে—সান্তজগতে আসতে পারে। সুদূরস্থ জিনিষ শব্দের সাহায্যে নিকটবর্তী হতে পারে; সে শব্দ যখন উপস্থিত

হয়, তখন অন্য কোন প্রকার চেষ্টা আমরা স্বীকার করি না। কি জিনিষ আসছে, তা না বুঝতে পারলে শুনবার দরকার নেই, এ কথা আমরা বলি না। যদি না শুনি, তা হলে এই স্থূলসূক্ষ্ম-প্রকৃতির মধ্যেই থাকা হয়ে যায়।

জড়ের নানাত্ব-বহুত্বের বিচারে কেবল কিংকর্তব্যবিমূঢ় হতে হবে। "ন তস্য কার্যং করণঞ্চ বিদ্যতে", "নিত্যো নিত্যানাং" প্রভৃতি শ্রুতি-মন্ত্রে "তস্য" একবচন। তিনি বহু নিত্য পদার্থের মধ্যে পরম নিত্য। তিনি বহু অনিত্য পদার্থের অন্যতম বা বহু নিত্য পদার্থের সহিত সমশ্রেণীভুক্ত নহেন। তিনিই একমাত্র অদ্বিতীয় পরম নিত্যবস্তু। "ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে"। তাঁর অধিক ত কেহ নাই-ই, তাঁর সমানও কেহই নেই। তিনি অদ্বয়বস্তু, তাঁরই অন্তর্ভুক্ত অন্য সকল জিনিষ। অর্থাৎ তিনি একমাত্র অদ্বিতীয় বস্তু হলেও তাঁর শক্তির বিচিত্রতা আছে। শ্রুতি বলছেন,—"শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে।" আমরা প্রপত্তিদ্বারা বহুত্ব হতে একমাত্র অসমোর্দ্ধ অদ্বয়বস্তুর অনুশীলন করি। সেই অনন্ত শক্তিমানের অনুশীলনবিচিত্রতা অদ্বয়জ্ঞানের অবিরোধী।

শক্তির মোটামুটি তিন ভাগ। অঙ্কের তিন ভাগ। অঙ্কের অন্তর্গত ১, ২, ৩; ইত্যাদি। অঙ্গের তিন ভাগের সংজ্ঞা—অন্তঃ অঙ্গ, বহিঃ অঙ্গ, তটাঙ্গ। এখন আমরা বহিরঙ্গের সংস্পর্শে আছি। অন্তরঙ্গ এখন পর্যন্ত আমাদের নিকট প্রকটিত হয় নি। বহিরঙ্গা শক্তিতে বহির্জগতের সৃষ্টি; বহিরঙ্গা-শক্তি-সৃষ্ট জগতে বিচিত্রতা দেখতে পাই। কিন্তু সেই বিচিত্রতা অদ্বয়ের বিরোধী, অনিত্য, হেয়, অনুপাদেয়, ছলনাময়। তাই বলে অন্তরঙ্গা-শক্তি-সৃষ্ট জগৎ বিচিত্রতা-বিহীন নহে। সেখানেই প্রকৃতপ্রস্তাবে অনন্ত, অফুরন্ত, পরমোপাদেয়, নিত্য বিচিত্রতা আছে। সেই বিচিত্রতা অদ্বয়জ্ঞানের সহিত সুসমন্বিত—অদ্বয়জ্ঞানের

পরিপোষক। সেখানকার বিচিত্রতা মানসিক গবেষণার দ্বারা কল্পিত নয়, অবাস্তব নয়, অনিত্য নয়। সেই অন্তরঙ্গা-শক্তি-সৃষ্ট নিত্য, অনন্ত বিচিত্রতারই খণ্ড, হেয়, বিকৃত, প্রতিফলিত প্রতিবিম্বই বহিরঙ্গা-শক্তি-সৃষ্ট জড়বিচিত্রতা।

বহির্জগতের সমুদয় বস্তু কার্য ও কারণজাতীয়। কার্য কারণে পর্যবসিত হওয়া—নির্বিশেষবিচার। এই সমুদয় কেবল 'অঘ', 'অসুবিধা'। কেবলমাত্র—"বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ।"

সাক্ষাৎ 'বৈকুণ্ঠ' শব্দ যখন সেবোন্মুখ কর্ণে অবতরণ করেন, তখন তিনি অনায়াসে সকল অঘ অপসারিত করে দেন। 'বৈকুণ্ঠ'-শব্দে শব্দ-শব্দীর মধ্যে ভেদ নেই। বৈকুণ্ঠ-শব্দের শব্দীর অভিজ্ঞানের জন্য অন্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্য-গ্রহণের আবশ্যকতা হয় না। 'পূর্ণ'শব্দ দ্বারা খণ্ডিত শব্দকে লক্ষ্য করতে বলা হচ্ছে না।

শ্রীচৈতন্যদেব বা ভগবদ্‌বস্তু আমাদের বর্তমান বিচারের ক্রীড়নক নহেন যে, তাঁকে যে কাতে রাখব, তিনি সেই কাতে থাকবেন। শ্রীচৈতন্য-দেবের মাতা-পিতা, জন্ম-তারিখ ইত্যাদি সম্বন্ধে যে-সকল কথা হচ্ছে, তা এই ভূমিকা হতে বলা হচ্ছে। যে ভূমিকা হতে বলা হচ্ছে, তার সঙ্গে চৈতন্যদেবের ভূমিকাকে গোলমাল বা একাকার করতে হবে না। তা হলে এক বুঝতে আর বুঝে ফেলা হবে। বর্তমানকালে প্রাকৃত-সহজিয়া-সমাজে যা হচ্ছে!

শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতির উৎপন্ন কোনও বস্তুবিশেষ নন। তিনি অধোক্ষজ বস্তু। তিনি আরোহবাদী বা অভিজ্ঞতাবাদীর জ্ঞান-গম্য নন—সর্বতোভাবে প্রপন্ন, শুদ্ধস্বরূপের নিকট স্বপ্রকাশিত।

শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীকৃষ্ণজ্ঞান প্রদান করেছেন। কৃষ্ণেতর দেবতার কথা—অচৈতন্য দেবতার কথা শ্রীচৈতন্যদেব বলেন নি। গয়ায় দীক্ষা-

লীলাভিনয়ের পরে শব্দমাত্রের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শ্রীচৈতন্যদেব বলেন যে, শব্দের 'কৃষ্ণ' ছাড়া ব্যাখ্যা নেই। শব্দের দ্বিবিধ দ্যোতক-বৃত্তি; এক প্রকার দ্যোতক-বৃত্তি কৃষ্ণকেই লক্ষ্য করে, অন্য প্রকার বৃত্তি অজ্ঞতা প্রসব করে অর্থাৎ শব্দের বাহ্য আবরণ প্রকাশ করে কৃষ্ণ হতে বিক্ষিপ্ত করে।

বৈকুণ্ঠনাম গ্রহণ করলে সব সুবিধা হবে। নচেৎ অভ্যুদয়বাদী কিংবা নির্বাণবাদী হয়ে যেতে হবে। দীক্ষাগ্রহণ জিনিষটা—নামগ্রহণ। শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়িতে দিব্যজ্ঞান লাভ। বহিরঙ্গা শক্তির বিক্রমরূপ অভিজ্ঞতা-প্রসূত বুদ্ধির দ্বারা শ্রীরাধাগোবিন্দের অপ্রাকৃত লীলাবিচাররূপ বিপৎপাত হতে শ্রীচৈতন্যদেব আমাদিগকে সাবধান করেছেন। তুমি বৈষ্ণব; কিন্তু তোমার ঐ বহির্মুখ-বিচারগ্রস্ত শরীরটা বৈষ্ণব নয়। তোমার ঐ শরীর যদি বৈষ্ণবের অকৃত্রিম সেবায় লাগাও, তা হলে ঐ শরীর শরীরীর তাৎপর্যের সহিত এক হয়ে যাবে।

প্রতিকূল অনুশীলন-দ্বারা অসুবিধা হয়ে যায়। কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-সেবা ব্যতীত কাহারও অন্য কোন কৃত্য নেই। জীব কৃষ্ণের দাস। যথেচ্ছাচারিতায় জীবনের ব্যবহার পাওয়া যায় না—জীবন্মৃত অবস্থামাত্র লাভ হয়। শুষ্কবৈরাগ্য কিছুক্ষণ পরে চেতনকে পর্যন্ত শুকিয়ে মেরে ফেলে! কর্মকাণ্ডে প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট ব্যক্তি মৃত; মরে যাওয়ার দরুণই অসৎ কার্যে প্রবৃত্তি, সত্য কথায় অমনোযোগিতা। যারা নিজেরাই recipient (গৃহীতা) হতে চাচ্ছে, তাদের জীবন কিছুক্ষণ পরে থেমে যাবে। তারা মৃতই আছে। বাস্তব-বেদ্যবস্তুর অনুশীলনে বঞ্চিত থাকাই মৃত-অবস্থা। যে জীব বহিরঙ্গা শক্তির অধীন হয়েছে, সে জীবিতম্মন্য হলেও 'জীব'-শব্দ-বাচ্য নহে। তার তথা-কথিত জীবন কর্ণধারহীন নৌকার ন্যায় ভেসে যাওয়া মাত্র। পুত্তলকে সকল লোকেই আক্রমণ করে। এইরূপ

ব্যক্তিগণ মৃত্যুর ভূমিকার উপর অস্বাভাবিকভাবে পরস্পর মারামারি করছে।

অমুক্তের কথার দ্বারা কখনও সত্য নিরূপিত হয় না। কেবল চেতনময় বস্তুর অনুসন্ধান ব্যতীত অন্য চেষ্টার দ্বারা বিপর্যস্ত ধারণামাত্র সম্ভব। নিত্যানিত্যবিবেক উদিত না হওয়ায় জীবের এইরূপ অমঙ্গল হচ্ছে। এজেন্ট মানবকে ফাঁকি দিচ্ছে। Phenomenal world-এ (জড়জগতে) meddle (সংশ্রব) করার জন্য মনকে Powers delegate (শক্তি প্রদান) করা হয়েছে। শারীরিক এবং মানসিক সম্পদে সমৃদ্ধ হবার চেষ্টা আত্মার ধর্ম নয়। জগতের বাদসা-গিরি, স্বর্গের ইন্দ্র-গিরি —কেবল মুখোস-পরা দুর্বুদ্ধিমাত্র—'মুখোস পরে অন্য ভূমিকায় থাকার বুদ্ধি'—যা ইন্দ্রিয়রুচিকর প্রত্যক্ষজ্ঞানে বুঝি, তার মধ্যে থাকার বুদ্ধি-মাত্র। কিন্তু তাতে থাকতে পারি না। অর্জিত বস্তু চলে যাচ্ছে। তেমন বস্তুসংগ্রহ করব, যেটা চলে যায় না।

জাগতিক অপূর্ণতা পরিত্যাগ করে নিজের বুদ্ধিতে পূর্ণতার পক্ষপাতী হবার পক্ষপাতিত্বও কল্পনাপ্রসূত ব্যাপার এবং আর একটি দুর্বুদ্ধি। ঘটাকাশ ভেঙ্গে ফেলে কি মহাকাশ হওয়া যায়?—উহা প্রলাপ মাত্র। খুব বেশী পরিমাণে অনূচানমানিতা বা আত্মম্ভরিতার দ্বারা যে সেই জিনিষের কাছে পৌঁছাব, ইহাও কল্পনা-স্রোতমাত্র। ইহা বহির্জগতের চিন্তাস্রোত।

কেহ নাক টিপে সমাধি (?) লাভ করে নিজের সুবিধা (?) করে নিলেই বা কি হল? তিনি আমার কি উপকার করলেন? তাঁর নিজেরই বা লাভ কি? "আপনি এখানে মাটি কাটবেন, আর আমি ব্রহ্ম (?) হয়ে যাব!"—এটা হচ্ছে অত্যন্ত হেয় রকমের অপস্বার্থপরতা। বর্তমান সুবিধা,

যা দ্বারা অন্যের অনিষ্ট হচ্ছে, তা আমার লভ্য হবে ! মুক্ত ব্যক্তি মুক্তিকামনা করেন না।

চৈতন্যচন্দ্রের কথা এই সব জাতীয় জাগতিক দোলো কথা নয়। শ্রীচৈতন্যদেব ইহ জগতের কোন দোলো কথা অবলম্বন করে অমঙ্গলজনক কথা বলেন নি—তিনি ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত প্রতিকূলতা করতে বলেননি।

ভক্তি একমাত্র সুখ, অন্যগুলি সুখের অভাব। 'আমার সুখ হোক ; বাদবাকী লোকের অসুবিধা হোক, তোমাকে বঞ্চিত করে আমার সুবিধা !' —এরই নাম অন্যাভিলাষ কর্ম-জ্ঞানাদির পথ।

আর কাকেও বঞ্চিত না করে সকলে মিলে হরিকীর্তন করি, ২৪ ঘণ্টা হরিকীর্তন করি—এরূপ বিচার কেবলা ভক্তির পথের পথিকের। কেবলা ভক্তির পথে কীর্তন ছাড়া অন্য কোনও অবান্তর সাধনের সাহায্য বা মিশ্রণ স্বীকৃত হয় না। কারণ কীর্তনই একমাত্র নিরপেক্ষ অব্যর্থ অস্ত্র। প্রথমে কাণ দিয়ে শুনতে হয়। পরে সকল ইন্দ্রিয়ের অনুকূল-ক্রিয়া উপস্থিত হয়। তখন ভগবানের রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্টা, লীলা-দর্শন হয়। ফুটো হাঁড়িতে তরল পদার্থ রাখার দুর্বুদ্ধিদ্বারা কেবল কাম-ক্রোধাদির প্রশ্রয় দেওয়া হয়।

প্রথমং নাম্নঃ শ্রবণমন্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থমপেক্ষ্যম্। শুদ্ধে চান্তঃকরণে রূপ-শ্রবণেন তদুদয়যোগ্যতা ভবতি। সম্যগুদিতে চ রূপে গুণানাং স্ফুরণং সম্পদ্যেত, সম্পন্নে চ গুণানাং স্ফুরণে পরিকরবৈশিষ্ট্যেন তদ্বৈশিষ্ট্যং সম্পদ্যতে। ততস্তেষু নাম-রূপ-গুণ-পরিকরেষু সম্যক্-স্ফুরিতেষু লীলানাং স্ফুরণং সুষ্ঠু ভবতি। তত্রাপি শ্রবণে শ্রীভাগবত-শ্রবণন্তু পরমশ্রেষ্ঠম্। * ভাঃ ৭।৫।১৮ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ-টীকা)।

* প্রথমতঃ অন্তঃকরণ-শুদ্ধির জন্য (শ্রীগুরুদেবের নিকটে) নাম-শ্রবণের

শ্রীচৈতন্য-নিজজনের করুণাকটাক্ষবৈভববিশিষ্ট পুরুষ জগতের যাবতীয় কুবৈভবকে, কুযোগিবৈভবকে ফুৎকার করতে পারেন, নিতান্ত অকর্মণ্য বিচার করে ভুক্তিমুক্তি হতে তফাৎ থাকেন। কৃত্রিম প্রণালী কোন কাজে লাগে না। ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা—পিশাচী, ডাইনীস্বরূপা। তারা কখনও জীবের মঙ্গল করতে পারে না। কিন্তু এরা কত অসৎ সাহিত্য সৃষ্টি করেছে—জীবসমষ্টির কত অসুবিধা করেছে! জাগতিক লোক ঐসকল সাহিত্যে তাঁদের প্রেয়ো-রুচির সমর্থন ও ইন্ধন পান বলে ঐসকল সাহিত্যেরই আদর করে থাকেন। শুদ্ধভক্তি-সাহিত্য তাঁদের রুচিকর হয় না, তাঁদের ইন্দ্রিয়তর্পণ করে না বলে উহা তাঁদের মাথায় প্রবেশ করে না, তাই তাঁরা তা বুঝতে পারেন না, এরূপ অভিযোগ করেন।

মনুষ্যজাতির সৃষ্ট পুঁথি বা বিদ্যা-বুদ্ধির উপদেশ ভাগবতের উপদেশ নয়। ভাগবতে একমাত্র পরম ধর্মের কথা আলোচিত হয়েছে। তদ্দ্বারা অন্য কথাগুলির অপ্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারা যাবে। অপস্বার্থপর লোকের কখনও পরম মুক্তি হতে পারে না। তাতে অন্য অপস্বার্থপর লোক বাধা দেয়, দেবতারা বাধা দেন। দেবতাদের পদবী ও আসন সীমাবদ্ধ, সেজন্য তাঁদের আশঙ্কা উপস্থিত হয়।

প্রয়োজনীয়তা আছে। অন্তঃকরণ শুদ্ধ হলে শ্রীকৃষ্ণের রূপশ্রবণের দ্বারা উক্ত অন্তঃকরণ রূপোদয়ের যোগ্যতা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ শুদ্ধ-অন্তঃকরণে রূপশ্রবণদ্বারা রূপ উদয় হতে পারে। রূপ অন্তঃকরণে সম্যগ্‌রূপে উদিত হলে শ্রীকৃষ্ণের গুণসকল শ্রবণদ্বারা অন্তঃকরণে গুণগণের স্ফূর্তি হয়। গুণ-স্ফুরণসম্পন্ন হলে, শ্রীকৃষ্ণের পরিকরগণের বৈশিষ্ট্য-শ্রবণ করতে করতে অন্তঃকরণে সেই বৈশিষ্ট্যের স্ফূর্তি হয়। তদনন্তর নাম-রূপ-গুণ-পরিকরসকল সম্যগ্‌রূপে স্ফুরিত হলে লীলাশ্রবণদ্বারা লীলস্ফুরণ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়। লীলাশ্রবণে—শ্রীভাগবত-শ্রবণই শ্রেষ্ঠ।

জল থেকে দই হয় না। ব্রহ্ম হয়ে যাওয়ার কল্পনা নাস্তিকতা ও আকাশকুসুমের স্বপ্ন। অদ্বৈতবাদীর সিদ্ধি স্বপ্নসিদ্ধিমাত্র। জীব কখনও ব্রহ্ম হতে পারে না। জীব তজ্জাতীয় বলে পরব্রহ্মের সেবা করতে পারে, কখনও পরব্রহ্মের অসমোর্দ্ধ পদটী গ্রহণ করতে পারে না।

অনন্ত অণুচেতন অদ্বিতীয় পরম চেতনের সেবক। এক ব্যক্তিই সব, অন্যে কিছু নয়,—এরূপ বিচারদ্বারা অন্যলোকের অধিষ্ঠানের প্রতি আক্রমণ করা হয়, মুমুক্ষু ব্যক্তির নিত্যত্বে ব্যাঘাত জন্মান হয়। যেমন Semetic Idea (জড়-ধারণা)—আগে মানুষ ছিল না, পরে ঈশ্বর কতকগুলি উপাদান দিয়ে মানুষ সৃষ্টি করলেন। ইহা ভ্রমপূর্ণ মতবাদ "জীবাত্মা সৃষ্ট হয়েছে।"—এই যে বিচার-প্রণালী Semetic thought (জড় চিন্তাস্রোত) এর মধ্যে এসে পড়েছে, তা চালনা করতে করতে নির্বিশেষবাদ পাওয়া যায়। আধ্যক্ষিকতা প্রবল হয়ে সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষবাদের বিস্তার হয়। আবার তা পরিত্যাগ করবার জন্য 'অনলহক' বা নির্বিশেষবাদ উপস্থিত হয়। এই সমুদয় বিপথ-প্রদর্শক মতবাদগুলিকে সুদার্শনিক বিচার উন্মুলিত করেছেন। ইহাই ভাগবতের প্রাথমিক প্রতিজ্ঞা, কাম-ক্রোধের দাস যারা—অমুক্ত যারা তারা এ সকল কথা বুঝতে পারবে না। সাধুগণ কোন মতবাদের পক্ষে নন ; তাঁরা নির্মৎসর—তাঁরা সম্পূর্ণ নিষ্কপট ও নিরপেক্ষ। ইহাই শ্রীচৈতন্যদেব সুষ্ঠুভাবে প্রচার করেছেন। যিনি যে পরিমাণে শ্রীচৈতন্য-দেবের কথায় পৌঁছতে পারবেন, তিনি সেই পরিমাণে বুদ্ধিমান হতে পারবেন।

ভক্তি অন্ধবৃত্তি নহে। মনুষ্য যতটা বুদ্ধিমত্তার শেষ সীমায় আরোহণ করতে পারেন, ভক্তি-আশ্রয়কারীর তা অপেক্ষা বেশী বুদ্ধিমান হতে হবে। আমরা মনুষ্যজাতির সৃষ্ট কোন কথার মধ্যে প্রবিষ্ট হব না।

ইহাই নিরপেক্ষতা। মনুষ্যজাতি, দেবতাজাতি বা কোন জাতি দেশ-বিদেশের কথার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে যাওয়াই,—দোলো লোক হয়ে যাওয়া—অপেক্ষাযুক্ত হওয়া। নিজ নিজ মনের কল্পনা কিংবা মনোধর্মের বিকারসমূহের মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়াও—মস্ত দোলো লোক হওয়া—অপেক্ষা-যুক্ত হওয়া। আমরা পূর্ব অভিজ্ঞতাদ্বারা প্রলুব্ধ হব না। আমাদের শ্রবণ করতে হবে। আমরা শ্রুতির উপাসক। কর্ণবেধ করে শ্রবণ করতে হবে। আচার্য কর্ণবেধ করবেন, আমরা সমিৎপাণি হয়ে আচার্যের নিকটে-অভিগমন করব।

আমাদিগকে বাস্তব বস্তু জানতে হবে—শ্রবণ-প্রণালীর দ্বারা; নিজের অনূচানমানিতার দ্বারা নহে, অন্যাভিলাষ-কর্ম--জ্ঞান-চেষ্টার দ্বারা নহে, তাতে বাস্তব বস্তু জানা যায় না। বাস্তব বস্তু কি? 'বাস্তব' কাকে বলে? সশক্তিক বস্তুর নাম—বাস্তব বস্তু। সশক্তিক জিনিষ—বাস্তব। বস্তুকে জানা অর্থে—জ্ঞান। নিঃশক্তিকবাদের ঈশ্বর (?)—নাস্তিকতা—part and parcel of phenomena—পরিদৃশ্যমান প্রকৃতিরই অবিচ্ছেদ্য অংশ বা ভাব-বিশেষ। শিবদং—যে বস্তু মঙ্গল দান করে, কল্যাণকল্পতরু শ্রীকৃষ্ণচরণ। আর Concocted thoughts-এর pursuit (উদ্ভাবিত চিন্তাধারার অনুসরণ) অমঙ্গল।

ত্রিতাপ কি?—আধিদৈবিক তাপ জাগতিক কোনও উপায়েই কেহ অতিক্রম করতে পারে না। আধিভৌতিক—একটা মানুষ আর একটা মানুষের উপর, একটা পশু বা প্রাণী অন্য একটা মনুষ্য বা পশু প্রভৃতি প্রাণীর উপর অত্যাচার করছে। নাস্তিক জগতের পরোপকার এই শ্রেণীর; সেগুলি পরোপকার নয়—মূলতঃ অত্যাচার। প্রথমতঃ একটা প্রেয়ঃপূর্ণ পরোপকারের মুখোস পরা, চরমে সজ্জিত ময়ূরপুচ্ছগুলো একে একে টেনে ফেল্লেই দেখা যায়—মহা অপকার

—অত্যাচার! আধ্যাত্মিক তাপ যত intellectual parade (অক্ষজজ্ঞানের কসরৎ)। Lewisএর History of philosophyতে intellectual paradeএর একটা Catalogue (সূচী) আছে। জাগতিক encyclopedia (বিশ্বকোষ) গুলিতে আছে।

ভাগবত পড়লে ত্রিতাপ থাকতে পারে না। শিবদ-বস্তুর অনুশীলন করলে মনুষ্যজাতির ভোগা-দেওয়া ধারণাগুলির অধীন হতে হবে না।

কৃষ্ণভক্তি—বাস্তব-বস্তু। ইহা ভাগবতের পরিসমাপ্তিতে বর্ণিত হয়েছে,—

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগ-যুক্তম্॥ *
(ভাঃ ১২।১২।৫৫)

আগে স্মৃতি ছিল, পরে বিস্মৃতি হয়েছে। জন্মান্তরবাদ, একজন্মবাদ—এরূপ কথা নহে। সত্ত্বের শুদ্ধি হয়। সত্ত্ব—existence, absolute position, তাতে যে-সকল অসুবিধা প্রবেশ করেছে, সেগুলো হতে ছুটী হয়ে যায়।

আত্মাই আত্মার সেবা করতে পারে। 'বৈরাগ্য'—কৃষ্ণস্মৃতি-বিরোধিনী কথা ত্যাগ। বিজ্ঞান—যা গ্রহণ করতে হবে। চিকিৎসক-সম্প্রদায় স্থূলদেহের কথা বলেন; জ্ঞানিগণ সূক্ষ্মদেহের কথা বলেন। অনাত্মভক্তি—আমরা বিমুখ অবস্থায় এখন যা করছি অর্থাৎ খণ্ডবস্তুর সেবা। অখণ্ডবস্তুকে সেবা করলে সকল বস্তুরই যোগ্য পরিচর্যা হয়।

---

* কৃষ্ণপদারবিন্দ-যুগলস্মৃতি মানবগণের অশুভ-বিনাশ, চিত্তশুদ্ধি, শ্রীহরিভক্তি এবং বিজ্ঞান-বৈরাগ্যযুক্ত জ্ঞান ও মঙ্গল বিস্তার করে থাকে।

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥ *
(ভাঃ ৪।৩১।১৪)

জোড়া-তাড়া-দেওয়া জিনিষ বদল হয়ে যায়। Civic things—secular things (অসাম্প্রদায়িক চিন্তাধারা) অসৎ-সাম্প্রদায়িকতা। পরমাত্ম-ভক্তিই একমাত্র আবশ্যক। Speculative literature (মননশীল সাহিত্য) এখন থাক; কারণ, সময় খুব অল্প। কৃষ্ণভক্তি সহজ Cooked drink (পক্ক পানীয়)। (তাতে) সঙ্গে সঙ্গে এখনই শং অর্থাৎ মঙ্গল পাওয়া যাবে। মায়াতে অবরুদ্ধ হবে না। পরমার্থ—ভক্তির মধ্যে সমস্ত অবস্থিত। হরিকীর্তন সর্বদা করা আবশ্যক—অনন্তকাল করা আবশ্যক—একমাত্র আবশ্যক।

শ্রীমদ্ভাগবতের দান প্রভৃতি প্রসঙ্গে হরিকথা

[১৩৩৮ বঙ্গাব্দের ২২শে বৈশাখ, ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ৫ই তারিখে কীর্তিত।]

Nicola Tesla প্রভৃতি মনীষিগণের চেষ্টার দ্বারা পরমার্থ-জগতের আবিষ্কার হচ্ছে না। পরমার্থ-জগতে শ্রীমদ্ভাগবতের স্থান অসমোর্দ্ধ। শ্রীমদ্ভাগবত নৈষ্কর্ম্য আবিষ্কার করেছেন। নির্ভেদজ্ঞানীর কল্পিত,

---

* যেরূপ বৃক্ষের মূলদেশে সুষ্ঠুভাবে জলসেচন করলেই উহার স্কন্ধ, শাখা, উপশাখা, পত্রপুষ্পাদি সকলেই সঞ্জীবিত হয় (মূল ব্যতীত পৃথক্-পৃথক্-ভাবে বিভিন্ন স্থানে জল সেচন করলে তদ্রূপ হয় না), প্রাণে আহার্য প্রদান করলে যেরূপ সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই তৃপ্তি সাধিত হয় (কিন্তু ইন্দ্রিয়-সমূহে পৃথক্-পৃথগ্-ভাবে অন্নলেপনদ্বারা তদ্রূপ হয় না), তদ্রূপ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের পূজাদ্বারাই নিখিল দেব-পিত্রাদির পূজা হয়ে থাকে (তাঁদের আর পৃথক্ পৃথক্ আরাধনার অপেক্ষা করে না)।

একদেশী ডাঁশা নৈষ্কর্ম্য নয়—শ্রীমদ্ভাগবতের নৈষ্কর্ম্য জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তি-সহিত নৈষ্কর্ম্য—পারমহংস্য-বিজ্ঞান।

শ্রীমদ্ভাগবতের কথা বাস্তব প্রত্যক্ষের কথা। ভোগোন্মুখি-ভাষার দ্বারা বলবার কথা নয়। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচার-প্রণালীই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রচার-প্রণালী— অন্য প্রণালী সর্বতোভাবে প্রকৃত প্রণালী নহে। জীবমাত্রেরই শ্রীচৈতন্যদেবের পদাশ্রয় করতে হবে। হরিকীর্তন সর্বদা করা দরকার। শ্রীচৈতন্য-বিহিত হরিকীর্তনই নৈষ্কর্ম্য-সিদ্ধির একমাত্র পথ, পাথেয় ও পথসীমা। হরিকীর্তনে সর্বশক্তি নিহিত রয়েছে—সর্ব-প্রয়োজন-শিরোমণি অনুস্যূত আছে।

শ্রীচৈতন্যদেব কোন জাতীয় নায়কবিশেষ নন। মানুষ জাতির সহিত ঝগড়া বা দুদিনের বন্ধুত্ব করা শ্রীচৈতন্য-চরণানুচরগণের চেষ্টা নয়। শ্রীচৈতন্য-প্রদর্শিত পথে ভাগবতানুশীলনই শ্রীচৈতন্যাশ্রিত ব্যক্তি-গণের কৃত্য। 'শুকরতল'—যেখানে পরীক্ষিত মহারাজ শ্রীশুকদেবের মুখে ভাগবত শ্রবণ করেছিলেন অর্থাৎ যেখানে শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় অধিবেশন হয়েছিল, সেখানে একটী আদর্শ ভাগবত-শিক্ষাকেন্দ্র হওয়া বাঞ্ছনীয়। শ্রীচৈতন্যদেবের কথা সর্বত্র প্রচারিত হবে,—

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

শ্রীচৈতন্যদেব ইচ্ছা করেছিলেন যে, জগতের সকলের মঙ্গল হয়ে যাবে। ইহাই একমাত্র সত্য যে, শ্রীচৈতন্যসাহিত্যের আলোচনা হলে সকলের মঙ্গল হবে; সেই পরিচয় আর কিছু নয়। আত্মধর্মের স্বরূপে শুদ্ধা অহৈতুকী ভক্তিই অবস্থিত। সুতরাং ইতর পরিচয় ব্যতীত আত্মস্বরূপে ভক্তিই প্রতিষ্ঠিত।

"কর্ম্মাবলম্বকাঃ কেচিৎ কেচিজ্‌জ্ঞানাবলম্বকাঃ।
বয়ন্তু হরিদাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকাঃ॥"

আমরা ভগবানের শরণাগত—বৈষ্ণবের শরণাগত। ভগবান্‌কে দেখতে পাওয়া যায় না—সুতরাং শ্রীচৈতন্যদেবের দাসগণের জুতা বইতে পারলেই কৃষ্ণদাস্যময় স্বরূপগত প্রতীতি লাভ হবে। কৃষ্ণদাসগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ—মধুররসাশ্রিতা গোপীগণ। সেই গোপীগণের কৃষ্ণ-বিরহভাবময়ী চিত্তবৃত্তি এইরূপ,—

"প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্‌।
তথাপ্যন্তঃ-খেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি॥"

বার্ষভানবী তাঁহার কোন সখীকে বলিতেছেন,—হে সহচরি! আমার সেই অতিপ্রিয় কৃষ্ণ অদ্য কুরুক্ষেত্রে মিলিত হয়েছেন, আমিও সেই রাধা; আবার আমাদের মিলনসুখও তাই বটে, তথাপি কৃষ্ণের ক্রীড়াশীল মুরলীর পঞ্চমতানে আনন্দ-প্লাবিত কালিন্দীপুলিনস্থিত কাননের জন্য আমার চিত্ত ব্যাকুল হচ্ছে।

প্রপঞ্চে জীবের অবস্থিতি ও বহিরঙ্গা শক্তির ক্রিয়া

[দার্জিলিং লাউইস্‌ জুবিলি স্যানিটেরিয়ামের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট ডাঃ এস্‌, কে, পাল মহোদয় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে জিজ্ঞাসা করলেন,—(১) প্রপঞ্চে জীবের অবস্থান কিরূপ? (২) বহিরঙ্গা শক্তির ক্রিয়া কিরূপ? শ্রীল প্রভুপাদ তদুত্তরে বলিতে লাগিলেন,—]।

'জীব'-শব্দে—যাহার জীবন আছে। ভগবানের তিন প্রকার শক্তি—বহিরঙ্গা, অন্তরঙ্গা ও তটস্থা। জীব সৃষ্ট পদার্থ নহে। জীব—অজ,

নিত্যকাল বর্তমান. তাহার অবস্থা-ভেদ আছে। জীবের সহিত ঈশ্বরের নিত্যভেদ। মহাপ্রভু বলেছেন,—"মায়াধীশ-মায়াবশ, ঈশ্বরে জীবে ভেদ।"

জীব তটস্থ-শক্তি-পরিণত বস্তু। জীব—বস্তু, অবাস্তব আকাশ-কুসুম নয়। জীবের স্বরূপ—কৃষ্ণের নিত্যদাস। জীব—সেবক ; জীব-সেব্য—কৃষ্ণ।

ভগবানের সীমাযুক্ত দর্শনে বদ্ধজীবত্ব। তার নিত্যকৃত্য—প্রভুর সেবা করা। জীবের জ্ঞাতৃত্ব ধর্ম আছে। জীব নিত্যকাল বর্তমান, নিত্য আনন্দপ্রার্থী ; যখন বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা গ্রস্ত হন, তখনই আনন্দের সন্ধান ভুলে যান। যখন জীবাত্মা সেবনক্রিয়াশীল থাকেন না, তখন ভগবানের সেবাকার্য প্রকাশিত হয় না, কিংবা গৌণভাবে প্রকাশিত থাকে ; যেমন গো, বেত্র, বিষাণ, বেণু প্রভৃতির। গো, বেত্র, বিষাণ, বেণু বুঝতে পারেন না যে, তাঁরা শ্রীভগবানেরই সেবা করছেন ; তাঁদের শান্তরস। ভগবানের সেবাব্যতীত শান্তি হয় না। কৃষ্ণ যে যন্ত্রের দ্বারা তাদিগকে পরিচালিত করেন, তদ্দ্বারা চালিত হয়ে সেবা করছেন, ইহা বুঝতে পারেন না। যেহেতু তারা শান্ত, সেজন্য তাঁদের অন্য কার্যে অভিলাষ হয় না। তাঁরা জানেন না যে তাঁরা সেবা করছেন, কিন্তু তাঁরা সেবা করছেন, নতুবা তাঁদের শান্তি সম্ভব হত না।

ভগবানের সেবা যারা না করে, তাদের বদ্ধাবস্থা। মুক্তগণের ভগবৎ-সেবা ব্যতীত অন্য কোনও কৃত্য নেই। শব্দের দ্বারাই পূর্ণসেবা হয়। ইহজগতের সেবা জড়বস্তুর প্রতি হয়ে যায়। অবিমিশ্রভাবে ভগবৎসেবা একমাত্র কীর্তনের দ্বারা হয়। বর্তমান অবস্থায় কৃষ্ণকীর্তন অর্থাৎ শ্রীশিক্ষাষ্টকে শিক্ষালাভ এবং শিক্ষাপ্রদান ব্যাপার একমাত্র আবশ্যক। Church এর Prayerও—কীর্তন, যদি অবিমিশ্রভাবে হয়। প্রার্থনাও

কীর্তন। দূরস্থিত বস্তুকে কিছু বলতে হলেই কীর্তন করতে হয়। বস্তুকে নিকটে পেলে মন্ত্র individual sound (ব্যক্তিগতশব্দ)। কৃষ্ণের কথা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কীর্তিত হয়ে আমাদের কর্ণে প্রবিষ্ট হয়। যখন সেই কীর্তন উপস্থিত হয়, তখন বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভোগ করবার বিচার থাকে না। ভোগিত্ব কর্তৃত্বের অভিমান উল্টে গিয়ে 'আমি দাস' এই বিচার প্রবল হয়। সেটাই—স্বাস্থ্য। বর্তমানে আমাদের আময়-যুক্ত অবস্থা। বর্তমানের ইন্দ্রিয়ব্যাপার তাঁর কাছে যাচ্ছে না, মাঝখানে আটক করে দিয়েছে—গুণজাত পদার্থ আটক করেছে। যা আগে ছিল না, পরে উপস্থিত হয়েছে। যেমন সোডা ও এসিড্। কর্তৃত্বটা অনুস্যূতভাবে ছিল, দুটো জিনিষ একত্র হওয়ায় ক্রিয়া আরম্ভ হল। এটা ভগবানের গৌণ-ক্রিয়া।

ভগবানের মুখ্য—ক্রিয়া—অন্তরঙ্গ-শক্তি-পরিণত জগতে। সেখানে নিত্যত্ব, পূর্ণত্ব এবং সদানন্দত্ব আছে। এ জগতে তার বৈপরীত্য দেখা যায়, প্রতিফলিত ভাবমাত্র।

এখানকার 'সত্য'—তাৎকালিক, সরে যায়, ধ্বংস হয়ে যায়, নিত্য নয়—খণ্ডকালের মধ্যে খানিকক্ষণ প্রকাশমান হয়, রঙ্গমঞ্চে নাট্যাভিনয়ের ন্যায়। জড়জগতে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জ্ঞেয় পদার্থ কিছুক্ষণের জন্য। তাতে আমাদের কিয়ৎ পরিমাণে গ্রহণ করার শক্তি কিছুদিনের জন্য হয়। শক্তি ক্রমে ক্রমে কমে যায় জোয়ার ভাটার মতন। বিদেশী (foreign) জিনিষ অভ্যাগতের মতন আসে আবার চলে যায়। ইহাই এই জগতের অবস্থা। আমরা এখানে—এই জড়জগতে আসি—ভোগীর পোষাকে নায়ক সজ্জায় আসি। আমাদের part কার্য বলাবলি হয়ে গেলে বাড়ী চলে যাই। এখানে আমাদের নিত্যাবস্থান নয়। জড়—পরিবর্তনশীল। চেতনের পরিবর্তন নেই। চেতন ক্ষুব্ধ হয় না—ধ্বংস হয় না—বিকৃত বা বিপর্যস্ত

হয় না। জড়ের পরিবর্তনশীল ধর্ম আছে বলে এর একটা নশ্বরভাবে, আগন্তুকভাবে Progressive face ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু ভঙ্গী আছে।

জীব—অজ। মনকে যদি 'জীব' বলা যায়, তা হলে তাতে অজত্ব আরোপ করা যায় না। মনোধর্ম্মিগণ বলেন,—মন মধ্যখানে আছে অচিদ্ গ্রহণের জন্য। সঙ্কল্প বিকল্পের দ্বারা অচিদ্‌গ্রহণ সম্পাদিত হয়। মনকে আত্মার সহিত এক করা যায় না। মন সর্বদা বহির্জগতে বিচরণশীল। মন চেতনধর্মের পরিচয়ে অবস্থিত। মন বহির্জগতের স্থূলবস্তু গ্রহণ করতে পারে, abstraction প্রতিবিরোধ বিচার করতে পারে—নিত্যবস্তু ঈশ্বরের সংবাদ রাখতে পারে না। নিত্যত্বের সংবাদ রাখে না, জ্ঞানময় হতে পারে না। এ সবই আত্মার ধর্ম। যে স্থলে অধিষ্ঠান স্থায়ী নয়, সে স্থলে অভিনয়ের পোষাক পরে থাকামাত্র বলতে হবে। লোকে যে ঘরে থাকে, সে ঘরটাকে 'লোক' বলা যায় না। লোক চলে গেলে ঘরটা পড়ে থাকে।

'শরীর' এবং 'আমি' এক নই। আমার স্থূলশরীর, আমার সূক্ষ্ম শরীর। 'আমি' আমার সহিত এক নই। সম্বন্ধযুক্ত হয়েছে মাত্র, কিন্তু identical অভিন্ন নয়। একজন—Property (স্বত্ব), আর একজন—Proprietor (স্বত্বাধিকারী), যখন Analytical view (বিশ্লেষণমূলক ধারণা) নিতে পারি না, তখন identical (অনন্য বা একই) ভাবি।

শরীর থেকে চেতনের উদ্ভব হয়, ইত্যাদি মত সকল নাস্তিকতা। দেশটা আমি নই, 'কাল' একটা স্বতন্ত্র জিনিষ,—'কাল' 'আমি' নই। যেখানে সম্বন্ধ, ষষ্ঠী প্রয়োগ, সেখানে পাত্র যদি দেশের সহিত নিজেকে 'এক' মনে করে, তাহলে ভুল হল। দেহী দেহ পরিত্যাগ করে,—শরীর পড়ে থাকে। মন—subtle body বা সূক্ষ্মশরীর dim reflec-

tion of animation (চেতনতার অস্পষ্ট প্রতিফলন)—চেতনের আভাস meddling * with the world জড়জগতের সহিত চলাফেরা করছে—কিন্তু স্বতন্ত্র। সে জিনিষটার মালিকের সঙ্গে পার্থক্য আছে। চেতন বা জীব—সূক্ষ্ম শরীরের মালিক, স্থূল শরীরের মালিক।

লক্ষ্মণদেশিক বোধায়ন-ঋষির নিকট হতে অবগত হয়েছিলেন—জীব চেতনের অংশ, চেতনের সমষ্টি—ঈশ্বর এবং অচেতন পদার্থের মালিকও ঈশ্বর। বর্তমান কালে আমরা যে-ভাবে অচেতন পদার্থ-গুলিকে নিযুক্ত করতে চাই, তারা সেইভাবে নিযুক্ত হবার যোগ্য। যেরূপ আমাদিগকে অচিতের মালিকরূপে বলা হয়, ঈশ্বরও সেরূপ চেতনের মালিক।

জীবকে চিৎশক্তি না বলে 'তটস্থা শক্তি' বলা অধিকতর সঙ্গত। তা অচেতনের দ্বারা আবদ্ধ দর্শকের নিকট আবৃত হতে পারে। বিশিষ্টাদ্বৈত-দর্শনের সহিত অচিন্ত্যভেদাভেদ-দর্শনের পার্থক্য বিশেষ অনুধাবন-যোগ্য। বোধায়ন ঋষির কথা গৌরসুন্দর সুষ্ঠুভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

রামানুজাচার্য বলেন,—বস্তু তিনটী—ঈশ্বর, চিৎ এবং অচিৎ। গৌরসুন্দর বলেন,—জীব যদি চিৎ পদার্থ হন, তাহলে স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর কোথা হতে আসে? বাহিরের অচেতন জিনিষগুলি কি করে চেতনকে গ্রাস করে? অন্য একটা শক্তি তাকে পরাভূত করতে পারে—fractional part (বিভিন্নাংশ) বলে। যেহেতু বিভিন্নাংশ, সেই জন্যই ভগবানের আর একটা শক্তি তাকে পরাভূত করতে পারে। জীবশক্তি বদ্ধাবস্থায় নীত হবার যোগ্য। জীব এদেশে এল কেন? সে

* meddle—অনধিকার চর্চা।

যখন অন্তর্জগতের কথার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তখন বহির্জগৎ হতে পৃথক্ হতে পারে, বহির্জগৎকে সম্পূর্ণ তাড়িয়ে দিতে পারে। তটস্থ-ভাবটী জ্যামিতির রেখার মত জিনিষ। স্থূলভাবে দেখাতে গেলে প্রত্যক্ষবাদীর দর্শনীয় পদার্থের মধ্যে এসে যায়। চেতনের রাজ্যে দেখাতে গেলে সত্ত্ব-রজঃ-তমোগুণহীন; এখন এইগুলি তাকে গ্রাস করেছে।

দেশ-কাল-পাত্র কি? পাত্র-বিচারে কেহ বলেন,—'আমি খোদা'। অপরে বলেন,—'আমি শরীরী', আমি—জীব,—বৃহৎ, ব্রহ্ম নই। বৃহতের ধর্ম খণ্ডিতভাবে বিন্দু বিন্দু জীবে বিদ্যমান আছে,—যেমন তরঙ্গ ও সমুদ্র। নির্দিষ্ট তরঙ্গ সমুদ্রের জলরাশি বা সমগ্র সমুদ্র নয়। তরঙ্গের জলটা মাপা যায়—জীবাত্মাকে মেপে নেওয়া যায়, পরমাত্মাকে মেপে নেওয়া যায় না।

'বৈকুণ্ঠ' ও 'মায়িক' দুইটী পৃথক্। মায়িকের মধ্যে দু'রকম অবস্থা আছে—অচেতন এবং গ্রস্তচেতন। যখন আমাদিগকে মায়িক জগতের অন্তর্গত মনে করি, তখন আমাদের জন্ম, মৃত্যু ও স্থিতি বিচার করি, কিন্তু তটস্থা শক্তি—নিত্যা, ঈশ্বরের সৃষ্ট পদার্থ নয়। কোন কোন ধর্মমতে জীবের সৃষ্ট হওয়ার কথা আছে। কিন্তু কোন্ সময় সৃষ্ট হল? Semetic thought (ইহুদীদিগের ধারণা) অনুসারে আদম-ইভ সৃষ্ট হল, জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়ে এখানে এল, আখেরের দিনে বিচার হবে। অপর পক্ষীয়গণ জন্মান্তরবাদ স্বীকার করেন। তাঁরা স্থূল-সূক্ষ্ম শরীরের বিচার বুঝাতে পারেন। কেহ কেহ বলেন, সূক্ষ্ম-শরীর ভগবানের সহিত এক হয়ে যায়। ঐ সমস্তই অজ্ঞান-প্রসূত বিচার—ভালরূপে ব্যাখ্যাত হয় না—বাধাযুক্ত হয়ে পড়ে। এই সমুদয় বিচার সুষ্ঠুতা লাভ করেছে—শ্রীচৈতন্যদেবের কথায়। যাঁরা শ্রীগুরুপাদপদ্ম তুলনামূলক

অধ্যয়ন করেন, তাঁরা ইহা বুঝেন। শ্রীচৈতন্যদেবের বাক্যে সকল কথা সুমীমাংসিত হয়েছে।

দাহিকা-শক্তির সহিত যেমন অগ্নির অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ, জীবের সহিত ভগবানের সেরূপ সম্বন্ধ। ভেদ-বুদ্ধি করার প্রয়োজন হয় না—অথচ সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝা যায়।

জীব ভোগী বা ত্যাগী হয়ে উঠেছে। এটা ব্যারাম—জীব তখন রোগী। তার মুখটাকে কৃষ্ণের দিকে ফিরিয়ে দেওয়ার নাম চিকিৎসা। ইন্দ্রিয়ের শক্তি unassorted (প্রতিহত বা বাধাপ্রাপ্ত) হয়ে অন্ধকারের দিকে ফিরেছে। আলোর দিকে ফিরিয়ে দিলে completely dove-tailed (সম্পূর্ণরূপে সংযুক্ত) হয়ে unityর (ঐক্যের) বাধা দিবে না।

আমিত্ব-জ্ঞান তদীয়ের অতিরিক্ত নয়। তদতিরিক্ত হলে মনে হবে,—ঈশ্বরই ত আমি! হিরণ্যকশিপুর ন্যায় কনক-কামিনী ভোগের স্পৃহা প্রশমিত হয় না। দেহ, ঘর, দেশ—আমার সঙ্গে incorporate (অংশভূত বা অনুস্যূত) করে নেবার ক্ষমতা এসে পড়েছে। এ মতলবগুলো পরিত্যাগ করা কর্তব্য। ইহাদের ingress (প্রবেশ) ও egress (বহির্গমন) সম্বন্ধেও অনেক বিচার আছে।

পরিবর্তনীয় অবস্থাই কি আমি? Bliss (পরমসুখ)—বিরুদ্ধভাব আমাকে আচ্ছন্ন করবে না, এরূপ নয়। আমি অন্তরঙ্গা শক্তির পরিণামের Factor (উৎপাদক বা কারণ) নই। এখন বহিরঙ্গা শক্তিপরিণতির Factor বলে অভিমানগ্রস্ত হয়েছি। আমি অভেদ-প্রকাশ, না ভেদ-প্রকাশ-দ্যোতক? অন্তরঙ্গা শক্তিতে অবিচ্ছিন্নতা আছে—যা আমাদের নেই। আমরা তটস্থা শক্তি-পরিণতির Factor (উৎপাদক বা কারণ)। External (বাহ্য) কিংবা astral bodyকে (সূক্ষ্মশরীরকে) জীব বলে ভুল করতে হবে না। সেরূপ বিচার করলে

হয় 'ভোগী', না হয় 'ত্যাগী' হয়ে যেতে হবে। এ দুয়ের জ্ঞান বিভিন্ন। তাদের মধ্যে আবদ্ধ থাকলে "আমি কে" বুঝতে পারব না। আমার স্বরূপ তটস্থ। এখনকার প্রতীতি হতে মুক্ত হওয়া দরকার। তা'হলে উৎক্রান্ত দশায় আর এখানে আসতে হবে না—পরাগতি লাভ করব। তখন কৃষ্ণকে কিরূপ সেবা করতে হয়, জানতে পারব।

সেবা—পাঁচ রকমের। গৌরসুন্দর যে সেবার কথা বলেছেন, সে সেবা সর্বোত্তম। যে ঔষধ-দ্বারা বর্তমান ব্যাধি আরোগ্য হয়ে সেবা-বৃত্তির উদয় হয়, গৌর-বিহিত-কীর্তনের মধ্যে সে ঔষধটা আছে। এই ঔষধ গ্রহণ করা সকলের কর্তব্য। তা হলেই শান্ত হতে পারব—মনের শান্তি—স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের ক্রিয়ার শান্তি হবে।

সেবা শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পাঁচ প্রকার রসে হয়। সেবা ভুলে এখানে আমরা প্রভু হয়ে গেছি। কৃষ্ণ (!) হবার ইচ্ছা হয়েছিল, এই জগৎ তার সুযোগ দিয়েছে। এই জগৎ সেইজন্য সাজানো রয়েছে। ইহা স্বরূপের ধর্ম্ম নয়। "খোলসের সাজানো আমি"কে দেখে আমি মনে করি—"আমি স্ত্রী, আমি পুরুষ" ইত্যাদি। এ অবস্থা নিত্য নয়। আমরা এইরূপে অশান্তির জগতে আছি। সেবাময় অবস্থাই—শান্তি। যখনই আমি একথা হৃদয়ের সহিত জানতে পারব, তখনই আমার বহুরূপিণী সাজানো-অবস্থায় আমিত্বের আরোপ করব না।

শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য্যপর সেবাময় আমিত্বের কথা শ্রবণের সৌভাগ্য যদি আমাদের কখনও হয়, তা হলে কালের অন্তর্ভুক্ত হয়ে জন্মগ্রহণ করে হিংসিত হবার অবস্থা হতে শান্তি প্রাপ্ত হব। মনোধর্মী হলে তা হবে না। অন্ধকারে ভ্রমণ মাত্র হবে। আলোকে পা বাড়ান হবে না।

মনকে অনুস্যূত (incorporate) করে রেখেছে যে জিনিষটা, সেটা 'জীব' নয়। সাময়িক ঔপাধিক আবরণ-দ্বয় যাঁর, তাঁর কথা অর্থাৎ আত্মার কথা আলোচনা করা আবশ্যক। স্বরূপ, স্বগুণ, স্বক্রিয়া আলোচনা করলে জানব,—আমরা বৈষ্ণব। শ্রীগুরুদেব আমাদিগকে দিব্যজ্ঞান বা দীক্ষাপ্রদান করে 'স্বরূপের' কথা জানিয়ে দেন, 'স্বনাম' প্রকাশ করে দেন, স্বগুণ ও স্বক্রিয়া শ্রীগুরুসেবা ফলেই প্রকাশিত হয়।

অন্য দেবতা বিষ্ণুর আবৃত দর্শন। ব্রাহ্মণের নিত্য আচমনের বা অর্চনের মন্ত্র—"ওঁ তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্। তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিংধতে। বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্।" * নিত্য ভজনের মন্ত্র—"ওঁ আঽস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবক্তন্ মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে। ওঁ তৎ সৎ।" †

---

* আকাশে অবাধে সূর্যালোক লাভে চক্ষুঃ যেমন সর্বত্র দৃষ্টিপাত করতে সমর্থ হয়, জ্ঞানিগণ তেমন পরমেশ বিষ্ণুর পরমপদ সর্বদা প্রত্যক্ষ করেন। ভ্রম-প্রমাদাদি দোষবর্জিত ভগবন্নিষ্ঠ সাধুগণ শ্রীবিষ্ণুর যে পরমপদ, তাহা সর্বত্র প্রকাশ (প্রচার) করেন।

† হে বিষ্ণো! তোমার নাম চিৎস্বরূপ, অতএব তাহা স্বপ্রকাশ-রূপ, সুতরাং এই নামের সম্যক্ উচ্চারণাদি মাহাত্ম্য না জানিয়াও যদি তাহা (মাহাত্ম্য) ঈষন্মাত্র অবগত হয়েই নামোচ্চারণ করি অর্থাৎ সেই নামাক্ষরগুলির মাত্র অভ্যাস করি, তবেই আমরা তদ্বিষয়ক জ্ঞান প্রাপ্ত হব। যেহেতু সেই প্রণব-ব্যঞ্জিত পদার্থ "সৎ" অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ; অতএব ভয় ও দ্বেষাদি-স্থলেও শ্রীমূর্ত্তির স্ফূর্তি হয় বলে তাদৃশ অবস্থায় নামোচ্চারণ করলেও মুক্তিলাভ হবে; কারণ "সাঙ্কেত্য" ইত্যাদি স্থলে নামোচ্চারণের (নামাভাসের) মুক্তিদত্ব শ্রুত হওয়া যায়।

আমাদের নিত্য আরাধ্য বস্তু—সকলের রক্ষক ও পালক—গোপ। শান্ত-সেবক—গো, বেত্র, বিষাণ, বেণু, কালিন্দী-তট, কদম্ব ইত্যাদি; দাস্য-সেবক—রক্তক, পত্রক, চিত্রক ইত্যাদিকে আকর্ষণ করেন কৃষ্ণ। কৃষ্ণ অচেতনকে repel (নিবৃত্ত) করেন। যে জীব foreign (বিজাতীয়) জিনিষ incorporate (অনুস্যূত) করতে ব্যস্ত আছেন, তাঁকে কৃষ্ণ আকর্ষণ করেন না। তাঁর আবৃত দর্শন হয়। যখন আকর্ষণ করেন, তখন দিব্যজ্ঞান হয়। জানতে পারি, এখন সাজা-সাজিতে দিন কাটাচ্ছি, নিজের প্রয়োজনীয় কথা বিচার করছি না। জন্ম-জন্মান্তর এই রকম করছি।

কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা-
স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে॥ *

নশ্বর relativityর (আপেক্ষিকতার) মধ্যে দিন যাপন করলাম। আমার কৃত কাম-প্রভু, ক্রোধ-প্রভু, লোভ-প্রভু, মদ-প্রভু, মোহ-প্রভু, মাৎসর্য-প্রভুর সন্তোষের জন্য কতই তাণ্ডবনৃত্য না করেছি! রিপুকে 'প্রভু' মনে করেছিলাম! মৎসরতা ধর্ম ত আমার হাড়মাসে মজ্জাগত হয়ে রয়েছে। লোকে কেন দু'বেলা খেতে পারে? সব সুবিধা আমার একার হবে। এখন বুঝতে পেরেছি, ওদের চাকরী করে

* হে ভগবন্, আমি কামাদিরিপুগণের কত প্রকার দুষ্ট আদেশ পালন করেছি তথাপি আমার প্রতি তাদের করুণা হল না; লজ্জা ও উপশান্তিরও উদয় হল না; হে যদুপতে, সম্প্রতি আমি বিবেক লাভ করে তাহাদিগকে পরিত্যাগপূর্বক তোমার অভয়চরণে শরণাগত হয়েছি, তুমি এখন আমাকে আত্মদাস্যে নিযুক্ত কর।

কোনো সুবিধা হবে না। কৃষ্ণের পাঁচরকম নিত্য চাকরদের কাছে শিক্ষানবিশী যদি করতে পারি, তা হলে এ-জন্মে কিংবা পরজন্মে সুবিধা হবে। নিজেকে মন বিবেচনা করায় জন্ম-জন্মান্তর ধরে ঘুরলাম। ওসব করবার আর সময় নেই। সমস্তগুলোকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কৃষ্ণদাস্যে নিযুক্ত হব। এখন আমার বুদ্ধি ঠিক হয়েছে—ব্রহ্মগায়ত্রী জপ করতে করতে আমাকে তোমার একটা চাকরীতে নিযুক্ত কর।

মধ্যবর্তী অবস্থায় সাধনভক্তি উপস্থিত হয়। কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি সবই উপাদেয়ভাবে কৃষ্ণে আছে। কৃষ্ণের সেবায় সব বৃত্তিগুলি dove-tailed হয়ে যাবে।

'কাম' কৃষ্ণ-কর্মার্পণে, 'ক্রোধ' ভক্তদ্বেষিজনে,
'লোভ' সাধুসঙ্গে হরিকথা।
'মোহ' ইষ্টলাভ বিনে, 'মদ' কৃষ্ণগুণ-গানে
নিযুক্ত করিব যথা তথা॥

দিক্‌টা—লক্ষ্যটা পরিবর্তন করা দরকার। গৃহস্থ থেকে সত্য কথায় একটুকু মন দিলে ওসব ইতর কার্যে আর প্রবৃত্তি হবে না। তখন হরি-সেবা ব্যতীত আর কিছু করব না। আর কোন জিনিষ দিয়ে ঢেকে রেখে তাঁর মুখোস দেখতে যাব না। তার নিজের রূপ দেখব—শ্যামসুন্দর-রূপ দর্শন করব। সে বিচারে পৌছান কার্যটি চৈতন্যদেবের অতুলনীয়া দয়ার দ্বারাই এত সুলভ হয়েছে। সুতরাং মানুষ যদি তা না শুনে, তাহলে তাকে জন্ম-জন্মান্তর ক্লেশভোগ করতে হবে। চৈতন্যদেবের একজন দাস বলেছেন,—

"দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।

হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাৎ
চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্ ॥”

আপনাদের সকলের দু'টি পায়ে ধরে বলছি। আপনাদিগকে অসাধু বিবেচনা করছি না। আপনারা সাধু; সুতরাং আমাকে ভিক্ষা দিবেন। আপনারা বহির্জগতের বড় লোক, একথা ভুলে যান। সব ছেড়ে দিয়ে আপনাদের আসক্তি--সহযোগ চৈতন্যচন্দ্রের চরণে হোক--একটুকু হোক। একটুকু হলেই আপনারা সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারবেন যে, চৈতন্যদেবের কথায় মধ্যে কোন অসুবিধার কথা নেই। সে কথা যাঁর কাণে সত্যি সত্যি যাবে, তিনিই কীর্তন আরম্ভ করে দেবেন। আমার ভাইসকল, এমন-ভাবে অমঙ্গলের পথে কেন যাচ্ছেন? অন্য কথায় কি প্রয়োজন? সব সময়ে কৃষ্ণকথা শ্রবণ করা কর্তব্য। সর্বতোভাবে মুকুন্দের সেবা করা কর্তব্য। সর্ব-ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিদ্বারা সেবা করা কর্তব্য। পরম-মুক্ত মহাপুরুষ-গণের কৃষ্ণ-কথা বলা ছাড়া অন্য কৃত্য নেই।

“যেন কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিয়োজয়েৎ।” *

আকর বস্তুকে ছেড়ে দিয়ে মাঝখানে যে-সব দর্শন হচ্ছে, সেগুলোকে ছেড়ে দেওয়া আবশ্যক। কেউ মনে করবেন না যে, এত বড় কথায় আমার অধিকার নেই। এ সব দৃষ্টবস্তু থাকবে না। যা থাকবে, তার জন্য একটুকু চেষ্টা করা উচিত।

বর্তমানে আত্মা মনকে সব ভার দিয়ে রেখে ঘুমুচ্ছেন। একটুকু ঘুম-ভাঙ্গা দরকার। তিনি মনকে ভার দিয়ে ভাবছেন (?) বড় শান্তিতে আছেন! কিন্তু মন তার মস্ত অশান্তি করিয়ে দেবে। মনকে অধীন রাখা দরকার।

---

* যে কোন উপায়ে হোক, মনকে কৃষ্ণ-সেবায় নিয়োজিত করতে হবে।

আমরা যেরূপ অবস্থায় থাকি না কেন, তাঁকে ভুলে থাকলেই সব অমঙ্গল।

"আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥"

তপস্বী, কর্মকাণ্ডীদিগের যে ব্যাপার উপস্থিত হয়েছে, তদ্দ্বারা কি লাভ হচ্ছে? যদি হরিকেই ছেড়ে দেওয়া যায়, তাহলে ঘোর অন্ধকারে প্রবেশ করে আত্মাকে কষ্ট দেওয়া হয়। এত কৃচ্ছ্রতা করে কি হবে? বুনো মহিষ চরিয়ে লাভ কি? এত কষ্টের ফলে হয় ত একদিন 'নোটিশ পাওয়া যাবে'—তোমার যা কিছু আছে, এক মুহূর্তেই সব ছেড়ে যেতে হবে। সেসমস্তই পরের আয়ত্ত। আমরা অত্যন্ত অধীন। সে অবস্থায় কতই সঙ্কল্প করছি। কিন্তু সেগুলো ঘুরে ফিরে সেই এক কথাতেই দাঁড়াচ্ছে। তাতে কিছু সুবিধা হবার যো নেই। মনুষ্যজন্ম পেয়েছি—বোকামী করবার জন্য নয়—সয়তানী করবার জন্যও নয়। মনুষ্য-জন্মের normal condition (স্বাভাবিক অবস্থা)—ভগবানের সেবা করা।

"কৃষ্ণ, তোমার হঙ যদি বলে একবার।
মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তারে করে পার॥

কৃষ্ণ অচেতন পদার্থ নন—Chaotic agent (অব্যক্ত পদার্থ) নন; তাঁর personality (ব্যক্তিত্ব) নেই, এরূপ নন। তিনি Personal (ব্যক্তিত্বসম্পন্ন), তিনি Absolute (বাস্তববস্তু), তিনি Harmony (ঐক্য)। জীব সেই বস্তুর part and parcel (অপরিহার্য অংশ), জীবসমষ্টির প্রভু-সূত্রে তাঁর অধিষ্ঠানের কোন ব্যাঘাত হয় না।

এই কাঠামে বিশ পঞ্চাশ বছরের স্মৃতি বেশ চলে আসছে--জন্মান্তরের সংস্কার রুচিরূপে চলে আসছে—জাতিস্মর নই বলে বুঝতে পারি না। সংস্কার দ্বারা অবস্থা ভেদ হচ্ছে—ইহাই শাক্যসিংহের কর্মভূমিকা। এই সকল স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধির বিচারে আবদ্ধ থাকলে আমাদের মঙ্গল হবে না—কৃষ্ণপাদপদ্ম আশ্রয় করলেই সকল সুবিধা হবে।

শ্রীরূপ-শিক্ষা

[১৩৩৮ বঙ্গাব্দের ২৪শে বৈশাখ, ১৯৩১ খৃষ্টাব্দেরর ৭ই মে তারিখে কীর্ত্তিতা]

প্রয়াগের দশাশ্বমেধ ঘাটে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপ-গোস্বামীকে দশদিন ধরে কথা বলেছেন,—

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥
মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্তন-জলে করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাড়ে লতা, ব্রহ্মাণ্ড ভেদি' যায়।
বিরজা, ব্রহ্মলোক ভেদি পরব্যোম পায়॥
তবে যায় তদুপরি গোলাক-বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণকল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥"

কৃষ্ণপদ-প্রাপ্তি জীবের সর্বাপেক্ষা মঙ্গল-নিদান। কৃষ্ণের পদ—পূর্ণ কৃষ্ণ, পরিপূর্ণরস-পরাকাষ্ঠার কল্পবৃক্ষ।

বাহিরে ব্রহ্মাণ্ড—এই জগৎ ততদূর, যতদূর পর্যন্ত মানবের ধারণা, প্রাণীর ধারণা যায়;—যেমন ডিম্বের দিক্টা উহার বাহিরের কথা

নয়। ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন। সেই সৃষ্টির চারিদিকে যেন একটা প্রাচীর দেওয়া আছে। ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্দ্দশটী স্তর আছে।

যাঁরা এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ঢুকে পড়েছেন, তাঁরা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ ও মন—এই সকল ইন্দ্রিয় হইতে সংগৃহীত জ্ঞানের মধ্যে বাস করেন। চৌদ্দটি স্তর যথা—ভূ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য; অতল, সুতল, বিতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল। নীচে ৭টা, মাঝে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং ঊর্দ্ধে ৫টা লোক। আমরা এই চতুর্দশ ভূবনে যাতায়াত করি। সত্য, জন, মহঃ, তপঃ ও স্বর্গ—এই ৫টী লোকে সূক্ষ্ম-শরীরী থাকে। অন্যান্য ভুবনে স্থূল ও সূক্ষ্মশরীর-মিশ্রিত প্রাণীদিগের বাস। পাঁচটি ঊর্দ্ধলোক এবং অন্তরীক্ষের কিয়দংশ সূক্ষ্ম ব্যাপারসমূহ অবস্থিত। ভূলোকে স্থূলব্যাপার। এই চতুর্দ্দশ ভুবনই ব্রহ্মাণ্ড। আমরা যখন স্থূলটাকে ছেড়ে দি—নির্মলতা লাভ করি, ঊর্দ্ধলোকে বিচরণ করি। স্থূল ও সূক্ষ্ম-জড়িত অবস্থায় এই সব লোকে বাস করি।

'আমি'র উপরের আবরণ সূক্ষ্মশরীর—অন্তঃকরণ স্থূল শরীরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হয়ে রূপ-রস ইত্যাদি গ্রহণ করে। বিভিন্ন লোকে আমাদের গতি হয়। ইহার নাম ব্রহ্মাণ্ড-ভ্রমণ।

কাহার ভ্রমণ হয়? জীবাত্মা স্থূল ও সূক্ষ্ম জড়ীয় শরীরসহ অবস্থান-কালে এইরূপ ভ্রাম্যমান্ হন, উহাই 'ভবঘুরে' অবস্থা—যাতায়াত—নাগর দোলায় উঠা-নামার মত কখনও সৎ-কর্ম বশে ঊর্দ্ধলোকে গমন, কখনও অসৎ-কর্মফলে নিম্নলোকে আগমন। ঊর্দ্ধলোকে উঠলেই নিম্ন-লোকে আসতে হবে, নিম্নলোক হতে আবার ঊর্দ্ধলোকে উঠতে হবে—পুনরায় নিম্নলোকে আসার জন্য। পুণ্য করলেই পাপ করবার প্রবৃত্তি হবে, পাপ করলেই পুনরায় পুণ্য করবার জন্য প্রবৃত্তি হবে,—এইরূপ

ঘুরপাক। যখন আমরা সন্ন্যাসী, তপস্বী, ব্রহ্মচারী হই, তখন সত্য, জন, তপঃ ইত্যাদি লোকে বাস করি; সদাচারী গৃহস্থ স্বর্গে গমন করেন।

জীবাত্মা সূক্ষ্ম-আবরণে আবৃত হওয়ার পর কখনও স্থূল-আবরণদ্বারা নিম্নলোকে আসেন। আবার তপস্যাদি প্রভাবে স্থূলদেহ ত্যাগ করে সূক্ষ্মদেহে পুনরায় ঊর্ধ্বগতি লাভ করেন। আমরা ইহলোকে অবস্থান কালেও চিন্তাদ্বারা ঊর্ধ্বলোকে গমন করতে পারি। কিন্তু গীতা তা করতে নিষেধ করেছেন,—

> "কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
> ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥" *

তাতে মনুষ্যের অমঙ্গল ঘটে। বহির্জগতের স্থূল ও স্থূল হতে সূক্ষ্মভাব গ্রহণ করায় অমঙ্গল ঘটে।

একমাত্র ভগবদুপাসনা আবশ্যক। ভগবান্ স্থূল সূক্ষ্মের অতীত। কিছুতে তাঁর নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ, পূর্ণজ্ঞান ও নিত্য-অস্তিত্বের বাধা দিতে পারে না। তাঁর সেবাদ্বারা সেবকযোগ্য তদনুরূপ অবস্থা লাভ হয়।

এই চতুর্দশ ভুবন-ভ্রমণের আমাদের যোগ্যতা আছে। এই ভুবনে নানা যোনিতে ভ্রমণের যোগ্যতাও আছে। যে-যে খোলসে যে-যে ভুবনে বাস করা যায়, বাসনা পরিপূরণের উপযোগী তদনুরূপ বাহ্যআবরণও লাভ হয়। বাসনা-নির্মুক্ত হওয়ার অনেক কৃত্রিম পন্থা কল্পিত হয়েছে। সেই সমুদয় পন্থার বিস্তারিত বিবরণাদি লিপিবদ্ধ হয়েছে। ব্রহ্মাণ্ড-ভ্রমণের বাসনা শেষ হলে জীব ভাগ্যবান্ হন। কালক্ষোভ্য অবস্থা অবলম্বনে

---

* যে ব্যক্তি হস্তপদাদি কর্মেন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করিয়াও বিষয়সমূহকে মনে মনে স্মরণ করে, সেই মূঢ়চিত্ত ব্যক্তি 'মিথ্যাচার' বলিয়া কথিত হয়।

জীবসকল ব্রহ্মাণ্ড-ভ্রমণ করেন। দেবতাই হউন,—মনুষ্যই হউন এই যাবতীয় অবস্থা বস্তুতঃ হেয় ও নশ্বর।

গুরুর অনুগ্রহবশে আত্মধর্ম প্রকাশিত হলে অস্মিতায় ভক্তিবীজ লভ্য হয়। গুরুর কৃপা আর কৃষ্ণের কৃপা আলাদা আলাদা নয়। একজন কৃপা করছেন, আর একজন বঞ্চনা করে কৃপা গ্রহণ করছেন না—এরূপ নয়। প্রসাদ—যা প্রকৃষ্টরূপে আনন্দিত হয়ে প্রদত্ত হয়, সেই অনুগ্রহ। আমাদের ব্যবহারোপযোগী যে অনুগ্রহ প্রার্থনা করি, সেই অনুগ্রহ পাই। কি পাই? ভৃত্য হয়ে প্রভুকে সেবা করা—'ভক্তি'। পরে সেবা-কার্যে মতি-গতি হবে, তার বীজ ভক্তি বা সেবালতার বীজ।

জ্ঞান-কর্মবৃক্ষের বীজও নানারকমের আছে। উহারাও বিস্তারশীল। সদ্‌গুরু বা কৃষ্ণের কৃপা-বঞ্চিত ব্যক্তির ব্রহ্মাণ্ড-ভ্রমণ বা আত্মবিনাশের জন্য ঐ সকল আপাতপ্রেয়ঃ বিষবৃক্ষের বীজ লাভ হয়। কর্মের ভোগ-প্রবৃত্তি ও জ্ঞানের ত্যাগ-প্রবৃত্তিতে নিজের সুখ-তাৎপর্য্য আছে; কিন্তু সেবাবৃত্তি নাই।

"আমি সেবক, আমার সেবন-ধর্ম"—এই বিচারে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই "মালী হওয়া"। মালী যেমন বৃক্ষের সেবা করে—বীজ থেকে আরম্ভ করে গাছ বড় হওয়া পর্যন্ত—তার পরেও ফল-বিতরণ, ফলাস্বাদন মালীর কার্য, তদ্রূপ যিনি সেবন-ধর্মের মালী হন, তিনি বৃক্ষের বীজ লাভ করার সময় থেকে শ্রবণ-কীর্তন জলসেচন করতে থাকেন, সযত্নে অঙ্কুরকে রক্ষা করেন, বৃক্ষ বড় হলেও সেচন কার্য্য পরিত্যাগ করেন না—সেবন-ধর্ম পরিত্যাগ করেন না—ফলাস্বাদন, ফল বিতরণরূপে সেবন-কার্য করতে থাকেন—নিত্যশ্রবণ-কীর্তন করেন।

আমরা কি সেবা করব? ভক্তিলতার বীজ—যা গুরুর নিকট হতে প্রাপ্ত হলাম—যা কৃষ্ণের অহৈতুকী কৃপাবশতঃ নিজে সেবক-

গুরুরূপে কৃষ্ণই প্রদান করলেন, সেই বীজ পেয়ে আমিও কৃষ্ণসেবাই করব। ভক্তিলতার বীজ-লাভ গুরুর আদর্শ-সেবকের সেবা দেখবার সৌভাগ্য লাভ আমার হয়, যদি নিষ্কপটে আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয় করি। শ্রীগুরুপাদপদ্মে তখন আমার বিশ্রম্ভ সেবাবৃত্তির উদয় হয়।

কৃষ্ণসেবাবৃত্তি বিভিন্ন প্রণালীতে উদিত হয়—ভক্তপ্রসাদজ, কৃষ্ণ-প্রসাদজ ও সাধনাভিনিবেশজ। তাঁহার ভক্তকে সেবা করবার জন্য ভগবান্ নিজ প্রেষ্ঠের দ্বারা সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তিবিশেষকে সেবার অধিকার দিবেন। যদি গুরু বলেন,—আমি সেবা গ্রহণ করব না, তা হলে শিষ্যের সেবা লাভ হবে না। গুরু বলেন,—যে জিনিষটির আমি সেবা করছি, তুমি সেই জিনিষটির সেবা কর। ভোগী-ত্যাগী হয়ে তা হতে তফাৎ হয়ো না। সেই সুযোগ আমি তোমাকে দোবো।

"ছাড়িয়া বৈষ্ণব-সেবা, নিস্তার পেয়েছে কেবা।"

ভগবানের সেবার উপকরণ আমাদের নিকট এসে উপস্থিত হলে সেই উপকরণের সেবা, উপকরণদ্বারা সেবা সম্ভব হয়। যাঁর নিকট হতে সেবা শিক্ষা করি, তিনি যে রকম সেবা করছেন, সেইরূপ করলে সেবা হয়। তাঁর ফুলগুলো যদি তুলে এনে দি, সর্বতোভাবে তাঁকে সাহায্য করি, তাহলে আমিও সেবক-শ্রেণীর মধ্যে এসে গেলাম। তখন আমার গুরুদেব ও তাঁর বন্ধু সাধুগণ আমার সেব্য, এইরূপ বিচার উপস্থিত হয়।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট কীর্তন শ্রবণ করলে তাঁর শতকরা শত পরিমাণ অপ্রতিহত সেবা-ধর্ম যদি সুষ্ঠুভাবে দেখবার সুযোগ ও সৌভাগ্য পাই, তা হলে আমরাও সেবা করতে পারি। গুরুপাদপদ্ম ও তাঁর বন্ধু-বর্গ বহির্জগতের বস্তু নন। আমি মূর্খ, যে ভাষায় বল্লে আমার মূর্খতা যায়, তাঁরা সেই ভাষায় বলে আমার মূর্খতা অপনোদনের যত্ন করেন—আমাদিগের অন্তরে সাধুবৃত্তির সঞ্চার করেন। সাধুগণের বৃত্তি

battery র action এর (ব্যাটারির কার্যের) মতন। উহা অসদ্‌বস্তুকে repel (প্রতিরোধ) ও সদ্‌বস্তুকে attract (আকর্ষণ) করে। সাধু-দিগের সঙ্গদ্বারা সাধুবৃত্তি লাভ হয়। অসদ্‌বস্তু ত্যাগ ও সদ্‌বস্তু গ্রহণের পরামর্শ ব্যতীত সাধুগণ অন্য পরামর্শ প্রদান করেন না। যাঁরা অসাধু, তাঁরা সর্বক্ষণ অন্যান্য পরামর্শ প্রদান করেন—অন্যান্য কথাবার্তা বলেন। সাধুর মুখে যখন অসদ্‌বস্তু ত্যাগ ও সদ্‌বস্তু গ্রহণের কথা শুনতে পাওয়া যায়, তখন তার তাৎপর্য অনুসন্ধান করতে হয়। সাধু-গুরু পৃথিবীতে সাজান আছে। সেবাপথে কিছুদূর অগ্রসর হলে তা বুঝতে পারা যায়। তৎপূর্বে অসাধুসঙ্গ হয়ে যায়। তদ্দ্বারা আমার ভজনের ব্যাঘাত হয়,—

“জড়বিদ্যা যত, মায়ার বৈভব,
তোমার ভজনে বাধা।
মোহ জনমিয়া, অনিত্য সংসারে,
জীবকে করয়ে গাধা॥”

গাধা যেমন জিনিষ বয়ে বয়ে মরে; কুবিষয়ের পিপাসায়ও জগতের লোক তেমন গাধার মতন সংসারের বোঝা বহন করে, কখনও বৃথা ত্যাগ-তপস্যা করে। ঐরূপ কৃষ্ণভজনহীন ত্যাগ-তপস্যাও—গাধার মতন বোঝা বহন করা। এই সকল ভজনের বাধা। ভজনের বাধা উপস্থিত হলে আমরা আত্মঘাতী হই। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা-বলে ভজনের বাধা বাস্তবিক অপসারিত হয়। ভজনের বাধা বাস্তবিক অপসারিত হলে সুবিধা হয়।

গুরুমুখ হতে—সাধুগণের নিকট হতে শ্রবণ হয়। তাঁদের নির্দেশ-মত পাঠাদি কার্যও শ্রবণের অন্তর্গত। নতুবা বিপথগামী হয়ে কখনও সৎকর্মের গাধা হয়ে যাই—প্রচুর পরিমাণে নীতিবাদী হবার যত্ন করি—আইনকানুন বাঁচিয়ে চলি—আবার কখনও নির্বিশেষভাব গ্রহণ করে

অলসতা সাধন করি। শ্রবণ-কীর্তনের অভাবে এইরূপ দুর্গতি হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্ম হতে এক মুহূর্তের জন্যও বিচ্যুতি হলে এরূপ অসুবিধা অনিবার্য। শ্রবণ-কীর্তন—জল; সেচনকারী—শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রিত ব্যক্তি। বিশ্রম্ভের সহিত সর্বদা গুরুপাদপদ্মের সেবনই একমাত্র কৃত্য। আর পাঁচজনকে জিজ্ঞাসা করবার দরকার নেই। ভক্তিলতাকে সযত্নে পালন করতে হবে। সুষ্ঠুভাবে ভগবানের সেবা করব—এই বুদ্ধি হতে বিচ্যুত হওয়ায় যত অমঙ্গল আসছে। সাধু-গুরুর সঙ্গ করাই কর্তব্য। তাঁরা কৃপাপূর্বক আমাদের কত সেবার সুযোগ দিয়েছেন। নিজেদের আদর্শ-চরিত্র দেখিয়ে—আদর্শ-চরিত্র বর্ণন করে তাঁরা আমাদের কত মঙ্গল-বিধান করেন। তাঁদের বর্ণনসমূহ অনুভব করবার বুদ্ধি যদি হয়, তা হলে কত সুবিধা!

"আমি নিজে পড়ছি"—এটা দুর্বুদ্ধি। "আমার পড়া অন্য লোক শুনুক"—এটা শ্রুতবাক্যের কীর্তন হল না।

"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।"

বৈষ্ণবের নিকট হতে ভাগবত শ্রবণ করতে হবে। "আমি ভাগবত পড়ছি"—গৌড়ীয় মঠের অনুগত ব্যক্তি এরূপ কখনও বলেন না। গৌড়ীয়-মঠবাসী বলেন,—"আমরা নিজের কোনো কথা প্রচার করব না। পূর্ব গুরুগণ যা বলেছেন, একমাত্র তাই প্রচার করব।" আমরা বেশী বোঝাতে পারি, পূর্বগুরুবর্গ বোঝাতে পারেন নাই, তাঁদের কথা মনুষ্যজাতি বুঝতে শুনতে পারে না"—ইহা দুর্বুদ্ধি, নিজে না বুঝতে পারা। গৌড়ীয়মঠের কৃত্য—শ্রবণ-কীর্তন—শ্রীগুরু-কৃপালব্ধ ভক্তিলতা-বীজে নিত্য জল সেচন করা। তাঁদের এরূপ বিচার নয় যে, তাঁরা বোঝেন, অন্য কেউ বোঝেন না কিংবা তাঁরা সোজা করে অন্যকে বোঝাতে পারেন—এসব দুর্বুদ্ধি তাঁদের নাই।

জল-সেচন না করলে বীজ শুকিয়ে নষ্ট হয়ে যায়। কোন সময় অতিরিক্ত জলে পচে যায়। অনধিকারী যদি শ্রবণ-কীর্তনরূপ জল-সেচন করবার ছলনায় চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রাসপঞ্চাধ্যায় প্রভৃতি শ্রবণ (?) বা কীর্তনের (?) বাড়াবাড়ি করেন, তবে ভক্তিলতার বীজটুকু আর অঙ্কুরিত হয় না। পঞ্চম বর্ষের বালিকাকে স্ত্রী-পুরুষের প্রীতি শিক্ষা দিলে তার পক্ষে তা "ইঁচড়ে পাকামী"র কাজ হয়, আর উপযুক্ত সময়ে স্ত্রী-পুরুষের প্রীতির বিষয় স্বতঃই যুবতীর হৃদয়ে স্ফূর্তি হয়, তখন সে প্রকৃতপ্রস্তাবে তা বুঝতে পারে।

সুষ্ঠু অভিজ্ঞান লাভ আবশ্যক। বিপরীত কথা হতে তফাৎ হওয়ার জন্য যত্ন আবশ্যক; নতুবা সাধু-গুরুর কথা ধরতে পারব না। জয়-দেবের কথা বুঝতে না পেরে বৃথা সময় যাবে—মরে যাব। সময়ে যদি কাজ না করি, তাহলে সুবিধা হবে না। কিন্তু যক্ষ্মারোগীর বনিতাভিলাষের উদাহরণের তাৎপর্যে কাজ করতে হবে না—যেমন পুরীতে ব্যাখ্যা হচ্ছে। পরীক্ষিৎ মহারাজের বিচার যেরূপ, সেরূপ বিচার আবশ্যক।

"উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায়।"

কৃষ্ণ-পাদপদ্মের সেবা করতে হবে। ইন্দ্রিয়ের সেবাকার্যে ব্যস্ত হতে হবেনা। ভক্তিলতাবীজে শ্রবণ-কীর্তন-জল সেচন করে লাভবান হওয়া আত্মার পক্ষে একান্ত আবশ্যক। শরীর পালন করা পশুরও ধর্ম। নিত্য মঙ্গলের অনুসন্ধান না করলে মনুষ্য-জন্মের কার্য হলো না। আত্মঘাতী পশুপ্রকৃতি অপ্রাকৃত বস্তুর শ্রবণ-কীর্তন করে না। যখন ভক্তিলতা বাড়ে, তখন লতা একটা মাচা চায়। কোন্ জিনিষটা মাচার কার্য করে? কৃষ্ণপাদপদ্ম মাচার কার্য করবে। কৃষ্ণপাদপদ্মে শরণাগতি বা আশ্রয় গ্রহণ করলেই লতা প্রফুল্ল ও পরিবর্ধিত হতে

থাকে। সত্য, জনঃ, মহঃ, তপঃ ইত্যাদি লোকে গেলে লতা জ্বলে যাবে—পুড়ে যাবে! তাহলে পশুপরিশ্রমে পর্যবসিত হবে—খোলে কেবল চাটি দেওয়া মাত্রই সার হবে।

জগতে যে-সব বিভিন্ন মনোধর্মের বিচারযুক্ত ব্যক্তি আছেন, তাঁদের সকলের ঐরূপ অসুবিধা হবে। ভক্তিলতা এই ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করে যায়। ব্রহ্মাণ্ডের পর বিরজা—একটা বড় গড়খাই। তাতে জল—কারণ-বারি আছে। কারণ-বারি থেকে ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হয়েছে। সেখানে রজোধর্ম নাই—অজধর্ম আছে—গুণসাম্যাবস্থা আছে। রজঃ, তমঃ ও সত্ত্ব একটা জিনিষ তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে ত্রিধা চূর্ণ হয়ে পড়ে—বিরজাতে neutralised [ক্রিয়াশূন্য] হয়। এখানে সৃষ্ট বস্তুর কারণ প্রকৃতি বর্তমান।

খানিকটে প্রগতি [Progress] দেখিয়ে স্তম্ভ-ভাব এনে দেওয়া ব্রহ্মাণ্ডের স্বভাব। এখানে অধিষ্ঠান পাওয়া যায় না—সেবার বস্তু পাওয়া যায় না।

বিরজার অপর পারে ব্রহ্মলোক। বিরজা-জলধির মধ্য দিয়ে লতা চললো। ব্রহ্মলোক নির্বিশেষ জ্যোতির্ময় স্থান। সেখানেও লতা এমন কোন বস্তু পেল না—যার সেবা করতে পারা যায়।

ব্রহ্মলোকের পরে সবিশেষ ভগবদ্ধাম—মহাবৈকুণ্ঠ। সেখানে গৌরবের সহিত সেবা—শান্ত, দাস্য ও সখ্যের নিম্নার্দ্ধ বিরাজমান। মর্যাদা-পথে নারায়ণ-সেবাতে আড়াইটা রস আটক পড়ে যায়। ইহ-জগতে দেখছি, রস পাঁচপ্রকার। কিন্তু বৈকুণ্ঠে আড়াই প্রকার দেখা যাচ্ছে, আর আড়াই প্রকার দেখা যাচ্ছে না। গোলোক-দর্শন—সমগ্রতার দর্শন—সেখান থেকে উপরের অর্দ্ধেকটা দেখা—সখ্যের উত্তরার্দ্ধ

অর্থাৎ বিশ্রম্ভ সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। যে দিক্ থেকে দেখা যাচ্ছে, সেদিক থেকে অর্দ্ধেকটা দেখা যাচ্ছে।

"তদুপরি যায় লতা গোলোক বৃন্দাবন।"

তার উপরে উঠে পাঁচটাই দেখতে পাওয়া যায়। আংশিক দর্শন ছাড়িয়ে পূর্ণ দর্শন। কৃষ্ণই পূর্ণ। বিষ্ণুর যাবতীয় অবতার—কৃষ্ণের অংশাংশ—কলা—বিকলা। মৎস্য, কূর্ম, বরাহ ইত্যাদি দর্শন—আংশিক দর্শন, পূর্ণ দর্শন নহে। গোলোকে কৃষ্ণ আছেন। অন্যত্র কৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি—কৃষ্ণের অপূর্ণ দর্শন।

ভক্তির দ্বারা দর্শন—ভক্তিতে আড়াই প্রকার রসে আংশিক দর্শন। আংশিক দর্শনে কতটা অসুবিধা হয়। পাঁচ প্রকার রসের যে কোনো রসে কৃষ্ণসেবা পাওয়া যায়। কৃষ্ণসেবায় সর্বরসের রসিক হতে পারে। অন্য অবতারসমূহে তা হয় না। উৎকর্ষ-অপকর্ষ-তারতম্য-বিচারে অবতার-সমূহে আড়াইটা রসের অভাবে আংশিক দর্শন।

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।" * (ভাঃ ১।৩।২৮)

চব্বিশটি অবতার। অংশ প্রথমভাগ। যেমন ডিগ্রী, সেকেণ্ড ইত্যাদিকে অংশ, অংশাংশ প্রভৃতি বলা যায়। Minutes [মিনিট—ঘণ্টা বা ১ ডিগ্রির ৬০ ভাগের এক ভাগ], seconds [সেকেণ্ড—এক মিনিটের ৬০ ভাগের এক ভাগ], thirds [তৃতীয়াংশ], fourths [চতুর্থাংশ] কলা বিকলা ইত্যাদি।

"সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ॥" ❊
[ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বি ২।৩২]

---

* রাম-নৃসিংহাদি—পুরুষের (শ্রীহরির) অংশ বা কলা (অংশাংশ)। কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।

❊ নারায়ণ ও কৃষ্ণের স্বয়ং স্বরূপদ্বয়ের সিদ্ধান্ততঃ কোন ভেদ নাই,

রসের দ্বারাই উৎকর্ষ-বিচার। কৃষ্ণ এবং অবতার-সমূহ বস্তুতঃ একই জিনিষ। কৃষ্ণ কেন পূর্ণ ভগবান্? রসের উৎকর্ষ-প্রাকট্যের কম-বেশীতে কৃষ্ণের অংশ এবং অংশিত্ব বিচার।

গৌরসুন্দর অন্য অবতারদের কথা না বলে কেবল কৃষ্ণ-কথা বল্লেন। 'ইহা দোলো কথা, কিংবা গৌরসুন্দরের শিক্ষা দোলো শিক্ষা মাত্র'—এরূপ যাঁরা বলেন, তাঁরা শ্রীচৈতন্যদেবের কথা মোটেই বুঝতে পারেন নাই। সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সর্বক্ষণ কৃষ্ণালোচনা করলে বুঝতে পারা যাবে যে, গৌরসুন্দর বেফাস কথা বলেন নাই। কৃষ্ণকথার দুর্ভিক্ষের জন্য এই সমুদয় অবিবেচনার কথা উপস্থিত হয়েছে। নিজেই ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য যে চেষ্টা করি, তা যদি হরি-সেবার দিকে নিয়োজিত করি—হরিসেবকের সেবায় নিযুক্ত করি, তা হলে ইন্দ্রিয়-তর্পণের দুর্ভোগ হতে পরিত্রাণ লাভ করতে পারি। শ্রীরূপ এবং তাঁহার অনুগ জনগণের ইহাই বক্তব্য।

এই সমুদয় জানা হয়ে গেলে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পড়া হতে পারবে। যদি চিত্তবৃত্তি সাধু-গুরুর চরণে থাকে, তা হলে আমরা যেখানেই থাকি না কেন, আমাদের সেবাবৃত্তি বৃদ্ধি লাভ করবে। নতুবা ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা বৃদ্ধি হবে। যেমন কেউবা প্রচারকের সজ্জায় সেজে জড়-প্রতিষ্ঠা সংগ্রহে নিযুক্ত হয়ে গেলেন। এরূপ নির্বুদ্ধিতা করা কর্তব্য নহে। নিরন্তর সাধু-গুরু-কার্ষ্ণগণের সেবা করলে সব সুবিধা হয়ে যাবে। তখন শুদ্ধাশুদ্ধির বিচার বিশুদ্ধতা লাভ করবে—সমস্ত কথার মধ্যে প্রবেশ লাভ হবে—যার যেরূপ যোগ্যতাই থাকুক না কেন।

মনুষ্যজাতি কৃষ্ণেতর কথার যথেষ্ট আলোচনা করছে। কিন্তু কৃষ্ণ-

তথাপি শৃঙ্গার-রস-বিচারে শ্রীকৃষ্ণ-রূপ রসের দ্বারা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন। এইরূপেই রসতত্ত্বের সংস্থান হয়।

কথার ভীষণ দুর্ভিক্ষ। কৃষ্ণকথার নামে কৃষ্ণেতর কথা আবার জগতে পূতনার ন্যায় স্নেহস্তন্যদায়িনী মূর্তিতে এসে পরমার্থ-জগতের শিশু-গণকে বিনাশ করছে। চৈতন্যদেব যাঁকে দয়া করেন, তাঁরই অকৈতব কৃষ্ণপ্রসঙ্গশ্রবণে রুচি হয়। নতুবা অচৈতন্য-কথা-শ্রবণের মাদকতা যায় না। চৈতন্য-কথা শ্রবণ-কীর্তন ব্যতীত অন্য অধিকার আমাদের নাই। অন্য প্রকারে ভক্তি-বৃদ্ধির উপায় নাই। কৃষ্ণের কথা শোনা, কৃষ্ণের কথা বলা ছাড়া আর কোনও উপায় নাই। শ্রীচৈতন্য স্বয়ং কৃষ্ণ হয়েও লোকশিক্ষার জন্য কৃষ্ণকথা শুনবার ও কৃষ্ণকথা বলবার লীলা প্রদর্শন করেছেন।

গয়া গিয়ে কৃষ্ণের কথা শুনলেন। পরে কৃষ্ণের কীর্তন আরম্ভ করলেন। গয়া যাওয়ার পূর্বে শ্রবণের পূর্ব কর্তব্য প্রদর্শন করেছেন। কৃষ্ণকীর্তন সর্বভাবে জয়যুক্ত হউন। "যদ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্তব্যা তদা কীর্তনাখ্যাভক্তি-সংযোগেনৈব কর্তব্যা।"

কৃষ্ণ অক্ষজ বস্তু নন। তিনি অধোক্ষজ। বিষয়-কথার মধ্যে তাঁর অনুসন্ধান পাওয়া যায় না। তা হলে কি উপায়ে এগুলোর মধ্যে তাঁকে দেখতে পাওয়া যাবে? নির্মল-অন্তঃকরণে শ্রবণ করতে হবে। কৃষ্ণকথা শ্রবণ কর্তব্য। একটুকু শোনা হলে কীর্তন আরম্ভ হবে। কীর্ত্তন ছাড়া অন্য কর্তব্য থাকবে না। কেউ অন্য কথা শুনাতে আসলে তাকে মারতে যাবে। চৈতন্যদেব পড়ুয়াদিগকে মারতে গিয়েছিলেন—গোপীর কথা তারা বুঝতে না পারার জন্য। নবদ্বীপের ব্রাহ্মণপণ্ডিতকে কৃষ্ণকথা বোঝাবার জন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাসী হলেন। তাঁরা বুঝতে পারলেন না—এখন পর্যন্ত বুঝতে পারেন নাই, অন্য কার্যে ব্যস্ত হয়ে গেলেন।

আগে গুরু-পাদপদ্ম আশ্রয় করতে হবে। নচেৎ গুরু হয়ে (?) শোনা হয়ে যাবে— থিয়েটারের অভিনয় দেখা শোনার মতন। প্রথমে নিজে

লঘু হতে হবে। ইহার নাম—আশ্রয়। ভণ্ডকে যদি 'গুরু' বলে স্থাপন করা যায়, তা হলে অসুবিধা হবে। শিষ্যের দান-গ্রহণকারী চোরকে 'গুরু' করতে হবে না। তা হলে 'গুরু' করা না হয়ে চাকর করা হয়ে যাবে। সর্বস্ব গুরুপাদপদ্মে অর্পণ করতে হবে। আর যে গুরু (?) এক কপর্দকও নিজের জন্য গ্রহণ করবেন, তিনি চোর হয়ে যাবেন। কৃষ্ণের দ্রব্য চুরি করে নিলে আর গুরুপদবাচ্য হবেন না। যে সকল গুরু (?) শিষ্যের (?) বিত্ত অপহরণ করেন, তাঁরা লঘু। তাঁদিগকে আশ্রয় করলে আরো লঘু হয়ে যেতে হবে। প্রকৃত গুরু লাভ হলে তিনি (শ্রীগুরুদেব) হৃষীকের (ইন্দ্রিয়ের) দ্বারা কিরূপে হৃষীকেশের সেবা করছেন লক্ষ্য করতে হবে, তা হলে সুবিধা হবে। 'আদৌ গুরুপাদাশ্রয়ঃ।' কৃষ্ণচন্দ্র আশ্রয়-মূর্ত-বিগ্রহ হয়ে সৌভাগ্যবান্ জীবের নিকট উপস্থিত হন—ভাগ্যহীন জীবের নিকট উপস্থিত হন না।

বর্তমানে আমাদের বিষয়ী আর যোষিৎ দর্শন হচ্ছে। গুরুপাদপদ্ম-দর্শন না হলে কৃষ্ণসেবা হয় না। গুরুপাদপদ্ম-দর্শনের পরেও যদি আবার যোষিৎ দর্শন হয়, তা হলে পতন হয়ে গেল। তখন দুর্বুদ্ধি হয়ে যে, গুরু থেকেও বড় গুরু আছে। যদি কেহ বাস্তবিকই গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করেন, আর যদি গুরু-কৃষ্ণ-সেবা করেন, তা হলে নিশ্চয়ই কৃষ্ণ-সেবা লাভ হবে—কৃষ্ণ-বিষয়ে দিব্যজ্ঞান—দীক্ষা লাভ হবে।

কৃষ্ণেতর বিষয়ের জ্ঞান প্রদানের জন্য ভণ্ডগণ কতই না চেষ্টা করছে! যে কার্য করলে বিষয়ী ও যোষিৎকে আর দেখতে হয় না, সেই কার্য করতে হবে। তখন কৃষ্ণযোষিৎকে পরমপূজ্যা গুরু জ্ঞান করতে পারা যাবে। তখন 'যোষিতের ভোক্তা'—এই দর্শন হতে নিরস্ত হওয়ায় ভগবানের সেবাবৃত্তির উদিত হয়—তখন কৃষ্ণের সম্যক্ দর্শন হয়; 'আমি যোষিৎপতি'—এরূপ বিচার হয় না। কৃষ্ণই

একমাত্র যোষিৎপতি—এইরূপ দর্শন হয়। কেবল কৃষ্ণ-ভজনের উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি হয়। মানুষ তখন নিজেকে গুরুর পুত্র জ্ঞান করে; এসকল পিতা-পুত্রের সহিত আর সম্বন্ধ থাকে না; তখন মঠবাস হয়। তখন শ্রীচৈতন্যদেব যা করেছেন, সেই কৃত্য করবার অভিলাষ হয়। সর্বদা হরি-কীর্তন হয়—তখন জীব প্রকৃত প্রস্তাবে 'তৃণাদপি সুনীচ' হন, নিন্দা করবার প্রবৃত্তি থাকে না।

শ্রবণ-কীর্তন না হবার জন্য কৃষ্ণের দর্শন হচ্ছে না। আশ্রয় ত করব আমি। আমি আশ্রয় না করলে আর কি হবে? ভগবানের ইচ্ছাক্রমে সদ্‌গুরু লাভ হয়। ভগবানের দয়া পেলেই সব হবে। তাঁর দয়া না হলে আমার শত চেষ্টাদ্বারাও কিছু হবে না। তাঁর দয়াই মূল জিনিষ। যদি হৃদয়ের মধ্যে নিষ্কপট আর্তি থাকে, যদি তাঁকেই সত্য সত্যই চাই, তা হলে তাঁর নিশ্চয় দয়া লাভ হয়। যতক্ষণ অন্য বুদ্ধি থাকে, ততক্ষণই জন্মৈশ্বর্যাদির অভিমানে সর্বনাশ হয়। ভগবান্ কি বস্তু, যাঁরা আলোচনা করলেন না, তাঁরা ঐ সব অসার জিনিষের (জন্মৈশ্বর্য্যাদির) আলোচনায় সময় কাটিয়ে দিলেন। এই সব বিষয়ে বেশী আসক্ত হয়ে পড়লে শ্রবণ হয় না। শ্রবণ না করলে বিষয়ভোগ ছাড়া জীব আর কি করবে?

অনাত্মবস্তুর সৃষ্টি আছে। আত্মবস্তুর সৃষ্টি নাই। আত্মবস্তুর সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হলে পুনরায় আমার স্বভাব প্রাপ্ত হব। পুনঃ পুনঃ সৃষ্ট হবার অভিমান হবে না। বলদের বুদ্ধি নিয়ে অগ্রসর হতে হবে না। কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে জীবন নষ্ট করতে হবে না। F. R. S. D. C. L. হয়ে আধ্যক্ষিক হবার জন্য যত্ন হবে না।

আত্ম পরীক্ষা না করার দরুণ—শ্যামাঘাসকে ধান গাছ বিবেচনা করার দরুণ দুর্গতি ঘটলো। ব্রহ্মাণ্ডের সব সুবিধা পেয়ে গেলেই বা

তাতে কি হলো? তাতে দুরাকাঙ্ক্ষা আরো বৃদ্ধি হলো বই ত নয়। আবার পরে সে সব ছেড়ে দিয়ে নির্বিশেষ চেষ্টা হবে। যোগ-ভূমিকার প্রাপ্য পতঞ্জল ঋষির কৈবল্য পেয়েই বা কি লাভ? এ সব দুর্বাসনা কালসর্পের মতন। কামড়ালেই পশুর ন্যায় করে ফেলবে। এগুলোর বিষ দাঁত না ভেঙ্গে এদের সঙ্গে বাস করলে মারা পড়তে হয়।

বিষয়ী হবার চেষ্টায় অভিভূত হওয়ায় যে অমঙ্গল ঘটে, সেই সব অমঙ্গল-বাসনার মুখে ছাই দেবার সুবিধা হয়—যখন ভগবানের দাসেদের সঙ্গে দেখা হবার সুযোগ হয়। নারদ যেমন নিজের সুবিধা করে নেওয়ার লীলা দেখিয়েছিলেন। নারদের অজ্ঞাত সুকৃতির উদয় হয়েছিল; সেই সুকৃতিবশে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, জাগতিক ব্যাপার আবশ্যক নয়,—

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥ *
(ভাঃ ১১।২।৪০)

পৃথিবীর লোক ইঁহাদিগকে নির্বোধ, পাগল বলে বিচার করে। ভগবানে অনুরাগ হল। ক্রিয়া কি দেখা গেল? হাসছেন—দেখছেন জগৎ কি করছে, অথবা তখন 'বিশ্বং পূর্ণ-সুখায়তে', তাই তিনি আনন্দে হাসছেন—সর্বত্র কৃষ্ণময় দর্শন; আবার কাঁদছেন—জগতের লোক কত অশান্তিতে রয়েছে! অন্য লোক কত অশান্তিতে রয়েছে! অন্য লোক কি বিবেচনা করছে, তাঁর গ্রাহ্যের বিষয় হচ্ছে না।

মহাভগবতের সঙ্গ-প্রভাবে অযাচিতভাবে যদি সেই জিনিষ লাভ

---

* এবিম্বধ ব্রতশীল হইয়া প্রিয়তম শ্রীহরির নাম-কীর্ত্তনাদি

হয়, তা হলে শ্রবণের যোগ্যতা হয়। হঠাৎ এই সৌভাগ্য উদিত হতে পারে।

নিবন্ধন অনুরাগযুক্ত এবং বিগলিত চিত্ত পুরুষ লোকের হাস্য প্রশংসা দিতে অবধান-শূন্য হইয়া উন্মাদতুল্য উচ্চহাস্য, রোদন চীৎকার, গীত এবং নৃত্য বিষয়ে রত্ত হইয়া থাকেন।